একালের বাংলা গল্প

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামায়ণী প্রকাশ ভবন
১০৬/১ রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
১০৬/১ রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : দোলপূর্ণিমা—১৩৬১

প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়

দাম—ষোল টাকা

মুদ্রাকর
অবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
কলিকাতা—৭০০০০৬

পরিবেশক
স্তাজুইন পাবলিশার্স কনসর্ন
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০[illegible]

কালের যাত্রা

রূপকমাত্র

নার্স, এবার তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে শুইয়ে দিতে পার। এবং সমস্ত শরীরে কম্বল টেনে দিতে পার। আমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। জানালাটা খুলে দাও। বাইরে করবী গাছ, সেখানে হয়ত শিশির ঝরছে। নার্স, মুখে আমার বিস্বাদের গন্ধ। যদি পার ওখান থেকে হাত ভিজিয়ে এনে আমার মুখে দাও।

এখন কটা বাজল বলতে পার? বার বার শরীরের উত্তাপ নিয়ে কি পরীক্ষা করছ? দশটা বাজতে আর কত দেরি। সময়ের কতটা পথ আর আমায় হাঁটতে হবে। তুমি আমায় করুণার চোখে দেখো না। তোমার প্রীতিপূর্ণ চোখ তোমারই থাক। বরং ডাক্তারবাবু এখানে এলে তাঁর সঙ্গে দু দণ্ড আলাপ কর। ইহকালের প্রেমপ্রীতি নামক বৃত্তিগুলো তোমাকে রূপময় করুক। আমায় তুমি কম্বলটা টেনে দিয়েছ শরীরে, এই বেশ, এই যথেষ্ট।

সুপর্ণ ইহকালের প্রেম প্রীতি, সুখ দুঃখের কথা ভেবে পাশ ফিরে শুল। পাশ ফিরতে ওর কষ্ট হল। নার্স এখন আঠারো নম্বর বেডের পাশে। নার্স একটা করে জানালা খুলে দিচ্ছে। সুপর্ণ মাথাটা উঁচু করে জানালাটা দেখল। এখনও রোদ করবী গাছের ডাল বেয়ে জানালায় নামে নি। আকাশে নীল রঙ, ষোলো নম্বর বেডে স্মরণীয়বাবু মরে পড়ে আছেন। হাত পা ক্রমশ শক্ত হয়েছে। আত্মাটা এতক্ষণ দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকছিল, নার্স জানালা খুলে দিতেই স্মরণীয়বাবুর আত্মা বিস্মরণের পথে উড়ে গেল।

স্মরণীয়বাবুর খাটে ভোরের আলো এসে নামছে। জানালায় দুটো ফিঙ্গে। ওরা ভোরের শীতে রোদের উত্তাপ নিচ্ছে। রোজ সকালে যেমন উড়ে উড়ে বসে আজও ওরা উড়ে উড়ে বসল। রোদের রঙ মুখে, ঠোঁটে, পাখনায় মাখাল। ওরা জানে না স্মরণীয়বাবু বেঁচে নেই। ওরা জানে না, আজ তিনি বিস্কুটের গুঁড়ো দেবেন না। তবু ওরা লাফাল। করবী গাছটায় উড়ে গিয়ে বসল, নাচল। আকাশে নীল রঙ দেখে অন্য ভোরের মত দুটো মিষ্টি ডাক

দিল। (স্মর...ণীয়...বাবু...ম...রে...গেছে) সম্পূর্ণ এমনভাবেই শুনল ডাক দুটো। তারপর ভাবল, অন্য একদিন বলবে, সুপর্ণ...বা...বু...ম...রে... গেছে। ফিঙ্গে দুটোর প্রতি ওর বিরক্তি জন্মাল। সুপর্ণ বুকটার পাশে আবার সেই ব্যথাটা অনুভব করছে। সে হাত দিয়ে বুকটা চেপে রাখল কিছুক্ষণ এবং কাশির সঙ্গে রক্ত, ছোট ছোট দুটো ডেলা নীচের সেই মাটির পাত্রে নিক্ষেপ করল। —বাঁচা গেল। ফুসফুসের ঘা।

স্মরণীয়বাবুর খাট থেকে তারপর চোখ তুলে নিল সুপর্ণ। দেয়ালে, ছাদে, কড়িকাঠে, জানালায় চোখ দুটো ঘুরে ঘুরে মরল। সে দেয়ালে, ছাদে, কড়ি-কাঠে জানালায় যেন মৃত ব্যক্তির আত্মার বিষণ্ণ দাগ দেখার চেষ্টা করল। ভোর হবার আগে, জানালা খোলার আগে, আত্মাটা কি দেয়ালে, ছাদে কড়িবরগায় সমস্ত সময় ধরে ঠোক্কর খেয়েছে। সুপর্ণ আত্মাটাকে পাখির পাকস্থলীর মত করে ভাবল। কারণ আত্মাকে এ-রূপে ভাবতেই ওর ভাল লাগে। সুপর্ণ তখন ছোট। বাবা পাখি শিকার করে আনতেন অনেক। আদু ঝি পাখির গলা কাটত। গলা দিয়ে রক্ত ঝরত গল গল করে। মা তখন পাশে থাকতেন। সুপর্ণ তখন বলত, মা পাখির প্রাণটা কোথায় থাকে? আদু ঝি হরিয়ালের পেট চিরে দেখাত, এখানে। এবং কি করে যেন সেই থেকে সুপর্ণ প্রাণ বা আত্মাটাকে পাখির পাকস্থলী অথবা হৃৎপিণ্ডের মত করে ভাবতে শিখেছে। আত্মাটা হৃৎপিণ্ড অথবা পাখি হোক, পাখি হয়ে আকাশে উড়ুক, ওর পোষ মানুক এই ইচ্ছা এখন সুপর্ণের। স্মরণীয়বাবুর আত্মাকে সে তবে মুঠোর ভিতর ধরে রাখতে পারে আর স্মরণীয়বাবুর স্ত্রী এলে বলতে পারে—আত্মা নেবেন? কোথায় যেন কোন গল্পে তার মনে হচ্ছে, পড়েছে, লেখকের পূর্বপুরুষরা গাধার পিঠে চড়ে আত্মা বিক্রি করতে বের হত। গল্পের ভাষা মনে পড়ছে না, ভাবটুকু মনে পড়ছে। ভাবটুকুই স্মরণীয়বাবুর স্ত্রীর নিকট আত্মা বিক্রি করার ইচ্ছাকে জন্ম দিয়েছে।

স্মরণীয়বাবু তোমার স্ত্রী এসেছেন। তোমার আত্মীয় স্বজন আসতে শুরু করেছে। কিন্তু আমি ত বলতে পারলুম না তোমার আত্মাটা বিক্রি করব, পকেটে আছে। তোমার স্ত্রী কাঁদছে। আহা, এ-সময় বলতে পারলে বাসর-ঘরের মত তোমার স্ত্রী রমণীয় হতে পারত। আর তিনি কাঁদতেন না। তোমাকে নিয়ে, তোমার দেহকে নিয়ে তিনি ফের সিঁদুর পরে পান চিবুতে পারতেন। ঠোঁট দুটো রমণীয় হতে পারত।

স্মরণীয়বাবু এখন হাসপাতাল ছেড়ে যাবেন। বাইরে একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। স্মরণীয়বাবুর মা বেঁচে, বাবা বেঁচে। ওঁরা লোহার রেলিং অতিক্রম করে সদর রাস্তায় অপেক্ষা করছে। ওদের বুঝি ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বাইবে ওরা কোলাহল করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। স্মরণীয়-বাবুর মা কাঁদছেন। আহা, এই সময় যদি জানালার ফিঙে দুটো আত্মাটা যে দিকে উড়ে গেছে সেদিকে উড়ে যেত। যদি নরম ঠোঁটে আলগোছে আত্মাটাকে ধরে এনে সুপর্ণের শিয়রের নীচে রেখে দিত!

নার্স এদিকেই আসছে। সুপর্ণের ইচ্ছা হল জানতে এখন কটা বাজে। নার্সকে জিজ্ঞাসা করবে ভাবল, নার্স তুমি কবে মরবে। তুমি কবে স্মরণীয়বাবু অথবা সুপর্ণ রায়ের মত কালের যাত্রা অতিক্রম করে অন্য কালে মিশে যাবে।

—মরবে, তুমিও মরবে। নার্স দশ নম্বর বেডের সোলেমান মিঞাকে ধমকাচ্ছে।

......নার্স তুমি মরবে। শরীরের রক্তমাংসে এত বেশী উত্তেজনা খেলছে যে সুপর্ণ আর বসে থাকতে পারল না...এত লোক মরছে, আর তুমি মরবে না। সোলেমান মিঞাকে ধমকানো হচ্ছে! একটা বিড়ি খাওয়া এত বড় অপরাধ! সিস্টার আসুক। গতরাতেব সব ঘটনার কথা বলে দেব।

এ-সময় সুপর্ণ খাট থেকে চোখ তুলে ওয়ার্ডের সবগুলো খাটের দিকে নজর দিল। কিন্তু নার্স ওর দিকেই ছুটে আসছে। সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। দাড়িতে হাত বুলোল। এবং নার্স ধমক দিলে ফের সে-কথাটা মনে পড়ল।... স্মরণীয়বাবু, তুমি তখন মরছিলে। ঘটনাব সাক্ষীরা জানালায় নেই। ওরা আবার রাতে আসবে, দাঁড়াবে পাশাপাশি, ছায়া ফেলবে নিজেদের। ওরা নড়বে, দুটো হাত জানালায় রাখবে। কিন্তু ওরা আমার হয়ে সাক্ষী দেবে না। আমাব সাক্ষী তোমার সেই আত্মা। তুমি তখন মরছিলে, আর সে-সময় নার্স জানালার ধারে, ডাক্তার জানালার ধারে। তোমাকে কি সব ঔষধপত্র প্রয়োগ করে ওরা বিশ্রাম নিতে নিতে জানালার রঙ দেখছিল। একবার শুধু নার্স বলেছে, সতের নম্বর মরছে। আমি তখন চোখ বুজে। কাশি উঠছিল, জোর করে চেপে দিয়েছি! ওদের কথা শোনার ইচ্ছা আমার তীব্র। আমি বললাম, স্মরণীয়বাবু কালের যাত্রা অতিক্রম করছে, সতের নম্বর মরছে কথাটা ভাল শোনায় না।

—নার্স। সুপর্ণ ডাকল।

—চুপ করে শুয়ে থাকুন। বড় জ্বালাচ্ছেন রাত থেকে।

—নার্স কটা বাজে ?

নার্স জবাব দিল না। আঠারো, সতেরো, ষোল পার হয়ে সে চলে যাচ্ছে। স্মরণীয়বাবুকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেছে। খুব খালি খালি মনে হচ্ছে এই পৃথিবীটাকে। সুপর্ণ দেখল করবী গাছের ডাল ধরে তখন রোদ নামছে জানালায়। তখন পাউরুটি দিয়ে গেল একটা লোক। এক গ্লাস দুধ রেখে গেল। নার্সকে আর এ-ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে না। ফিঙ্গে দুটো চ'ল গেছে অন্য কোথাও। করবী গাছের ফুলগুলো দুলছে। অনেক দূরে অশ্বত্থ গাছ। দুটো কাক বসে অনবরত ডাকছে। পেটের যন্ত্রণায় সুলেমান মিঞা আর্তনাদ করছে। সুপর্ণ চোখ বুজল। দুরূহ যন্ত্রণাকে ভুলে যাবার জন্য সে দূরের অশ্বত্থ গাছের ডালে কাকের ডাক শুনছে। সে শুয়ে শুয়ে কাকের ডাক, মোটরের শব্দ, নানা আওয়াজ অতিক্রম করে কান খাড়া করে রাখল। সে এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে একটি শিশু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। দুটো ছোট বুলবুল পাখির মিষ্টি কণ্ঠ অন্য দেয়ালের নীচে। ঘড়ির একটা টিক টিক শব্দ আসছে কোত্থেকে যেন। ঘড়ি, পথ, অন্য দেয়াল, সেই অশ্বত্থের পৃথিবী ছাড়িয়ে কয়েকটি কচি ঘাসের উপর কয়েকটি শিশিরবিন্দু দেখতে পেল সুপর্ণ। ওর যেন এতক্ষণে ঘুম পাচ্ছে।

সুপর্ণ ঘুম থেকে জেগে দেখল ওর বিছানার চারপাশে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে ওদের চিনতে পারছে। ওরা সুপর্ণের শরীরের ভিতর কি যেন লক্ষ্য করছে। সুপর্ণের হাতে, পায়ে, ফুসফুসে, মাথায় সর্বত্র দুঃসহ ভাব। সেই নার্সটির মুখ ভয়ানক গম্ভীর। ভোর রাতের জানালার রঙ নার্সটির মুখে নেই। চোখে পার্থিব করুণা সুপর্ণের জন্য।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনি ভাল হয়ে ওঠবেন। কাল দশটায় আপনার অপারেশন। আজ এখন আপনাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে।

স্মরণীয়বাবুর বেডের পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু ঠিক এই ধরনের কথা বলেছিলেন। সুপর্ণের মনে হয়েছিল সেদিন তিনি করুণাঘন যিশু। তিনি ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত। স্মরণীয়বাবু বেঁচে ওঠবেনই তেমন একটা ভাব সেই থেকে সুপর্ণের মনে। তাই ডাক্তারবাবুকে ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত বলে মনে হল না। তাই সুপর্ণ মুখ থেকে চাদর নামিয়ে সকলকেই লক্ষ্য করে রুগ্ন হাসিতে আপ্যায়িত করল। আপনারা সুপর্ণ নামক কোন ব্যক্তির দখলীস্বত্ব দেহকে

নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুন, আমি কিছু বলব না, রুগ্ন হাসিতে এই অর্থটুকু প্রকাশ পেল যেন।

সেই ঘর। অন্য ঘর। এ-ঘরেও জানালা আছে। জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। দুটো শকুন উড়ছে আকাশে। ওরা পাশাপাশি উড়ছে। ওরা ক্রমশ উপরে উঠে যাচ্ছে। সুপর্ণের মনে হল সে বড় নিঃসঙ্গ। ভাবল, কাল দশটায় অপারেশন। কাল এমন সময় হয়ত গোটা ফুসফুসটা পিঠের উপর ডাক্তারবাবুদের খেলনা হয়ে ঝুলবে। শকুন দুটো এখন কাছাকাছি। ফুসফুসের দুটো অংশের মত। অভিন্ন।

সুপর্ণ বিছানায় পড়ে পড়ে শুধু আকাশ দেখল। শকুন দুটো আর সেখানে নেই। শকুন দুটো না থাকায় আকাশটাকে খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। আকাশটা খুব একা, নিঃসঙ্গ। তবু সে নিঃসঙ্গ আকাশের দিকেই চেয়ে থাকল। সে চিত হয়ে পড়ে আছে। দেহটা ওর কবরের নীচে কফিনে ঢাকা মানুষের মত। হাত দুটো বুকের উপর, যেন প্রার্থনা জানাচ্ছে। চোখ দুটো স্থির, যেন সে আকাশ দেখছে। মুখের রঙ ঘোলা ঘোলা, মৃত্যুর বিষণ্ণতাকে যেন আরো প্রকট করে তুলেছে। মৃত্যু, মৃত্যু, আকাশ দেখতে দেখতে সুপর্ণ দুবার উচ্চারণ করল কথাটা। এখন হয়ত স্মরণীয়বাবুর আত্মা আকাশের দেয়ালে গিয়ে ঠেকে আছে। মৃত্যুর পরও স্মরণীয়বাবুর আত্মার মুক্তি হল না! সে খুব মুষড়ে পড়ল। আকাশের দেয়ালটা নিরবধিকাল ধরে পৃথিবীর সকল আত্মাগুলোকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই সত্যটুকু আবিষ্কার করে সে চোখের পাতা একবার ফেলে আবার খুলল। ফের আকাশ দেখতে থাকল কোন পুরানো অশ্বত্থের মত।

কোন পুরানো ছবির মত আকাশের রং মিলিয়ে যেতে থাকল। সুপর্ণ বুঝল আকাশ বলে কোন ছবি কিংবা দেয়াল নেই। আর আত্মারা সেখানে গিয়ে আটকে থাকে না। পৃথিবীর জন্ম থেকে যে লক্ষ কোটি আত্মার বিকাশ তারা শূন্য থেকে কোন এক মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে, যাচ্ছে। সেও যাবে, সেখানে গিয়ে স্থির হবে। পুরানো দিঘীর মত সেই মহাশূন্যে সে একটু জায়গা করে নেবে। নিরবধিকালের ঘরে সে দুদণ্ডের জন্য পরিজন হবে। কাল তুমি নিরবধি—সুপর্ণ ভাবল। লক্ষ কোটি জীব তাদের আত্মা সম্বল করে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। দু দণ্ডের জন্য ঘাস, মাটি, শিশির, প্রজাপতি, ফুলের গন্ধ। দু দণ্ডের মত মাস, বৎসর, শতাব্দী। পৃথিবী, সমুদ্র, শ্যাওলা। মাছেরা খেলছে।

এইসবের একটা চালচিত্র দেখল সুপর্ণ। চালচিত্রটা শূন্যে ঝুলছে। চালচিত্র চলচ্চিত্র হয়ে যাচ্ছে। মহাসমুদ্রের কোলে কোথাও কোথাও ডাঙ্গা। ডাঙ্গায় ডাইনোসরাস, কচ্ছপ, বাঁদর। পৃথিবী জেগে উঠছে। তারপর গাছ, ফুল, পাখি। বাঁদরগুলো মানুষ হয়ে যাচ্ছে, সুপর্ণ শুয়ে শুয়ে সব দেখতে পেল। সেখানে সে তার পূর্বপুরুষকে দেখল। গুহায় বসে সেই মনিষী নখ দিয়ে পচা মাংস খেতে খেতে ঢেকুর তুলছে।

সেই পূর্বপুরুষের দলটা গুহা থেকে ঘর পেল। ঘরের পাশে কৃষি। মধ্য এশিয়া থেকে আর্মেনীয়ান গ্রন্থি, পামীর গ্রন্থি পার হয়ে ওরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হচ্ছে। ব্যবহারের দিঘী তখন ব্যবহারের সমুদ্র। চলচ্চিত্রে তেমনি একটা চিত্রকল্প দেখতে পেল সুপর্ণ। তারপর তারা মরে আছে, পড়ে আছে। বরফের তলায় এখনও যেন খুঁজলে সেইসব ঐতিহাসিক দলিল খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ নার্স জানালার ধারে, ডাক্তার জানালার ধারে। নার্স বলল, সতের নম্বর মরছে। সতের নম্বর মরছে নয়, কালের যাত্রা অতিক্রম করছে। সুপর্ণ এইসময় কিঞ্চিৎ না হেসে পারল না। মরছে কথাটা ভাল শোনায় না।

এ সময় ঘরে ঘরে আলো জ্বলল। বাইরে অন্ধকার নামছে। আকাশে দুটো চারটা নক্ষত্র জাগছে। বারান্দার রেলিংয়ে কোলাহল। ওরা আকাশে চোখ তুলে বলছে স্পুটনিক। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের মানুষেরা দুটো কুকুরকে চাঁদে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। সুপর্ণ যাত্রা দেখেছিল একবার। রাম লক্ষ্মণ সীতা। সীতার বনবাস। পঞ্চবটি তপোবন। পিতাপুত্রের যুদ্ধ। তারপর সরযূ নদীর জলে লক্ষ্মণ বর্জন। দেখে দেখে সে কেঁদেছিল। মা কেঁদেছিলেন। আসরের সব লোককে মুখে চোখে কাপড় চাপতে দেখেছিল। চোদ্দ শতকে সম্রাট অগাস্টাস মারা গেছেন। তখন পৃথিবীতে পাঁচ কোটি লোক। আজ অনেক। তিনশ কোটি লোক। সুপর্ণ ভাবল সেদিন না কেঁদে আজ তার কাঁদা উচিত। পাঁচ কোটি আত্মারা আগামী পঞ্চাশ বছর পর পঁচিশ কোটি আত্মায় রূপ নেবে। আত্মার বিনাশ নেই। এক থেকে অসংখ্য।

নার্স ঘরে ঢুকে বলল, কেমন আছেন সুপর্ণবাবু ?

—ভাল। বেশ আছি।

—আমি এখানেই থাকব। যা দরকার বলবেন।

—কোন দরকার নেই। দেখুন, দয়া করে দাড়িটা যেন অপারেশনের আগে ফেলে দেওয়া হয়। এই অনুরোধটুকু শুধু আপনার কাছে।

নার্স সুপর্ণের কথা শুনে হাসল। ভোরের নার্স তাকে বলেছে, লোকটার শুধু বুকের অসুখ নয়, মাথারও অসুখ। সারারাত না ঘুমিয়ে রয়েছে। আর বিড় বিড় করে বকেছে। নার্স সুপর্ণের মুখ দেখল। মুখ পাংশু। মুখে রক্তহীনতা আছে। চোখ ঘোলা ঘোলা। নার্সের মনে হল এ সময় ডাক্তারবাবুর কথা—আপনার কে আছেন সুপর্ণবাবু? অপারেশনের ব্যাপারে একটা সই-এর দরকার।

—আমিই আমার সই। দিন করে দিচ্ছি। হাত দুটো কাত করে বলেছিল, কেউ নেই।

—আপনার সত্যি কোন আত্মীয়স্বজন নেই? নার্স খুব কৌতূহল বোধ করে এখন ফের সেই প্রশ্নটা করল।

—না নেই। সুপর্ণ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

এখন রুগীকে কোন ব্যাপারেই উত্তেজিত করতে নেই। নার্স অন্য কথায় এল ঃ রাশিয়ার লোকেরা চাঁদে স্পুটনিক পাঠাচ্ছে।

সুপর্ণকে জবাব দিতে না দেখে নার্স বাইরে চলে গেল।

সুপর্ণের চোখে ঘুম আসতে চাইল। জোর করে ঠেকিয়ে রাখল ঘুমটাকে। কাশি দু-একবার করে প্রায়ই উঠছে এবং তারা প্রতিবারের মত কিছু রক্তপুঁজ নিয়ে হাজির হচ্ছে। সুতরাং সে, যাত্রা দেখার মত করে ঘুমটাকে ঠেকিয়ে রাখল। ছেলেবেলায় যাত্রা দেখার সময় সুপর্ণের কিছুতেই ঘুম পেত না। তাই সে এখন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক দেখছে। ওর ঘুম পালাল। সারারাত জেগে সে বাঁচার মুহূর্তকে আরো দীর্ঘ করবে। আত্মারা এক থেকে অসংখ্য হচ্ছে, তবু সে মরতে চায় না, এ বড় আশ্চর্য।

এ বড় আশ্চর্য যক্ষ মেঘকে দূত করে পাঠাচ্ছে তার প্রেমিকার কাছে, আর এও বড় অদ্ভুত—হ্যামলেট ওফেলিয়াকে বলছে, ফ্রেলটি দাই নেম ইজ ওম্যান। সুপর্ণ শুয়ে শুয়ে দেয়ালের গায়ে নাটক দেখছে। তারপর কখন কি করে যেন নিজের জীবননাট্য সে সেই দেয়ালে দেখতে থাকল। আঁতুড ঘর। জন্ম। মা কাঁদছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। সুপর্ণ মধু খেল চুক চুক করে। সুপর্ণের মুখ দেখে মার কান্না থামল। মার ঠোঁটে হাসি। কতকাল থেকে যেন মা এই হাসিটুকুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। মার মুখ শুকনো। শালুক পাতার মত রঙ মুখে।

একদিন সুপর্ণ বড় হল এবং ভালবাসতে শিখল। সে কলেজে পড়তে পড়তে একটি অতিসাধারণ মেয়েকে ভালবেসে ফেলল। বাবা গৃহত্যাগ করতে বললেন

সুপর্ণকে। গৃহত্যাগের অঙ্কটি সে দুটো দৃশ্যে ভাগ করতে চাইল। প্রথম মা, বাবা এবং সুপর্ণ নিজে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মা এবং বাবা। ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দুজনই খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। দ্বিতীয় দৃশ্য এই ধরনের। জীবননাট্য সে তিন অঙ্কে শেষ করল। শেষ অঙ্কে বাবা মার মৃত্যু। সে বেকার। স্ত্রীর গঞ্জনা। অহেতুক উপবাস দিনের পর দিন এবং শেষ দৃশ্যে স্ত্রী পলাতকা আর সুপর্ণ জ্বরে বেঘোর। ডাকছে, আমায় একটু জল দেবে? নাটক সমাপ্ত।

সুপর্ণ জানালায় শুয়ে শুয়ে বুকের ব্যথায় কষ্ট পেতে পেতে কত রকমের কথা ভাবে। সে তার অশরীরী চিন্তার সমুদ্রে কতরকমের অদ্ভুত অদ্ভুত সব রঙ দেখতে পায়। সারাদিন, সারামাস এই বিছানায় শুয়ে থাকা। সারামাস ধরে একই ভাবনা নিয়ে পড়ে থাকা, মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। মৃত্যুই সব। মৃত্যুই শেষ। এই শেষটুকুর প্রতীক্ষায় আছে বলে পৃথিবী তার কাছে অকিঞ্চিৎকর। স্মরণীয়বাবুর মৃত্যুতে আত্মার পরিণতির কথাই সে ভাবছে।

ভোরবেলায় সুপর্ণকে অন্য একটা টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। টেবিলের পায়ায় চারটা চাকা লাগানো। নার্স ওটাকে ঠেলেঠুলে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল। নার্স দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। সুপর্ণের শরীর থেকে জামা কাপড় খুলে ফেলল। সুপর্ণ নার্সকে ঠোঁট দুটো চেপে প্রশ্ন করতে চাইল। নার্স তখন ওর শরীরে কি সব মাখিয়ে দিচ্ছে। স্পিরিটের মত গন্ধ। সুপর্ণ একবার বলতে চাইল, আমি কি এখন নার্স তোমার কাছে মানুষ নই। আমি কীট না পতঙ্গ। এখন আমাকে তুমি ইঁদুর না বিড়াল বানিয়ে রেখেছ। সুপর্ণের ইচ্ছা হল নার্সকে ঘুষি মেরে এই মুহূর্তে জব্দ করে দেয়।

যখন সুপর্ণকে অপারেশন থিয়েটারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে তার প্রিয় কবিতাটুকুর পাশে নার্সটিকে আবৃত্তি করে শোনাল—

> বুঝে নাও কালের যাত্রা রূপক মাত্র,
> পথে পথে শতাব্দীগুলোতে আগুন ধরারে।
> মহাকালের দারুণ মহিমার মন্দ্র তাপ করে—
> আমি, অপ্রতিহত ; যন্ত্রণা পেরিয়ে নেমে যাবো কবরে।

এই কবিতাটুকু শুনে নার্স বলল, সুপর্ণবাবু আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।

কোন এক ভোরে যখন ফিঙ্গে দুটো ডাকল তখন সুপর্ণ ধীরে ধীরে চোখ খুলল। ভোরের সেই রোদটুকু তখনও করবীর ডাল বেয়ে ঘরে নামছে।

সোলেমান পাশে বসে হাসছে। নার্স কপালের ঘামটুকু রুমাল দিয়ে ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছে। সুপর্ণ বলল, জল খাব। নার্স চামচ করে জল দিল মুখে। বলল, আপনি ভাল হয়ে উঠেছেন সুপর্ণবাবু। সুপর্ণ মহাভারতের লক্ষ পুণ্যশ্লোকের মত এই ধরণীর কথা শুনল। নিরবধি কাল ওর পাশে শুয়ে এখন অনন্তকালের প্রতীক্ষায় আছে। ফিঙ্গে দুটো জানালায় ডেকে ডেকে আজ যেন সেই কথাই শোনাল।

এক বর্ষার গল্প

—আমি পুরিপূজার মেলায় যাব।

—আমিও যাব। বুড়ি ঘাড় কাত করে বলল, ঘোড় দৌড়ের বাজি দেখব। মা যাবে, বাবা যাবে না। বাবা বাবুর হাটে কাপড় নিয়ে যাবে।

—বেথুন খাবি? সহসা প্রশ্ন করল রসো। মোত্রাঘাসের জঙ্গল পার হয়ে বোম্বা-গাছটা আছে না বঞ্চিতদের, তার উপর উঠে উঁকি দিতে হয়। তবে চোখে পড়বে। কি থোকা থোকা বেথুন ধরেছে রে, বুড়ি! এ-সময় রসো তালুতে জিভ দিয়ে শব্দ করল। কেউ দেখে নি। আমি দেখেছি। বোলতার চাক খুঁজতে গিয়ে আমি দেখলাম। এবার সে বুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, এখানে কেউ নেই তবু বলল। এখানে শুধু দুটো পেয়ারা গাছ, কিছু কেউ-ফলের গাছ—তার নীচে গন্ধপাদালের ঝোপ, আশেপাশে কালমেঘের জঙ্গল, দূরে মৃত গাব গাছ, পাশেই দত্তদের পুকুর, দু'ধারে বোম্বা-গাছের ছায়া এবং আশেপাশে ঘন বেতের ঝোপ—তবু সে ফিস ফিস করে বলল, যাবি? গাছ থেকে বেথুন পেড়ে দেব, তুই নীচে কপ ধরবি।

এইসব বলার সময় রসোর কোমর থেকে প্যাণ্ট খুলে পড়ছিল। সে টেনে তুলল প্যাণ্টটা। শক্ত করে দুটো মাথা পেটে গুঁজে দিল। প্যাণ্টে দড়ি নেই—ওর দড়ি থাকে না—কেন যে দড়ি ছিঁড়ে যায়, সে বোঝে না। ওর এই রকম অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

ওরা দুজন বঞ্চিতদের পুকুরপাড় ধরে নেমে গেল। জলে কচুরিপানা, মাটিতে ঘাসের গন্ধ, বিকেলের রোদ ঘাসের উপর। ঘাসে সাদা ফুল, মাঠে মাঠে চাষ শেষ। ওরা পাড় ধরে যেতে যেতে জমিতে চাষীদের দেখল। দূরে মাঝি-বাড়ির মেলার গরু। গলায় ঘণ্টা বাজছে। ওরা গরু দুটো দেখে বলল, গরুর দৌড়ে এবার মাঝি-বাড়ি জিতবে। তারপর ওরা মোত্রাঘাসের জঙ্গলে এসে দেখল—ওদের কেউ দেখছে না। ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় তবু ওরা দাঁড়াল কিছুক্ষণ—ওরা ভাল করে দেখল, কেউ দেখছে না। সুতরাং হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পরস্পর ওরা হাত ধরল।

বুড়ি সহসা হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, আয় এখানে বসি। বুড়ি ঘাসের ভিতর বসে পড়ল।

রসো বলল, নারে বসব না।

খুব নরম ঘাস। এখন মোত্রাঘাসের পাতার ফাঁকে বুড়ির গভীর চোখ দুটো। চোখ দুটো বিনীত ভদ্র অথচ অপার কৌতূহলে সচেতন। বুড়ি হাত নেড়ে ডাকল, 'কাছে আয় না। শোন্ না। সেই গল্পটা···মাসিমার··· বিয়েতে।'

রসো ভাবল, বুড়ি জঙ্গলে এলেই তার সেই গল্পের কথা মনে হয়। আমি সে গল্প শুনব না। রসো হাঁটতে থাকল। মোত্রাঘাসের জঙ্গল ফাঁক করে হাঁটতে থাকল।

বুড়ি ডাকল, রসো দাঁড়া। একা আমার ভয় করছে।

বুড়ি দু'লাফে রসোকে ধরে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল। বললে, বোস। পায়ে কাঁটা বিঁধেছে।

রসো বসে পড়ল ঘাসের ভিতর। বুড়ির পা কোলে তুলে নিল। পায়ের কাঁটা তুলে রসো হাত বুলিয়ে দিল—খুব মসৃণ। বুড়ির ঘাড় পর্যন্ত চুলে বুনো ঘাসের গন্ধ। বুড়ির শরীরে ঘাম। বুড়ির শরীর বড় হয়ে উঠছে। রসো ঘন হয়ে বসলে বুড়ি ফিস ফিস করে একটা গোপনীয় কথা বলল। রসো বুড়ির মুখ দেখে সচেতন হতে গিয়ে দেখল দূরে বাঁশ বনের ছায়ায় মাঝি-বাড়ির বড়বউ পাতা জড় করছে। রসো বলল, আমার ভয় করছে বুড়ি। আমার মা নেই, বাবা থেকেও নেই।

বাঁশ বনের ছায়ায় মাঝি-বাড়ির বড়বউকে পাতা কুড়াতে দেখে বুড়ি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তারপর মোত্রাঘাসের জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে দেখল, বোন্না গাছটা কিছু দূরে। হামাগুড়ি দিতে গিয়ে রসোর প্যাণ্ট আলগা হচ্ছে। বুড়ি রসোকে এবার ধমক দিল, দড়ি পরাতে পারিস না প্যাণ্টে?

দু'পাশে বেতের ঝোপ। ঝোপগুলো ক্রমশ বাজপড়া কড়ুই গাছে অথবা পিটকিলা গাছের ডাল ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। কোথাও বেতের আঁকশি ঝুলছে। কোথাও বাতাসে বেতপাতা কাঁপছে। অথবা কিছু বেতফল কাঁচা, কিছু বেতফল সামনে—বোন্না গাছে ঝুলছে। রসো বোন্না গাছের গুঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকল। প্যাণ্টটা গাছের ডালে ঘসা খেতে খেতে খুলে যাচ্ছে তারপর সহসা কোমর নেমে যায় আর কি! এইসব দেখে বুড়ির

অপরিণত বোধটুকু মাসিমার বিয়ের গল্পকে স্মরণ করে রসোকে যেন ধমক দিতে দিতে চাইল—প্যাণ্টে দড়ি পরাবি রসো। নয়ত তোর সঙ্গে আমি বনবাদাড়ে ঘুরব না।

রসো বলল, কপ ধর।

বুড়ি কপ ধরল।

রসো এবার বুক ছেঁচড়ে উপরে উঠতে থাকল। ডাল ধরে ডালে এবং অন্য ডালে।—নীচে বুড়ি ভয় পাচ্ছে—রসো পড়ে যাবি, রসো শক্ত করে ডাল ধর।

রসো বোম্বার পাতলা ডালে ঝুঁকে বলল, বুড়ি ধর। দেখবি মাটিতে যেন পড়ে যায় না। সে এক, দু' করে বেতফলের গুচ্ছ নীচে ফেলতে থাকল।

রসো এবং বুড়ি বেতফল নিয়ে ফেরার সময় শুনল, কোথাও কোন দুঃসহ শব্দ। ভেঙ্গে যাচ্ছে, ধ্বসে যাচ্ছে যেন। জঙ্গলের ভিতর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব অস্পষ্ট। একটা শেয়ালের থেকে থেকে কাতরানোকে ভয় করল। ওরা দাঁড়াল না। ওরা হাঁটছে।

বুড়ি বলল, আমরা এবার মাঠে পড়ব।

মাঠে রসো বুড়ির হাত ধরল। বলল, শেয়ালের অসুখ হয়েছে রে। একটু এগিয়ে এসে দেখল দুটো কুমিরের মত গো-সাপ ওদের দেখে দৌড়ে জলে নেমে যাচ্ছে।

ওরা দুজন পচা শালুকের জমি অতিক্রম করার সময় দেখল—বিকেলের শেষ রোদটুকু মুছে যাচ্ছে। খালের ধারে মেলার গরু—গলায় ওদের ঘণ্টা বাজছে। মেলার গরু এখন বাড়িমুখো। দিঘীর পাড়ে পাড়ে চাষের জমি। দিঘীতে জলজ ঘাস, কচুরিপানা। আর পাড়ে পাড়ে লটকন গাছ, গাছে নীলকণ্ঠ পাখি। ওরা দাঁড়িয়ে পাখির ডাক শুনল।

গাঁয়ে ঢোকার আগে ওরা দু'জন দুটো হিজলের ছায়ায় বসল। নীচে হিজলের ফুল সতরঞ্চের মত। ফুলেরা ফুলেফেঁপে নকসা কাটা সতরঞ্চ যেন। ওরা গাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসল। বেতফল ছাড়াল দু'জনে। তারপর পরস্পর বেতফল মুখে দিয়ে সুর করে বলতে থাকল: আম পাকে, জাম পাকে, বেথুন পাকে।

হাট ফেরত মানুষেরা ঘরে ফিরছে। ঈসম সেখ লণ্ঠন হাতে সোনালী বালির নদীতে তরমুজ ক্ষেতে পাহারা দেবার জন্য নেমে যাচ্ছে। দুপুরের ঘূর্ণি

হাওয়া এখন আর নেই। ঘরে ঘরে এবার লণ্ঠন জ্বলবে। মসজিদে আজান, মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজবে। এ-সময়ই রসো এবং বুড়ির অপরিণত বোধটুকু পরস্পরকে ভালবাসার জন্য কাছে টানছে।

বুড়ি ওর বাবাকে হাট থেকে ফিরতে দেখে বলল, আমি যাই, রসো।

বুড়ি কেউ-ফলের গাছ দুটো অতিক্রম করে বাবাকে দেখল। গন্ধপাদালের ঝোপ অতিক্রম করে উঁকি দিয়ে দেখল রসোকে। রসো এখনও গাছের নীচে বসে, রসো এখনও উঠছে না। বুড়ির রসোর জন্য কষ্ট হতে থাকল। রসোর মা নেই, বাবা থেকেও নেই। রসো প্রিয়নাথের বাড়িতে থাকে—দু'বেলা দুটো ভাত, এই পর্যন্ত। রসোর কষ্ট। খেতে কষ্ট, ক্ষুধার কষ্ট। সেজন্য বিকালে ঘুরে ঘুরে রসোর কেউ-ফল সংগ্রহের ইচ্ছা অথবা লটকন ফল, চড়ুই ফল। অথবা কোন সময়ে ডেফল পেড়ে গোলার তুষে পাকতে দেওয়ার ইচ্ছা। বুড়ি আতাবেড়া অতিক্রম করে ভাবল, মা না থাকলে এমন হয়, বাবা না থাকলে এমন হয়।

মা বললেন, তুমি আজও রসোর সঙ্গে গিয়েছিলে ?

বুড়ি চুপ করে থাকল।

—দাঁড়াও তোমার বাবা আসুন বলছি।

বুড়ি এবারও চুপ করে থাকল। কিন্তু কোচড় থেকে কিছু বেথুন তুলে মার হাতে দিল।

মা বললেন, খবরদার তোর বাবা যেন জানতে না পারে।

বুড়ি উঠোনে নেমে যাওয়ার সময় ফের ভাবল—মা না থাকলে এমন হয়, বাবা না থাকলে এমন হয়। বাবার হাতে বড় ইলিশ, বাবা বুড়িকে ইলিশ ধরিয়ে দিয়ে পুকুর ঘাটে চলে যাচ্ছেন। বুড়ি উনুনের ধারে ইলিশ রেখে মার পাশে বসে বলল, আমি পুরিপূজার মেলায় যাব মা।

রসো এবং বুড়ি এক দিন পুরিপূজার মেলায় গেল। ঘোড়দৌড় দেখে বুড়ি বলল, বাবা বলেছে আমাদের একটা বড় ঘোড়া কিনবে।

বুড়ির ভাই হবে বলে রসো কয়েকদিনই চুরি করে বুড়ির মাকে কই মাছ ধরে দিল। যখন বিকেল হত, যখন গাঁয়ের বুড়োরা মাঝিবাড়ি অতিক্রম করে নাপিত বাড়ির উঠোনে পাশা খেলতে বসত, যখন বঙ্কিতের বাবা পালমশাই গাওয়াল করতে অন্য গাঁয়ে বের হতেন অথবা যখন নদী থেকে ঝিনুক তুলে মুসলমানদের বিবিরা ঘরে ফিরত তখন চুপি চুপি ফুলের গুচ্ছ বাড়িয়ে কাঁকড়াদের

ঘর ভেঙ্গে রসো বুড়ির মার জন্য চুরি করে কই মাছ ধরতে বসত। তখন ওদের কেউ দেখতে পেত না। দুটো ছোট ছিপ, কিছু মশা এবং জঙ্গলের ভিন্ন ভিন্ন সব উলানী পোকা থাকত, আর ওরা শিকারী বেড়ালের মত বসে থাকত।

একদিন ঝোপ থেকে বের হয়ে ওরা দুজন সোনালী বালির নদীতে ঈসম সেখের আজান শুনল। ঈসম সেখের তরমুজের ক্ষেত—তরমুজের লতারা আকাশ মুখো। ঈসম তার ছই-এর নীচে বসে এ-দুনিয়ার জন্য দোয়া মাগছে।

বুড়ি বলল, ঈসম বড় ভাল লোক।

রসো বলল, যখন তরমুজ হবে, ও আমায় খেতে দেবে।

তখন রসো বনবাদাড়ে ঘুরবে না। তখন রসো বিকেল না হতেই ঈসমের ছই-এর নীচে গিয়ে বসে থাকবে। অথবা তরমুজ ক্ষেতে হেঁটে বেড়াবে। সে খুশীমত তরমুজ তুলে খাবে। এবং ছই-এর নীচে বসে ঈসমের হীরামন পাখির গল্প শুনতে শুনতে নিজেকে সেই পাষাণপুরীর রাজকন্যার পাশে কোটালপুত্র ভেবে অহেতুক এক আনন্দে ডুবে থাকবে।

বুড়ি বলল, রসো ঈসমের ছইয়ের নীচে আমায় একদিন নিয়ে যাবি।

—যাব! গেলেই নিয়ে যাব। কিন্তু তোর মা যদি বকে।

—হ্যাঁরে, মা এখন কি সব বলেরে। আমি বড় হয়েছি বলে।

—বড় ত তুই হয়েছিসই। বলে রসো দ্রুত হাঁটতে থাকল।

বুড়ি বাড়ির দিকে উঁকি দিয়ে বলল, দেখিস বাড়ি থেকে পালিয়ে তোর সঙ্গে আর বনবাদাড়ে ঘুরব না। বুড়িও পা চালিয়ে হাঁটতে থাকল।—আমি বড় হয়েছি না তুই বড় হয়েছিস!

বুড়ি মোত্রাঘাসের ভিতর ঢুকে বলল, রসো আসবি?

রসো ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বুড়িকে। বুড়ি এখনও ওর প্রতীক্ষায় ঝোপের ভিতর উঁকি দিয়ে আছে। রসোর কেমন ভয় ভয় হতে থাকল। সুতরাং সে ফিরল না। সে বাড়ির দিকে উঠে যাবার সময় ভাবল—আমি ফিরব না। আমার মা নেই বাবা থেকেও নেই। আমি ফিরব না। আমার পাপ হবে। এ-সময় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল শরীরে। রসোর শরীর ভিজছে।

রাতের টিনের ঘরে শুয়ে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ পেল। তারপর ঘন বৃষ্টি। বৃষ্টিরা যেন টিনের চালে নেচে বেড়াচ্ছে। বুড়ির কথা মনে হল রসোর। বুড়িকে নিয়ে একদিন বৃষ্টির জলে ভিজবার ইচ্ছা হল, অথবা আম কুড়োবার। সে শুয়ে শুয়ে বুড়ির প্রতি স্বগতোক্তি করল: বুড়ি এই জলে চাষ হবে। এই

জলে ধানের চারা পাটের চারা বড় হবে। এই জলে জলে একদিন এই দেশটা বর্ষায় ভাসবে। তখন ঘাটে ঘাটে নৌকা, দত্তদের পুকুরে মাঝি-বাড়ির পুকুরে যত নৌকা বানানো আছে সব ভাসানো হবে। তখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি নদীর এপার ওপার মনে হবে।

গ্রীষ্মের অসহিষ্ণু গরমের ভিতর এইসব ঘটনাগুলো ঘটল অথবা রসো এইসব ঘটনার ভিতরে নিজেকে প্রত্যক্ষ করল। উত্তর-পশ্চিম থেকে কাল-বৈশাখীরা এল—রসো সেই ঝড়ে আম কুড়িয়েছে। গাঁয়ের পেঁপে গাছ একটাও থাকল না। আম গাছ থেকে সব বড় বড় ডাল ভেঙ্গে পড়ল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। জানালা দিয়ে শিলাবৃষ্টি গড়িয়েছে—রসো এইসব দেখল। গাঁয়ের বুড়োদের আড্ডা তেমন জমছে না। ওরা বলল, বড় উত্তেজনার অভাব। যুদ্ধ কোথায় লাগবে শোনা যাচ্ছিল—তারও কোন খবর নেই। অনেকদিন পর দত্তর বড়ছেলে শহরে যাচ্ছে। বুড়োরা বলল, একটা খবরের কাগজ নিয়ে আসবে বাপু। একদিনের পথ হেঁটে গিয়ে রেলগাড়ি ধরতে হবে—সাবধানে যাবে বাপু। আর এইসব ঘটনার ভিতর রসো দেখল—এদেশে বর্ষাকাল এসে গেছে। ঘাটে দাঁড়িয়ে বুড়ি ডাকছে, রসো আমাকে পার করে নিয়ে যা।

রসো একদিন বুড়ির মাকে বড় বড় পুঁটি মাছ ধরে দিল।

বুড়ি একদিন রসোকে বলল, শাপলা তুলতে যাবি রসো। গতবার যেখানে আমরা শাপলা তুলতে গেছিলাম, গতবার বঙ্কিত যেখানে ডুব দিয়ে মাটি তুলেছিল। যাবি রসো।

ওরা নৌকা নিয়ে হিজলের ছায়া ভেঙ্গে বেত ঝোপের পাশে এক চিলতে জলা-জমির উপর নৌকা ভিড়াল। এখানে এখন এক লগি জল। বেতের জঙ্গলগুলো জলের নীচে ডুবে আছে। এখন এখানে টুনি-ফুলের লতার ঝোপ—কড়ুই গাছ ধরে ধরে অথবা বোন্না গাছের ডালে ডালে জড়িয়ে আছে। টুনি ফুলেরা গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে ফুটে আছে। তার পাশের চিলতে জমিটুকুতেই ওরা পাতি শাপলা তুলতে এসেছে। পুঁটি মাছ ধরারও ইচ্ছা। এখানে ধান নেই, পাট নেই জমিতে, শুধু জল, শুধু শালুক ফুল। জলের নীচে শ্যাওলারা সব বড় হচ্ছে। জলের নীচে ছোট ছোট মাছেরা খেলছে। ওরা প্রথম কোষা নৌকার পাটাতন থেকে উঁকি দিয়ে দেখল জলে। মাছেরা খেলছে। কিন্তু কোন পুঁটি মাছের ঝাঁক এসে খেলছে না কিংবা থামছে না, থেমে শ্যাওলা খাচ্ছে না। ওরা তবু অনেকক্ষণ ধরে পুঁটি মাছের ঝাঁক

খুঁজল। তারপর কোথাও কিছু না পেয়ে রসো জলে লাফ দিয়ে পড়ল এবং সাঁতার কাটতে থাকল। দু' একটা শাপলা তুলে বুড়িকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ধর।

তারপর রসো বলল, নামবি জলে? দু'জনে সাঁতার কাটব।'

—অবেলায় স্নান করলে মা বকবে।

রসো বলল, জামা খুলে নে, মা টের পাবে না।

ভাদ্রমাসের গরম এবং রসোর এই ডুবে ডুবে সাঁতার কাটা বুড়িকে পাটাতনে বসে থাকতে দিচ্ছে না। বুড়ি স্নান করার ইচ্ছায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তবু দীর্ঘদিন পর রসোর সামনে গা আলগা করতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল। বুড়ির মনে হল এই দীর্ঘ এক বছরে সে যেন অনেক বড় হয়েছে এবং অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। সেজন্য বুড়ি চুপচাপ বসে থাকল পাটাতনে।

রসো এখন পাঁতিহাসের মত সাঁতার কাটছে। অথবা পানকৌড়ির মত। ডুব দিচ্ছে রসো, ডুব দিয়ে অনেক নীচে নেমে নেমে শ্যাওলার জঙ্গল স্পর্শ করার এবং ডুবে অথবা জলে ভেসে বেড়ানোর শখ। স্বচ্ছ জলে রসোর শরীরে বিকেলের নিঃসঙ্গ রোদ হলুদ হতে হতে নীল অথবা বেগুনী রঙ ধরছে। স্বচ্ছ জলের নীচে রসোর শরীরটা—বুড়ি পাটাতনে বসে দেখতে থাকল। নিঃসঙ্গ রোদে, আতাবেড়ার মত ঘন পাটগাছের গোপনীয়তায় শরীরের গরম ভাবটুকু নষ্ট করার ইচ্ছায় জলে, তারপর জলের গভীরে নেমে যাবার ইচ্ছা হতে লাগল।

রসো বলল, ডুব দিয়ে মাটি তুলব?

বুড়ি পাটাতনে বসে হাতে জল টেনে নৌকা কাছে নিয়ে বলল, পারবি না। এখানে এক লগি জল। ডুব দিয়ে মাটি তুলতে পারবি না।

রসো জবাব না দিয়ে জলে ডুব দিল। সে নীচে নেমে জলজ ঘাসের জঙ্গল অতিক্রম করে নীচে, নীচে নেমে গেল। ফটিক জলে রোদের পাতলা আলোয় সে শ্যাওলার জঙ্গল দেখতে পেল। জলে স্রোত বইছে। শ্যাওলার জঙ্গলেরা যেন নাচছে। সে সন্তর্পণে শ্যাওলার জঙ্গল অতিক্রম করে আঁধারে ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দু সাল আগে মৃত পাহাড়ী সাপটার শরীর এবং বীভৎসতা ওর চোখের উপর ভেসে উঠল। সে ভয়ে আর নীচে নেমে যেতে পারছে না।

বুড়ি পাটাতনে বসে দেখল—স্বচ্ছ জলে রসোর শরীর ভয়ানক দৃঢ়। সে নেমে যাবেই এমত প্রত্যয়ে জলের নীচে কোলা ব্যাঙের মত পা চালাচ্ছে। বিচিত্র সব জলজ ঘাসের ভিতর ঢুকে যেতেই বুড়ি রসোকে আর দেখতে পেল না।

বুড়ি জলের উপর কিছু ফুটকিরি দেখল। জলজ ঘাসের ভিতর রসোর পা আটকে যাচ্ছে বুঝি—বুড়ি উত্তেজনায় পাটাতনে বসে থাকতে পারছে না। এই নির্জন জায়গায় অপরিণত বোধটুকু ওকে আকুল করে তুলছে। এখানে কেউ নেই। কিছু পাখি, কিছু ফড়িং, শালুক ফুল, কিছু নীল প্রজাপতি। দু' পাশে, সামনে পাটের জমি, পাটগাছ। সামনে আতাবেড়ার মত আড়াল। পিছনে বিস্তীর্ণ মোত্রাঘাসের জঙ্গল। রসোও এখন জলের উপর ভেসে নেই। সুতরাং সে নিঃসংশয় হতে পারছে। সে তাড়াতাড়ি জামা রেখে জলে লাফ দিয়ে পড়ল। এবং কোষা নৌকার অন্যপাশে শরীর আড়াল দিয়ে সাঁতরাতে থাকল।

রসো উপরে ভেসে দেখল বুড়ি পাটাতনে নেই, নৌকায় নেই।—বুড়ি! বুড়ি! সে ডাকল। কোন সাড়া নেই। সে ফের ডাকল, বুড়ি! বুড়ি!

নৌকার অন্যপাশ থেকে মাথা তুলে বুড়ি বলল, কি-ই।

—মাটি তুলতে পারলাম নারে। অন্ধকারে নেমে যেতে ভয় করল আমার।

বুড়ি বলল, ভয় কি রে! তুই পারলি না, ছাখ আমি পারি। বলে বুড়ি হাসল। এই ছাখ—বলে, বুড়ি জলে ডুব দিল। কিন্তু জলজ ঘাসের নীচে ঢুকে শ্যাওলার জঙ্গলে হারিয়ে যাবার আগেই সেও যেন দেখল সেই হিজলের নীচে গুলিতে আহত মৃত অজগর সাপের শরীর এবং বীভৎসতা ওকে গ্রাস করতে আসছে। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে বলল, নারে রসো হল না। এবং ওরা দেখল তখন নৌকাটা কাছে নেই—দূরে স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে দুটো মাদার গাছের ভিতর আটকে আছে। বুড়ি শরীর ঢাকার জন্য ফের ডুব দিতে চাইলে রসো বলল, তোকে আমি ছুঁই বুড়ি।

—পারবি না। বলে বুড়ি জলে ডুব দিয়ে হারিয়ে গেল।

ওরা জলের নীচে নেমে, জলের উপর ভেসে অথবা ঘুরে ঘুরে, ডুবে ডুবে সাঁতার কাটল। ওরা ঘুরে ঘুরে সাপলা তুলল, শালুক ফল সংগ্রহ করল। ওদের মাথার উপর দিয়ে কিছু জলপিপি কিছু বালিহাঁস উড়ে গেল। এ জলাতে বসতে এসে ওরা ফিরে গেল। জলের উপর ভেসে ভেসে বুড়ি অন্যমনস্ক হচ্ছে—এইসব পাখিদের দেখে। এই জগতে রসোকে দেখে ফের মাসিমার বিয়ের গল্প, মাসিমার বরের মুখ এবং রাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা ওকে যেন পরিণত বোধে নিয়ে যেতে চাইছে! রসোকে সেজন্যই যেন বলল, আমি মরে যাই, রসো?

রসো বলল, মরে যা।

বুড়ি বলল, তুই ত মাটি তুলতে পারলি না। বঞ্চিত হলে ঠিক মাটি তুলত। গতবার মনে নেই বঞ্চিত এক ডুবে মাটি তুলেছিল।

—আমিও তুলেছিলাম।

—বঞ্চিত তোর হাত ধরেছিল বলে। একা তুই পারিস নি।

রসোর গলার স্বর কেমন কোমল শোনাল। আমি পারি বুড়ি। কিন্তু নীচে নেমে শ্যাওলার জঙ্গলে ঢুকে গেলেই—ছোট তরফের বড়বাবু দু' সাল আগে হিজল গাছে যে বড় অজগর সাপটা মেরেছিল, তার মত দু'টো চোখ দেখতে পাই। ভয়ে আর নীচে নামতে পারি না।

—ভীতু কোথাকার। মাসিমার বিয়ের গল্প বঞ্চিতকে বললে সে লাফিয়ে পড়ত। তুই ত ভয় পেলি। ভীতু কোথাকার।

রসো কোন কথা বলল না। বললেও যেন এ-রকম শোনাত : বঞ্চিতের মত করে আমাকে ভাবিস না বুড়ি। আমিও মাটি তুলতে পারি, পারি। সে ধীরে ধীরে নৌকায় উঠে গেল। নৌকার পাটাতনে কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে থাকল। বুড়িও ধীরে ধীরে উঠে এসে জামা পরল, রসোর পিঠে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল। ওরা পরস্পর কোন কথা বলল না। ওরা পরস্পর অপরিচিতের মত ব্যবহার করল। এবং রোদে শরীরের জল মুছে ওরা সোনালী বালির নদীতে গয়না নৌকার হাঁক শুনল—দন্দি, পরাপরদী, নারানগঞ্জ।

বুড়িই প্রথম কথা বলল, বড় হলে আমার বিয়ে হবে।

রসো, বুড়ির মুখ দেখল। ঘন গভীর চোখে বুড়িকে বয়সী মনে হচ্ছে। রসো সহসা নিজেও কেমন বয়স্ক লোকের মত ব্যবহার করতে গিয়ে ফের বলল, আমার মা নেই, বাবা থেকেও নেই—যদি পাপ হয় বুড়ি! এবং রসো ঘন হতে গিয়েই ডাক শুনল দূরে : বুড়ি···ই। বুড়ি···ই···ই।

রসো ভয়ে ভয়ে বলল, বুড়ি তোকে তোর বাবা ডাকছে।

—কি হবে রসো! বুড়ি ভয়ে উচ্চারণ করতে গিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ওরা দেখল উভয়ে, দূরে পাটের জমির অন্য পাশে নৌকার লগিটা উঠছে এবং নামছে। নৌকাটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বুড়ি জড়বৎ হয়ে বসে আছে ভয়ে। রসো বলল, তাড়াতাড়ি জলে নাম বুড়ি। নৌকোটা ঝোপে ঢুকিয়ে আয় আমরা জলে ডুব দিয়ে থাকি। আমাদের দেখতে পাবে না। চিলতে জমিটা পার হলে আমরা ভেসে উঠব। এই বলে রসো বুড়ির হাত ধরে জলে নেমে গেল।

বুড়ি বলল, আমি ডুব দিয়ে যে বেশীক্ষণ নীচে থাকতে পারি নারে। কেবল ভেসে উঠি।

রসো বলল, তুই কেবল আমার হাত ধরে থাকবি। আমি শ্যাওলার জঙ্গলে ঢুকে শাপলার গুঁড়ি ধরে চুপ করে বসে থাকব।

যখন নৌকাটা মাঝি-বাড়ির খাল থেকে উঠে চিলতে জমিটাতে পড়বে, তখনই ওরা পরস্পর হাত ধরে জলের নীচে নেমে গেল। জলের নীচে নেমে যেতে যেতে ওরা যেন দূরে ফের অজগর সাপের চোখের মণি দেখতে পেল। তবু নিজেদের লুকোবার জন্য ওরা শ্যাওলার জঙ্গলে ঢুকে যেতে থাকল। তখনও যেন সেই মৃত সাপ, ওর দুটো মৃত চোখ রসোকে ভীত করে তুলছে। রসো পারছে না, বুড়ি পারছে না, তবু শ্যাওলার জঙ্গল অতিক্রম করে শালুক লতার গুঁড়ি ধরে বসে থাকবার চেষ্টা করল ওরা। ওরা বসে থাকতে পারছে না, ভয়ে উপরে ভেসে উঠতে পারছে না। ওদের মুখ থেকে ফুটকিরি উঠছে। ওরা পরস্পর ছটফট করতে করতে ভেসে ওঠবার চেষ্টায় রত। সহসা মনে হল ওরা উপরে ভেসে উঠতে পারছে না। শালুক লতার ভিতর অথবা জলজ ঘাসের অন্ধকার অতিক্রম করে কোনও পথ পাচ্ছে না। ওরা ক্রমশ জলজ ঘাসের ভিতর শালুক লতার ভিতর জড়িয়ে যেতে থাকল। এবং ওরা উপরে ভেসে ওঠবার প্রাণপণ চেষ্টায় একে অপরকে ধীরে ধীরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছে। পরস্পর মৃত্যুর শঙ্কায় ছটফট করছে। ওরা ছটফট করতে করতে একসময় শালুক লতার ভিতর স্থির হয়ে গেল। ওদের এই মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে কিছু ফুটকিরি জলের উপর ভেসে এক সময় মিলিয়ে গেল।

নাপিত বাড়ির উঠোনে পাশা খেলার চত্বরে ফের উত্তেজনা। গুলিতে নিহত অজগর সাপের মৃত্যুর পর এমন উত্তেজনার কারণ গাঁয়ে আর ঘটেনি। ঘরে ঘরে বলাবলি করল—নৌকা, রসো, বুড়ি। কেউ কোথাও নেই। শুধু ঈসম বলেছিল, সোনালী বালির নদীতে জ্যোৎস্না রাতে কার একটা নৌকা স্রোতের মুখে নেমে গেছে। এবং যখন বর্ষার জল নেমে গেল, যখন জলজ ঘাসেরা পচতে পচতে মাটির সঙ্গে মিশে গেল এবং শালুক লতারা শুকিয়ে শুকনো হয়ে গেল তখন গাঁয়ের সকলে এই জমির আলে দাঁড়িয়ে দেখল যেন দুটো নরকঙ্কাল একে অপরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হচ্ছে।

রাজার টুপি

জলের মত রঙ ছিল সেদিন আকাশের। সুরমা বিছানায় শুয়ে ছিল। সুরমা রুগ্ন। বাবুল বারান্দায় রেলগাড়ী চালাচ্ছিল। সতীশ রথের মেলা থেকে বাবুলকে রথ কিনে না দিয়ে রেলগাড়ী কিনে দিয়েছিল। রেলগাড়ীর চাকার সামান্য শব্দ হচ্ছিল; পাখী ডাকছিল আকাশে। ভোরের সূর্য উঠে আসছে। জানালায় পাতাবাহারের গাছ। গাছে লাল, নীল, হলুদ পাতা। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পাতার উপরে পরিচ্ছন্ন ভাব: সতেজ এবং স্নিগ্ধ। বাবুল গাড়ী চালাতে চালাতে ডাকল, বাবা আমার গাড়ীটা চলছে না।

সতীশ গাড়ীটাতে দড়ি বাঁধা দেখল। গাড়ীর চাকা ঘুরছে না বলে বাবুল দড়ি ধরে টানছে এবং চালাবার চেষ্টা করছে। সতীশ নুয়ে গাড়ীটা উল্টে দিল। আর পিন লাগালে গাড়ীর চাকা আবার ঘুরতে থাকল। বাবুল রেলগাড়ীটা টানতে টানতে দেয়ালে বোধ হয় পাখী দেখল, বোধ হয় পাখী উড়ে গেলে দেয়ালে সে নিজের ছায়া দেখে থেমে গেল এবং কেমন ভয় পেয়ে বলল, বাবা তুমি আমার পাশে বসবে।

বুঝতে না পেরে সতীশ বাবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বড় চোখ বাবুলের। হাসলে গালে টোল পড়ে। কালো রঙ। মুখের ভিতর চোখ দুটোই সার। ছোট করে ছাঁটা চুল এবং মুখশ্রীতে কেমন যেন যাদু আছে। যেন দূরের কোন মাঠে বৃষ্টিপাতের পর সামান্য জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নায় ছোট্ট শিশু দু' হাত তুলে ছুটছে। সতীশ মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কি বললে?

বাবুল এবার গাড়ীটা বগলে নিয়ে সতীশের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, এখানে তুমি আমি বসব। বলে সে এনজিনের দিকটাতে স্থান নির্দিষ্ট করলে সতীশ বলল, মা কোথায় বসবে? কথা শুনে বাবুল একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। মা পাশে না বাবা পাশে? কে পাশে বসবে সে এ-মুহূর্তে কিছুই স্থির করতে পারল না। ওর চোখে-মুখে ক্লিষ্ট এক ভাব ফুটে উঠছে। সুতরাং-সতীশ বলল, তুমি যেখানে বসবে আমরা সেখানেই বসব। তোমার
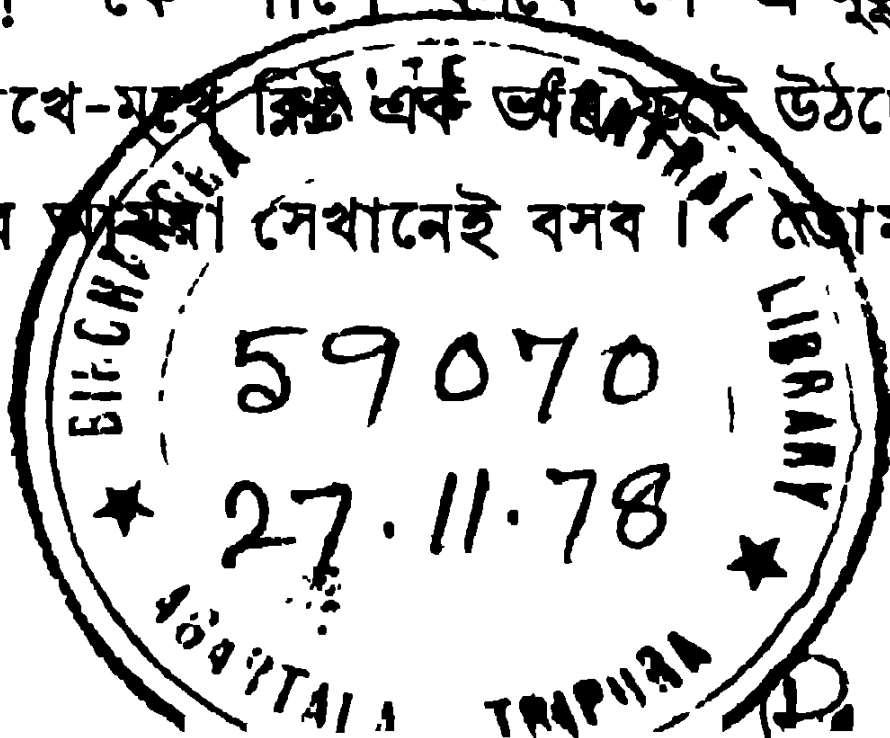
গাড়ীতে কে কোথায় যাবে তুমিই ঠিক করবে। বাবুল এবার গাড়ীটা ফেলে মায়ের কাছে ছুটে গেল। সুরমা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ওর দেরী করে ওঠার অভ্যাস। ঝি আসবে। এসে সব হাতের কাছে এনে দিলে সে রান্না করবে। ওর পেটে কী যেন কষ্ট সব সময়। সামান্য অপারেসনের দরকার। এবং অপারেসন হলেই সুরমা মরে যাবে এমন একটা ভয় তার। বাবুল বিছানার পাশে আসতেই সুরমা মাথায় হাত রাখল। বলল, ভোরবেলা গাড়ী নিয়ে খেলতে নেই। এখন পড়তে বোস। এমন কথায় বাবুল বিষণ্ণ হয়ে গেল। সতীশের দিকে না তাকিয়েই বলল, বাবা তুমি আমার পাশে বসবে। মা দিদি পিছনে বসবে। ভোর হলে সূর্য আপন মহিমায় যেমন আকাশে উঠে আসে, এই বাবুল, ছোট্ট বাবুল সেইরকম দাপাদাপি করে এই সংসার ভরে তুলছিল। পড়ার কথায় সে বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—তার পিছনে কে বসবে? কারণ বাবুলের গাড়ী চার কামরার। সে এবার কি ভাবল। জানালায় পাতাবাহারের গাছ। তারপর পথ। এই প্রাসাদের মত বাড়ীর ভিতর এক ফালি ঘর নিয়ে সতীশ রয়েছে। স্ত্রী সুরমা আছে। এই বড় বাড়ীর দু' পাশে ফুলের বাগান, বাগানে কত বিচিত্র ফুল। এবং বাগান পার হলে পুকুর, পাড়ে পাড়ে আমলকি গাছ। এখন কি মাস সতীশের যেন মনে আসছিল না। ওই আমলকি গাছের ছায়া এবং বন, তার পরে মাঠ, মাঠ পার হলে রেল কলোনীর লাল ইটের বাড়ী এসব তার মনে আসছিল।

বাবুল তখন বলল, তার পেছনে দিদিমা

—আর কেউ নয়?

—না।

—তোমার ঠাকুমা ঠাকুরদা।

এবারেও সে দ্বিধায় পড়ে গেল। সে কিছু না বলে গাড়ীটাকে টেবিলের উপর রেখে দিল। তারপর একটা চেয়ারে বসে ইতিহাসের পাতা খুলে পড়তে বসল। রাম-রাবণের ছবি। রামের মাথায় রাজার টুপি। বড় লম্বা টুপি দেখলে বাবুলের মনে হয় এই বুঝি রাজার টুপি। সে বাবাকে কতবার এমন একটা টুপি কিনে দিতে বলেছিল, সতীশ বলেছিল, রথের মেলা থেকে কিনে দেবে। কিন্তু রথের মেলা থেকে না রথ, না টুপি। সে লম্বা এক রেলগাড়ী কিনে এনেছে।

বাবুল কি ভেবে ফের নিবিষ্ট হল ছবিতে। সতীশ কি ভেবে জানালাতে

পাতাবাহারের গাছ দেখল। আর সুরমা দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল ঝি মঙ্গলা এসেছে কিনা। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ চোখ সুরমার। দুই সন্তানের জননী সুরমা। চোখে-মুখে বিষাদের ছাপ শুধু। সে উঠতেই বাবুল বলল, আমি আর পড়ব না মা।

—কেন পড়বে না?

—বাবা বলেছিল টুপি কিনে দেবে, রাজার টুপি। টুপি না দিলে আমি পড়ব না। বলে সে একটা খাতা টেনে ছবি আঁকতে বসে গেল।

সুরমা ধমক দিল এবার।—বাবুল তুমি পাকা পাকা কথা বলবে না। এখন পড়াশোনা কর। কেবল ছবি এঁকে খাতা নষ্ট করা। সতীশ এসে বলল, তোমার ছেলেমেয়েকে বলে যাবে দুপুরে বাইরে বের না হতে।

এই এক ভয় সুরমার। সুরমার কেন, সতীশেরও। বাড়ীর বাইরে ফুলবাগান, বাগান পার হলে বড় জলাশয়। জলে কালো রঙের শ্যাওলা। এবং বড় গভীর। এত বড় বাড়ীর এক কোণায় সতীশের তিন-কামরার ঘর। প্রাসাদের মত এই বাড়ীর কোন ভগ্নাংশে যেন সতীশ এবং সুরমা তাদের দুই সন্তানের প্রতি স্নেহ নিয়ে জীবনের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দিচ্ছে। সতীশের ভয়, বাবুল একা একা—যখন সুরমা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়বে, যখন নির্জন দুপুরে পাতাবাহারের গায়ে কিছু পাখী ডাকবে—তখন এই বাবুল তালপাতার টুপি মাথায় দিয়ে কাঁধে খেলনার বন্দুক নিয়ে দৈত্য শিকারে বের হয়ে পড়বে। আর সঙ্গে থাকবে মিণ্টু। দুই ভাইবোনে চুপি চুপি বের হয়ে ফুল ফল পাখীর জন্য দারোয়ানদের খুপরি ঘরগুলো অতিক্রম করে আমলকির বনে হারিয়ে মার অসুখের দৈত্যটাকে খুঁজবে।

এই বড় শহরে এসে সুরমার স্বাস্থ্য ক্রমে ভেঙ্গে গেল। সতীশ সেই পাতাবাহারের পাতা দেখতে দেখতে কথাটা ভাবল। এই বড় শহরে বড় নিঃসঙ্গ সে। ক্রমে সে অস্থির হয়ে উঠছে। কারখানার কিছু কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ছে এ সময়। সতীশ একদা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত। সুরমা শিক্ষয়িত্রী ছিল। বড় মাঠ ছিল সামনে। মাঠ পার হলে স্টেশন। স্টেশনে রেলগাড়ী এসে থামত। বাবুল আর মিণ্টু রেলগাড়ী এলে জীবন দপ্তরীর কাঁধে মাঠ পার হয়ে স্টেশনে উঠে যেত। বারান্দায় ইজিচেয়ার থাকত। সুরমা এবং সতীশ বসে বসে ওদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখত। এখন কেন জানি সে সব ছবি স্বপ্নের মত মনে হয়। এখন শুধু কানে

কারখানার ঘণ্টা পেটানোর শব্দ ভেসে আসে। কে যেন অন্ধকারে লাল বলের মত এক অগ্নিগোলক ঝুলিয়ে রেখেছে এবং কারা যেন মাথায় রাজার টুপি পরবে বলে ক্রমান্বয় ঘণ্টা পিটিয়ে যাচ্ছে। এই ঘণ্টা পেটানোর শব্দ কানে এলেই সতীশের হাত-পা কাঁপতে থাকে। কেবল মনে হয় কারা যেন সব সময় হল্লা করে ওর পেছনে ছুটে আসছে। আজ সোমবার। বোনাস সম্পর্কে শ্রমিক পক্ষ থেকে কথা বলতে আসছে। কথায় কথায় বচসা হবে। নানারকমের ভয় ভীতিতে ওর গলা শুকিয়ে আসছিল। সে ঝি মঙ্গলাকে ডাকল। জল, এক গ্লাস জল দিতে বলল মঙ্গলাকে। তারপর জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল এবং সুরমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ ফিরতে দেরী হতে পারে। অযথা আমার জন্য ভাববে না।

সুরমা মুখ ফেরাল না। বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

—কি কথা ?

—বাবার চিঠি এসেছে। অফিস ফেরত চিঠি পড়ে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না বলে দিই নি।

সতীশ সামান্য হাসল। —কই দেখি চিঠিটা। সুরমা বালিশের নীচ থেকে চিঠি বের করল এবং সতীশের হাতে দেবার সময় বলল, এ নিয়ে তুমি মাথা গরম করবে না। সুরমা সতীশকে শপথ করাতে চাইল। সতীশ জবাব দিল না। চিঠির ভাঁজ খুলে সেই বৃদ্ধ মানুষটির হস্তাক্ষর দেখল। হস্তাক্ষরের সতেজ সবল ভাবটা ক্রমে কেটে যাচ্ছে। পরম কল্যাণবর—এখন এই শব্দ এবং অর্থ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সতীশ গত মাসে বাড়ীতে নিয়মিত যে টাকা দেয় তা দিতে পারে নি। তাঁর কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হবার দরুণ রোজগার কমে গেছে। সুতরাং বাজেট ঘাটতি। বাবা নিশ্চয়ই চিঠিটা খুব রেগে গিয়ে লিখেছেন। সে পড়ল—তুমি অবিবেচক হয়ে পড়েছ। শুনেছি তোমার আয় পাঁচশত টাকার মত। আমাকে প্রতি মাসে একশত টাকা দাও। আমরাও চারজন, তোমরাও চারজন।...এ মাসে সেই সামান্য দান তুমি আরও সংক্ষিপ্ত করেছ। এই বৃদ্ধ বয়সে অনাহারে দিন যাপন করতে হবে ভাবতে কষ্ট লাগে। কল্যাণীর সম্বন্ধ এসেছিল। পাত্রপক্ষ কলকাতায় তোমার বাসার কাছেই থাকে।...সতীশ কেমন অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা পড়ছে। পাত্রপক্ষের খোঁজ-খবর নেবে। নিম্নে ঠিকানা দেওয়া থাকল। শেষে আরও

অস্পষ্ট কয়েকটি শব্দ। সতীশ চোখের কাছে এনে উদ্ধার করতে পারল। যতীনের আবার একটি মেয়ে হয়েছে। দাদা কি ক্ষেপে গেলেন। সতীশ কেমন অসহিষ্ণু গলায় না বলে পারল না। এবার পত্রের খুব নীচে 'পুনঃ' এই শব্দ ব্যবহারে চিঠি শেষ করেছেন। তুমি লিখেছ একা তোমার পক্ষে সংসারের দায়দায়িত্ব বহন করা ক্রমে কঠিন হয়ে পড়েছে। তুমি বলতে চাইছ, যতীন সংসারে সামান্য সাহায্য করুক। যতীন রেলে চাকুরী করে। সামান্য তিনশত টাকা মাহিনা। ছয়টি কন্যাসন্তান এবং ওরা দুজন। তাও বড় মেয়েটিকে আমি এ-মাসে নিয়ে এসেছি বলে রক্ষা। তিনি যেন দয়া করে পত্র শেষ করেছেন। চিঠিটা সতীশ ভাঁজ করে সুরমাকে দিয়ে দেবার সময় কথাটা না ভেবে পারল না।

বাবার এই এক অজুহাত। সংসারে সতীশ সামান্য বেশী আয়ের চাকুরী করে বলে এবং বিদ্বান বলে সব চাপ ওর উপর। সুরমা সংসারে বড় ঘর থেকে আসায় এবং মা বাবার অমতে বিবাহের দরুন সকলেই সুরমার প্রতি যেন সংগোপনে আক্রোশ বহন করে বেড়াচ্ছে। কারণ বিয়ের আগে সতীশ শেষ কপর্দক মায়ের হাতে দিয়ে দিয়েছে এবং সংসারে সেই প্রায় সব ছিল। কোথাকার এক উটকো যুবতী এসে সতীশকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। সতীশ চিঠিটা সুরমার হাতে দিয়ে বলল, ভেবেছি বাবুলকে দাদার কাছে দত্তক দিয়ে দেব।

সুরমা বলল, তার মানে?

সতীশ হাসতে হাসতে বলল, দাদার পুত্রসন্তানের বড় শখ।

—শখ না বলে বল স্বার্থপর মানুষ। সুরমা ক্ষেপে গেল। এই মানুষ সতীশ যেন উৎসর্গকৃত প্রাণ। সব দায় দায়িত্ব তার। কেন বাপু—সুরমার রুগ্ন হাত-পা কাঁপতে থাকল, অন্য দুই ভাই আছে তোমার, ওরা কাজ করছে। লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টায় ক্রটি ত তুমি কর নি। শুনেছি তুমি টিউশনি করে, পত্রিকা হকারী করে তোমার পড়ার খরচ চালিয়েছ। আর তুমি ছোট ভাইদের পড়ার জন্য কি না করেছ—ওরা মানুষ না হলে কার দায়। সামান্য একটানা কথা বললেই সুরমা বড় বেশী কাতর হয়ে পড়ে। সে বিছানায় উঠে বসল।—ওরাও কিছু কিছু করে বাবাকে সাহায্য করতে পারে।

সতীশ তেমনি সরল সহজ মুখে বলল, দেখলে ত মাথা খারাপ কে করছে।

সুরমা বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, আমার বাবুলকে আমি দিতে যাব কেন ?

—না দিলে দাদা রেস চালিয়ে যাবে। সতীশ ঠাট্টা করে বলল।

—রেস চালালে দারিদ্র্য বাড়বে। তাতে আমার কি। সুরমা ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। সতীশের ভাল লাগছিল সুরমাকে রাগিয়ে দিতে। বলল, দাদার কাছে থাকাও যা আমার কাছে থাকাও তাই।

—বাবুল আমার! সংসারে তুমি তোমার মা-বাবা-দাদার জন্য সব করতে পার। আমি পারি না। তোমার যা চাকরি—কবে কোনদিন সব যাবে আমাদের। আমরা পথে গিয়ে দাঁড়াব। কি সঞ্চয় তোমার বল ? এতদিন চাকুরি করে কি করেছ তুমি ? মিণ্টু বড হচ্ছে। ওদের দিকে তুমি একবার ভাল করে তাকাও। তোমার কারখানা, শ্রমিক, মা-বাবা দাদা ওরাই সব। তারপর আরও কি বলতে গিয়ে সুরমা থেমে গেল। এই এক অভ্যাস সুরমার। রেগে গেলে সকলকে টেনে আনবে। কোথায় যেন সুরমা অনিশ্চয়তায় ভুগছে। সতীশ নিজেও মাঝে মাঝে জীবনযাপনের নিরাপত্তাবোধের অভাবে ভুগছে। কারখানায় ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে ঋণ বাডছে এবং কারখানার নাভিশ্বাস উঠছে। সে যেন কোনদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পুরানো যন্ত্রপাতি এবং প্রাচীন সব পদ্ধতির জন্য প্রতিযোগিতায় ক্রমে তারা হটে যাচ্ছে। ফলে কারখানার দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠলেই মনে হয়, এক বড অগ্নিগোলক, অতিক্রম করতে পারলেই রাজার মাথায় টুপি। সতীশ বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই অগ্নিগোলক অতিক্রম করতে পারছে না। সতীশ জামা-কাপড় পরার সময় ভাবল, বাবুলকে আজ হোক কাল হোক সে একটা টুপি কিনে দেবে। সে রাজার টুপি পরে রাম অথবা রাবণ সেজে বাবাকে ভয় দেখাবে। সে ডাকল, বাবুল তোমার পডা হয়েছে ?

কোথায় বাবুল! তখন বাবুল টেবিলের নীচে বসে মা'র অসুখের দৈত্যটাকে খুঁজছে। হাতে বন্দুক, কোমরে বেল্ট এবং তাতে আঁটা চকচকে লোহার পাত। সব রাংতা দিয়ে মোড়া। মনে হয়, বাবুল যথার্থই সৈনিক সেজে এই সংসার থেকে সব অমঙ্গল দূর করে দিতে চাইছে। বের হবার মুখে সুরমা ফের সতীশকে বলল, ওদের তুমি বারণ করে যেও।

সতীশ বলল, মিণ্টু তুমি বাবুলকে নিয়ে দুপুরে বের হবে না।

বাবুল টেবিলের নিচে থেকে বলল, না বাবা, আমি বের হব না। দিদি আমাকে কেবল যেতে বলে।

মিণ্টু বলল, হ্যাঁ আমি তোমাকে কেবল যেতে বলি। নিজে যেন যেতে জানে না। ওদের ঝগড়া দেখে সতীশ বলল, তুমি যাবে না। তুমি সাঁতার জান না। জলে পড়ে গেলে কেউ টের পাবে না। তারপর ভয় দেখানোর জন্য বলল, পুকুরটাতে বড একটা অজগর সাপ আছে। যাবে না। গেলেই খেয়ে ফেলবে। এক জলাশয়ের দৃশ্য সতীশকে কেমন ভীত বিহ্বল করে রাখে। অথবা অফিসে সময় সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে মনে হয়, বাবুল এবং মিণ্টু যেন এক প্রাচীন দিঘির পুরানো ভাঙ্গা সিঁডিতে দাঁডিয়ে কি যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেডাচ্ছে। মা রুগ্ন। মা সারাদিন শুয়ে থাকেন। মা'র জন্য বনের ফুল ফল অথবা মা'র জন্য অমৃত ফল তুলে আনতে হবে। জলাশয়ের পারে পারে ওদের ছুটে বেডানোর দৃশ্য সতীশকে মাঝে মাঝে বড অন্যমনস্ক ক'রে দেয়।

পথে বের হলেই মিশনারীদের এক বড দেয়াল এবং সদর গেট। একটু পথ হেঁটে বাসে উঠতে হয়। সেখানে এক কুষ্ঠরুগীর মুখ, তার হাত হাওয়ায় নিয়ত দুলতে থাকে। বয়সে প্রাচীন সেই নারীর গলিত শবের মত হাত পা মুখ; আর কী করুণ ইচ্ছা তার দু' হাতে সূর্য স্পর্শ করার। সতীশ এখানে এলেই সামান্য সময় দাঁডায়, কিছু সাহায্য দেয়।...তারপর যদি তুমি কোনদিন ছাখো সংসারের সব দুর্যোগ তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে? এমন কথা মনে হয়, তখন? সতীশ তখন ছুটে পালাতে চায়, কিন্তু কে যেন তখন পাখীর মত ডেকে ডেকে বলে, বাবা তুমি আমায় রাজার টুপি কিনে দেবে না? তুমি আমাকে বড় মাঠে নিয়ে যাবে না?

অফিসে ঢুকেই সতীশ শুনল, দু'জন লোক ওর সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে। সে টেবিলের উপর কিছু চিঠি পডে আছে দেখতে পেল। লোক দু'জন বাইরে বসে আছে। সে বেল টিপে অবিনাশবাবুকে ডাকাল। বলল, কারা এসেছে? কি চায় ওরা? ইউনিয়ন থেকে আসে নি তো! সতীশ ওদের ডাকাল। এবং বলল, আপনি বসুন অবিনাশবাবু। ওরা এলে বলল, কি চাই? ওরা জবাবে বলল, স্যার প্লেট কিনতে চাই।

সতীশ এবার চেঁচিয়ে উঠল।—এখানে প্লেট বিক্রি হয় না। এখানে প্লেট কেনা হয়। সে কেন জানি সহসা মাথা গরম করে ফেলল। মাথা গরম করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। সে খুব শান্তশিষ্ট বালকের মত মুখ করে বসে থাকার চেষ্টা করে দেখল, ওরা কিছু বলার চেষ্টা করছে।—বলুন। ওরা সাহস পেল যেন বলতে। স্যার অনেক কোম্পানী ত আজকাল কোটা বের করে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

আমরা দিচ্ছি না। অথচ সতীশ জানে আজকাল ব্যবহারের চেয়ে বিক্রি ভাল। বিক্রিতে লাভ বেশি। কর্তৃপক্ষের বিক্রির দিকে একটা ঝোঁকও আছে। অথচ এইসব মিথ্যাভাষণের দায়দায়িত্ব তার থাকবে। সে অত্যন্ত কষ্ট করে যেন বলল, এখানে তা হয় না। লোক দু'জন উঠে গেলেই একটা কোলাহল শুনতে পেল। সকলে মিলে অফিসের দিকে ছুটে আসছে। ফ্যাক্টরির ভিতর মোটর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চাকা থেমে গেছে।—কি, কি হল? সতীশ অবিনাশকে বলল, দেখুন ত কি ব্যাপার! ওরা সকলে ছুটে আসছে কেন! তখন বাইরে গলা পাওয়া গেল—স্যার অ্যাক্সিডেণ্ট। তেওয়ারীর হাত উড়ে গেছে। এখন অ্যাক্সিডেণ্ট রিপোর্ট—হাসপাতাল এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ওদের কোলাহল আসছে না। সতীশ অন্য এক সহকারীকে ডেকে বলল, ওরা সকলে বাইরে কেন। ওদের ভেতরে যেতে বলুন, কাজ করতে বলুন। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

দু'জন লোক তেওয়ারীকে হাসপাতালে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সতীশ ওদের ডেকে বলল, এবার তোমরা বল কি বলবে?

—স্যার পাঞ্চিং মেসিন খারাপ ছিল।

—সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করেছ?

ওরা বলল, করেছি। তবু সুপারভাইজার ওকে কাজ করতে বলেছেন।

সতীশ মনে মনে হাসল। কারণ এমন সব অভিযোগে সব সময় সত্যমিথ্যা জড়িত থাকে। শ্রমিকপক্ষ সব সময় কর্তৃপক্ষের উপর দোষটা চাপাতে চায়, কর্তৃপক্ষ শ্রমিকপক্ষের উপর। সে কী চিন্তা করে বলল, চল দেখছি। ভিতরে ঢুকে সে নিজেই প্যাডেলে চাপ দিল এবং বলল, কই ডাবল ত পড়ছে না। ঠিক আছে মেশিন। নিশ্চয়ই তেওয়ারী অন্যমনস্কভাবে কাজ করছিল তারপর সে চাবিটাতে হাত দিলে বুঝল ভিতরে চাবির ঘাট ক্ষয়ে গেছে। ঘাট ক্ষয়ে গেলে মাঝে মাঝে চাবি ধরবে না এবং ডবল পড়ার

সম্ভাবনা আছে। ভিতরে ভিতরে তার বুক কাঁপছিল। মেশিন আজই খুলে ফেলতে হবে। অন্য চাকা এবং চাবি লাগিয়ে দিতে হবে। সে অজুহাত বের করার তালে চারিদিক কি খুঁজে দেখল, কিছু ভাজা-ভুজির অংশ নিচে এবং নিচের দিকে চোখ রেখেই বলল, এখানে এসব কেন? নিশ্চয়ই খেতে খেতে পাকিং চালাচ্ছিল তেওয়ারী। সে অভিযোগটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিতে পারলে কোনো ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন থাকবে না। দায় দায়িত্ব সব শ্রমিকের। ইউনিয়নের দুজন পাণ্ডা লোক ডেকে চারপাশটা দেখাল—এখানে এসব কি হয়! সে সুপারভাইজারকে পর্যন্ত শাসাল। ঘটনাটাকে এবার হুস করে কাক তাড়ানোর মতন ফুস মন্তরে মুছে দিতে চাইল।

সে রিপোর্টে লিখল, কাজে অন্যমনস্কতা এবং দুর্ঘটনা। দু'জন শ্রমিককে সাক্ষী নিয়ে রিপোর্ট লিখে দিতেই প্রাণের ভিতরে কেমন যেন এক রক্তশোষা জীব উঁকি দিয়ে ফের রক্তের ভিতরে ডুবে গেল। যা হয় প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য বেশি, দুই মুখ তখন উঁকি দেয়—মিণ্টু বাবুলের মুখ। রক্তশোষা জীব যেন এবার ওদের তেড়ে যাচ্ছে। বাবুল একবার ছবিতে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখেছিল। যুদ্ধ দেখে বলেছিল, বাবা আমি রাম সাজব। আমাকে রাজার টুপি কিনে দেবে বাবা। রিপোর্টে সই করার পরই সতীশের মেজাজটা কেমন রুক্ষ হয়ে গেল। রথের মেলা থেকে রাজার টুপি কিনতে হবে সেকথা সে ভুলে গেল।

সে অফিসে বসে অন্যমনস্কভাবে কতগুলি বিল সই করল। চিঠি সই করল। চিঠি অথবা বিল সই করার সময় অন্যান্য দিনের মত সে সবটা পড়ে সই করল না। এমন কি একবার চোখও বোলাল না। এই এক বিশ্রী অভ্যাস তার, ভিতরে কোন পাপবোধ কাজ করতে থাকলে সে কেমন ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। সংসারের বিবিধ কারণ শিয়রে তার সোনার কাঠি রাখতে দিচ্ছে না। সে অসহায় আর্ত এক মানুষ। তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না তেওয়ারীর রিপোর্ট এমন হোক। তবু কার জন্য, বুঝি দুই শিশু-সন্তান এবং যুবতী রুগ্না স্ত্রী আর মা বাবা ভাইবোনের কথা ভেবে সোনার কাঠি সে শিয়রে রাখল না। সব ফেলে দিয়ে সে কেমন অমানুষ এবং ক্রীতদাস হয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় তেওয়ারীর বউটা কাঁদছিল। জানালা দিয়ে সতীশ সেই মুখ দেখল। সতীশ ক্রমে ক্ষেপে যাচ্ছে। এই

ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না সে সহ্য করতে পারছে না। ক্রমে সে অসহায় হয়ে পড়ছে। সে উঠে দাঁড়াল এবং অফিসের ভিতর পায়চারি করতে থাকল—যেন সে. সাহস সঞ্চয় করছে। সে অবিনাশকে ডেকে বলল, ওদের এবার যেতে বলুন। এখানে কান্নাকাটি করে আর কি হবে। বস্তুত সতীশ এখন নিরালম্ব মানুষের মত। সংসারের অন্ধকারে এক কালো ঘোড়া আছে তাতে চড়ে নিরন্তর ডাইনি-বুড়িটা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যেমন হয়—কোন দুঃখের ছবি, আর্তের কষ্ট আর—নিরাপত্তাবিহীন জীবিকা দেখলে যেমন হয়, সংসারে পাখী ওড়ে না। মরুভূমির মত মাঠ শুধু সামনে, আর এক উট—দীর্ঘ পথবাহী নদী নালা বিহীন মাঠে অনবরত উট ছুটছে। সতীশ তেমনি নিজেকে কিসের আশায় ছুটতে দেখল। কারা যেন পেছনে তাড়া করছে; ফুটপাথের বাসিন্দা, অনাহারে মৃত বালকের ছবি এবং সেই কুষ্ঠরুগী। সে এবার চীৎকার করে উঠল, অবিনাশবাবু।

—আজ্ঞে, আমাকে ডাকছেন স্যার।

—দেখুন ত তেওয়ারীর বউটা এখনও কাঁদছে কিনা।

—না স্যার কাঁদছে না। কখন ওরা চলে গেছে!

সতীশ কেমন নিশ্চিন্ত মনে এবার বসে পড়ল। সে দুই হাতলে হাত রেখে শরীর সোজা করে দিল। কোনও দিকে তাকাল না। বোনাস সম্পর্কে কথা বলতে হবে আজ, সম্ভবত ঘেরাও করবে শ্রমিকেরা এবং ওদের দাবিদাওয়া নিয়ে চীৎকার চেঁচামেচি হবে। সে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে কোম্পানীর যে কী ভয়ঙ্কর দূরবস্থা চলছে, আর এ-ভাবে চললে বেশীদিন কাজ চালানো যাবে না, উৎপাদন না বাড়ালে প্রতিযোগিতায় হটে যেতে হবে—এ সব নিয়ে নিজের মনেই যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করতে করতে কখন দেখল সতীশ আর সতীশ নেই—সে এক ভাঙ্গা রেলগাড়ী হয়ে গেছে। ওকে সাইডিংএ ফেলে ঝকঝকে নীল রঙের ট্রেন ওর সামনে ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে। সে এবার সোজা হয়ে বসল এবং বলল, হবে না। শ্রমিকেরা বলল, তা কি করে হয়। সে বলল, পাঁচ বছরে আমি তোমাদের বেতন ডাবল করেছি, তোমরা উৎপাদন এক বিন্দু বাড়াও নি। কোম্পানী সেই অনুপাতে মালের দাম বাড়াতে পারে নি। আমরা ক্রমশ হেরে যাচ্ছি—কোম্পানীর ক্রমশ ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বলা নিরর্থক, ওরা কিছুই শুনবে না। উৎপাদন বাড়াবে না। সে এবার বলল, সরকার তোমাদের বোনাসের যে রেট বেঁধে

দিয়েছেন তাই পাবে। মানে ফোর অর ফরটি…বলে সতীশ শেষ করতে পারল না। সমস্বরে চীৎকার শোনা গেল—আমাদের দাবী মানতে হবে। সতীশ এবার অবিনাশবাবুর দিকে তাকাল। অবিনাশবাবু বিনোদবাবুর দিকে তাকাল—ওরা সকলে ঘেরাও হয়ে গেল—ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কথা বলতে পারছিল না। ক্রমে এ-অঞ্চলে অন্ধকার নেমে আসছে শুধু এইটুকু ওরা টের পাচ্ছে। তোমরা দরজা ছেড়ে দাও—আমরা যাব। সতীশের বলার ইচ্ছা হল। কিন্তু দরজায় মানুষগুলো আরও জট পাকিয়ে বসল। এবার ওরা তেওয়ারীর কথা তুলবে। জুলুমের কথা তুলবে। সতীশ ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগল। বাবুলটা এখন কি করছে কে জানে! যা ছেলে! মা'র অসুখ বাড়লে ছেলের ফুল ফলের জন্য যেন আকর্ষণ বেড়ে যায়। সে এবার অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন তবে উঠি। কিন্তু যারা দরজা আগলে বসে ছিল তারা বসেই থাকল। উঠল না কেউ। সতীশ অথবা অবিনাশকে দরজা ছেড়ে ছিল না। ওদের দাবী না মেনে নিলে সতীশ এবং অবিনাশ যেতে পারবে না। ওদের পাংশু এবং ভয়ঙ্কর চোখ কেমন বিব্রত করছে সতীশকে। সতীশ ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। এমন মুখ ওদেব দেখলে মনেই হয় না সামান্য কথায় এখন দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। সে বলল, দরজা ছেড়ে বস। আমরা যাব। ওরা আরও ঘন হয়ে বসল, দরজা পুরোপুরি আটকে দিল। আমাদের দাবী মানতে হবে—দরজা আটকে দিয়ে এমন কথা বলতে চাইল।

—তবে তোমরা আমাদের আটকে রাখতে চাও।

—সে আমরা পারি স্যার!

—কি আমার বিনয়ের অবতার—সতীশ যথার্থই ক্ষোভে দুঃখে বলে ফেলল। সে অবিনাশবাবুর দিকে তাকাল—কি করবেন এখন, এমন বলার ইচ্ছা। অবিনাশবাবু একটা কাগজ দলা পাকাচ্ছিল। কাগজের সেই খণ্ড বিনোদবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিল—যেন এক ধরনের খেলা। অবিনাশবাবু কাগজের গুলতি তৈরি করে পাখী শিকার করবেন এমন এক মুখ করে উঠে দাঁড়ালেন। একমাত্র পুলিসের সাহায্য এই সময় দরকার। এইসব মানুষ বিনয়ের অবতার অথচ ফোনে হাত রাখলে হা হা করে ছুটে আসবে। সুতরাং অবিনাশ ঘরের ভিতর উটের মত মুখটি তুলে পায়চারি করার সময় বিনোদবাবুকে সংকেতে কি সব বলে দিতেই তিনি বের হয়ে গেলেন। প্রায়

একশত মুখ এখন দরজায় জানালায়। কিছু কিছু মানুষ সামনের মাঠের অন্ধকারে উঁকি দিয়ে আছে। সাহস সঞ্চারের জন্য ওরা মাঝে মাঝে ধ্বনি দিচ্ছিল—আমাদের দাবী মানতে হবে। যেন ওরা বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে বসে আছে, অবিনাশ অথবা সতীশ বের হলে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। তখন বিনোদবাবু সদর রাস্তায় হাঁটছিল—হাতে আবেদনপত্র—উই আর রংফুলি কনফাইণ্ড। সে রাস্তায় নেমে চিঠিটা পড়ল এবং দৌড়ে থানায় জমা দিলে পুলিশ-গাড়ী এল। নিমেষে সব কিছু ফাঁকা হয়ে গেল। সতীশ পুলিসের গাড়িতে বসে কেমন কাপুরুষের গলায় বলল, তেওয়ারীর বউটা খুব কাঁদছিল অবিনাশবাবু।

ঘরে ফিরে সতীশ দেখল, সুরমা শুয়ে আছে। ক্ষোভ দুঃখ হতাশা ক্রমে জোয়ারের জলের মত বাড়ছে। সুরমাকে শুয়ে থাকতে দেখে সে কেমন ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে।—তুমি এখন শুয়ে আছ, বলার ইচ্ছা সতীশের। ও-ঘরে কার গলা!—কে এল সুরমা! সুরমা না তাকিয়েই বলল, বড়দা এসেছেন। সতীশ বলল, বাবুল কোথায়!

—বাবুল দাদাকে কবিতা শোনাচ্ছে।

—তুমি কখন এলে? সতীশ দরজায় মুখ রেখে বলল। বাবুল লাফাচ্ছে, গাইছে এবং ছুটে ছুটে কবিতা আবৃত্তি করছে। এখন পড়ার সময়। কেউ এলেই বাবুলের দাপাদাপি বেড়ে যায়। সে এখন পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছে। —তুমি পড়তে বসো বাবুল। সে বাবুলকে ধমক দেবার সময়ই মনে করতে পারল কাপুরুষের মত সে আজ পালিয়ে এসেছে। এই কাপুরুষ ভূমিকার জন্য সে কেমন নীচ হীন হয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই বড়দা কোন কাজ উদ্ধারের আশায় এসেছেন। বড় মেয়েটিকে বাবার কাছে রেখেছ, মেজ মেয়েটিকে আমার কাছে…কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল, চা জলখাবার খেয়েছ?

—খেয়েছি সব। এখন তুই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে আয়। কিছু জরুরী কথা আছে।

হাত মুখ ধুলে জরুরী কথা, সেই এক কথা—সম্বন্ধটার কি করলি! পাত্রপক্ষ পণ চাইছে। দাবী দাওয়া অনেক। এমন পাত্র ছাড়াও যাবে না। ওদের

কল্যাণীকে খুব পছন্দ হয়েছে। সতীশ দাদার কথা বোধ হয় ভালভাবে শুনতে পাচ্ছিল না। সে বাবুলকে দেখছে। বাবুল তাক থেকে কি সব নামাচ্ছে। কাচের পাত্র হলে ভেঙ্গে যাবার ভয়। দাদার সামনে খুব জোরে সে ধমকও দিতে পারছে না। দাদা আহত হতে পারেন। সে খুব নরম গলায় বলল, বাবুল তুমি নীচে নেমে এস। পড়ে যাবে। পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে। বাবুল কথা শুনছে না। জ্যাঠামশাইকে দেখে ওর বেজায় সাহস বেড়ে গেছে। রাগে সতীশের মাথায় রক্ত উঠে আসছে। তখন দাদা বললেন, সকলে তোমার আশায় আছে। যদি তুমি মত না দাও তবে এ পাত্রটিও হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

সতীশের দু হাত তুলে চীৎকার করতে ইচ্ছা হল, আমাকে তোমরা কি ভাব! আমি কি চুরি করব! আমাকে তোমরা চুরি করতে বলছ! আমার কি আছে! আমি কোথা থেকে এত টাকা পাব। সতীশ অথচ ক্ষোভে এবং দুঃখে জবাব দিতে পারল না। সে মাথা নীচু করে বসে থাকল। এবং ধীরে ধীরে বলল, দেখি কি করতে পারি। দাদা চলে গেলে হতাশ মুখে ঘরে ঢুকল সতীশ। ওর চোখ মুখ টানছে। ক্লান্তিকর জীবন এবং সারাদিনের খণ্ড খণ্ড হঠকারী ঘটনা ওকে কিছুতেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না। বাবুলের উপর রাগটা কিছুতেই মরছে না। বাবুলের কাছে সতীশ বুঝি ধরা পড়ে গেছে। কাপুরুষের মত চোখ যার, যার মাথা উঁচু নয়—সে মেলা থেকে কি করে রাজার টুপি কিনবে। সে চেষ্টা করছিল ভেতরের রাগটা দমন করতে। ভেতরের রাগ দমন হলে বাবুলকে পড়তে বলবে। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই সুরমা সতীশকে অভিযোগ করল, তুমি বারণ করে গেছিলে ছেলেমেয়েকে বাইরে বের হতে। দেখবে কোনদিন ওরা জলে ডুবে মরে থাকবে। দুপুরে কোন ফাঁকে বের হয়ে গেছে।

সতীশ এবার দু-হাত উপরে তুলে ছুটে গেল। যেন সে মেরে ফেলবে বাবুলকে। সে বলল, বাবুল তুমি বাইরে গিয়েছিলে, পুকুরে গিয়েছিলে! সতীশের এক ভয়, নিরন্তর এক ভয়। বাবা আজ তাকে মারবে বুঝে বাবুল ছুটে বারান্দায় চলে গেল। সতীশ বারান্দায় গেলে বাবুল ঘরে। ঘর বারান্দা, দুই দরজা দিয়ে সামান্য এক বাবুল সতীশকে ঘর আর বারান্দায় ছুটিয়ে মারছে। বাবা কেমন এক দৈত্য হয়ে গেছে। সে ছুটছিল আর বলছিল, বাবা আর যাব না। তোমার পায়ে পড়ছি বাবা আমি আর যাব না। সে

হাউ হাউ করে কাঁদছিল। সতীশ চীৎকার করছিল, বাবুল তুমি ছুটবে না। বাবুল তত বলছিল, তুমি আমাকে মেরো না বাবা, আমি আর যাব না। কিন্তু হায় কে কাকে রক্ষা করে—সতীশ ছুটতে ছুটতে সত্যিই অমানুষ হয়ে গেল অথবা এক দৈত্য, সে বাবুলের চুলে ধরে ফেলল , তারপর দু হাতে উপরে তুলে দোলাতে থাকল আর নির্মম আঘাতে আঘাতে ওকে জর্জরিত করল। সুরমা ছুটে এসে ধরে ফেলল, তুমি কি পশু হয়ে গেছ, তুমি কি ছেলেটাকে মেরে ফেলবে ?

মিণ্টু তখন খাটের নীচে চলে গেছে। কারণ বাবুলের হয়ে গেলেই বাবার মিণ্টুর কথা মনে পড়তে পারে।

খেতে বসে সতীশ বলল, ওদের দিলে না ?

—তোমার দেরি দেখে ওদের খাইয়ে দিয়েছি।

সতীশ থালায় বড় পুঁটিমাছ ভাজা দেখে বলল, মাছ! কে মাছ দিল! কারণ সতীশের মাছ সপ্তাহে দু দিন, একদিন ডিম এবং রবিবারে মাংস। বাবুলের মাছ না হলে হয় না। কিন্তু সতীশকে বাজেট রক্ষা করতে সপ্তাহে তিন দিন নিরামিষ খেতেই হয়। নিরামিষ খাবার কথা! বড় পুঁটিমাছ দেখে সতীশ তাজ্জব বনে গেল।

সুরমা বলল, তোমার ছেলের কাণ্ড। পুকুর থেকে দারোয়ানদের কেউ মাছ ধরছিল। ওকে তিনটে মাছ দিয়েছে।

—ওকে দিয়েছে না, ও চেয়ে এনেছে।

—সে আমি জানি না। মাছ দিয়ে বলল,একটা বাবা খাবে। একটা আমি খাব। সতীশের গলায় মনে হল ভাত আটকে যাচ্ছে। সুরমা মাছ প্রসঙ্গে এত বলছিল যে সতীশের গলায় ভাত আটকে যাচ্ছে। জানো! সুরমা বড় বড় চোখ করে বলল, বড় মাছটা বাবা খাবে। জানো! সুরমা এবার ডালের বাটি এগিয়ে দেবার সময় বলল, বিকেলে সারাক্ষণ ছুটে এসে দেখে গেছে মাছ ঠিকমত রেখেছি কিনা—না বেড়ালে বাদুড়ে খেয়ে নিল—ওর কি উদ্যম এই মাছের জন্য, কোথায় রেখেছি, কি ভাবে রেখেছি—কি উৎসাহ ছেলের—বড় মাছটা ওকে খেতে দিলে খেল না, তোমার জন্য তুলে রেখে দিল—বাবা খাবে।

সতীশের কি যেন কষ্ট ভিতরে। এবার যথার্থই গলায় ভাত আটকে গেল। সে জল খেল ঢক ঢক করে। সে ভাতগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে

থাকল। কোথায় যেন এই বর্ষার রাতে একটা ব্যাঙ ডাকছে। সতীশের ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কে এই শিশু কি তার পরিচয়—সারা সংসার জুড়ে সে যেন কেবল দাপাদাপি করে বেড়ায়। এখন মনে হল সে নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর ভাবে অসহায়। যত অসহায় বোধ করছে তত এই সংসারের সবকিছু অপ্রীতিকর ঠেকছে। সুরমার রুগ্ন মুখ বাবুলের অসহায় চোখ এবং দাবদাহের মত এই সংসার নিয়ত ওকে ভীত বিহ্বল করে দিচ্ছে। সে ভয়ে খেতে পারল না। বাবুলের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে ওর ভিতরে ভিতরে জলের স্রোতের মত এক কান্না এল। সে আবেগে কেমন অস্থির হয়ে উঠল এবং যেখানে বাবুল কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে বুকে তুলে যেমন অন্যদিন নিজের বিছানায় নিয়ে আসে, বুকে নিয়ে শুয়ে থাকে এবং দু'হাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তেমন—এখন সেই ভালবাসায় সন্তানের মত দেখতে গিয়ে মনে হল, পিঠে বড় বড় দাগ, ফুলে কেটে গেছে। অন্ধকারে রক্তপাত হচ্ছিল। সতীশ সেই মানুষের মত, হায় এক মানুষ—ক্রীতদাস-প্রায় মানুষ। সতীশ পাগলের মত ওর পিঠে মুখে ভালবাসার হাত ছড়িয়ে দিতেই চাপ চাপ রক্ত। সে তার দুই নরকপ্রায় হাত নিয়ে ছুটে গেল, ছাখো সুরমা আমি কি করেছি। ক্ষত স্থানে হাত পড়তেই বাবুল ককিয়ে উঠল। এক অমানুষ, ভিতরে এক অমানুষ কেবল খেলা করে বেড়ায়। সতীশ দু'হাত সুরমার মুখের সামনে ধরে চীৎকার করে উঠল, আমি কি করেছি ছাখো।

তারপর বাবুলের পাশে বসে আহত স্থানগুলোতে নরম নরম চাপ দিলে দেখতে পেল টেবিলে নীল আলো জ্বলছে। রাত ক্রমে গভীর হয়ে আসছে। কোথাও আর যেন রাতের কীটপতঙ্গ ডাকছে না। ধরণী শান্ত এবং স্থির। সে দেখতে পেল তখন নীল আলোর ভিতর দুই ছবি। রাম রাবণের ছবি। রামের মাথায় রাজার টুপি রাবণের মাথায় কাক। নীচে বাবুল ভাল নামে সই করেছে—শুভাশিষ। রাত ক্রমে আরও গভীর হয়ে আসছে। সতীশের এখন সারাদিনের ঘটনা এক দুই করে মনে হতে থাকল। তেওয়ারীর বউটা বোধ হয় বসে বসে এখনও কাঁদছে। সংসারে কি যে শুভ কি যে অশুভ এ সময় সে কিছুই স্থির করতে পারল না। কেবল দেখল বাইরে বাবুলের রেলগাড়ীটা সাদা জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে। বর্ষাকালের বৃষ্টি—এই আসে এই যায়, এই সাদা জ্যোৎস্না এই অন্ধকার। বাবুলের রেলগাড়ীতে সে যেন এখন একা

বসে আছে। কেউ নেই। সকলে ওকে এক বড় মাঠে ফেলে কোন এক অজ্ঞাত ষ্টেশনে নেমে গেছে। সে শুধু এনজিনটা নিয়ে মাঠের ভেতর ভূতের মত রেলগাড়ী হয়ে গেছে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠলে সে আর রেলগাড়ী থাকল না। বাবুলের জন্য রাজার টুপি কিনে আনতে হবে, সুতরাং সতীশ ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দিল। সে যে ক্রীতদাস এ সংসারে তা আর মনে থাকল না। সে বাবুলকে কাঁধে নিয়ে পাতাবাহারের গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য দেখতে দেখতে বলল, সামনের দিকটাকে আমরা পূবদিক বলি, ডানদিক দক্ষিণ, পেছনের দিকে সূর্য অস্ত যায় বলে পশ্চিম এবং বাঁদিকে—তুমি যত দূরেই চলে যাও না উত্তর দিক হবে। সতীশ ছেলেকে কাঁধে নিয়ে ভোরবেলায় আজ কি ভেবে দিকনির্ণয় শেখাতে থাকল।

কাফের

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

গাধাগুলোকে সে রাতে আর জল দেখানো গেল না। গরুগুলো গোয়ালে হাম্বা হাম্বা করে ডাকছিল। এবং বাবুদের ঘোড়াগুলোর চিৎকারে ধরা যাচ্ছে যে, এই হত্যাকাণ্ড থেকে কেউ বাদ যাচ্ছে না। নিশুতি রাত। গ্রামগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঠে মাঠে মানুষের আর্তনাদ, কখনও পোড়া মাংসের গন্ধ আর এক হাহাকারের ছবি মাঠময় প্রেতের মত ভেসে বেড়াচ্ছিল। সকলেই প্রায় পালাচ্ছিল। অন্ধকার মাঠের ভিতরে, ঘাসের ভিতরে অথবা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে পালাবার জন্য ছুটছিল। যুবতীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরাণ ওর স্ত্রীর নাম ধরে মাঠের ভিতরে দুবার চিৎকার দিয়েছিল—ঠিক তখন একদল মানুষ ছুটে আসছে, হাতে মশাল, আগুন ওদের হাতে—ওই যায়, চলে যাচ্ছে, এবারে গেঁথে ফেল সুপারির শলাতে—এমন চিৎকার ছিল ওদের কণ্ঠে। পরাণ তাড়াতাড়ি মোত্রা ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। ঘাসের জঙ্গলে সে ফের ফিশফিশ করে ডাকল, 'কিরণী, কিরণী আছস্।'

কোন উত্তর পেল না। সকলেই ভয়ে কথা বলছে না যেন। কোন রকমে এই নিশুতি রাতে প্রাণ নিয়ে পালানো, কিন্তু পালানো দায়, শহরে গঞ্জে উঠে যেতে পারলে রক্ষা। পরাণ কিরণীকে খুঁজে পেল না। সে একা, এবং একা বলেই বোধ হয় হাসিমের কথা মনে পড়ে গেল। জাবিদার কথা মনে পড়ে গেল। যদি ওই রক্ষা করতে পারে। হাসিম ওর পরাণের জন, দুঃখে-কষ্টে পরাণকে বারবার রক্ষা করে আসছে। সেই হাসিম যদি ওকে ক্ষয় করে দেয় তবে আর কোথায় নির্ভর করবে। কোথাও যখন সে যেতে পারছে না, সকলে ওকে ঘিরে ফেলেছে হত্যার জন্য, তখন নদীর জলে ভেসে পড়ল পরাণ। সাঁতার দিল, ডুবে ডুবে হাসিমের বাড়ি উঠে ডাকল, 'একটা তফন দ্যাও আমারে হাসিম। আমি মুসলমানের মত এক টুপি পইরা চইলা যামু।' অথবা যেন ওর বলার ইচ্ছা ছিল, বনে-জঙ্গলে কিরণীকে খুঁজে পাই নি হাসিম, তোর বাড়িতে কিরণীর খোঁজে উঠে এলাম।

'কে কথা কয়।'

'আমি পরাইন্যা। আমারে বাঁচা তুই। যদি মারতে ইচ্ছা যায় তবে মাইরা ফ্যাল। আর পারি না।'

ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় হাসিমের মতো মানুষেরা কেমন একঘরে ছিল। ওরা রক্ষার জন্য, মানুষ, প্রাণ, পাখি রক্ষার জন্য দলে দলে বের হয়ে যেতে পারল না। এই বীভৎস ছবির ভিতর ওরা দরজা বন্ধ করে বসেছিল। ওদের চোখ জ্বলছিল, কপাল ঘামছিল, এবং নৃশংস অত্যাচার অথবা আর্তনাদ পাগল করে দিচ্ছিল।

পরাণ দাঁড়াতে পারছিল না। সে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। ঘরে একটা লম্প জ্বলছে। মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল। শীত তীব্র বলে ঘরের ভিতর জাবিদা আগুন জ্বেলে দিয়েছে এবং ওরা পরস্পর ফিশফিশ করে কথা বলছিল। কেউ শুনতে পাবে কথা, সর্বত্র চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোক অন্ধকার মাঠে চোঙা মুখে চিৎকার করছে, এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিচ্ছে। পরাণ শীতের ভিতর বসেছিল। সে আতঙ্কে যেন খুব ভুল কথাবার্তা শুনছে, যেন কিরণী কোথাও কোনো ঝোপের ভিতরে বসে ওকে ডাকছে। সে প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে শুধু একবার জাবিদার দিকে চোখ তুলে তাকাল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'কি কৈতাছ বৈন!'

জাবিদা পরাণকে সাহস দিল। বলল, 'আপনে আগুন পোহান। আমি আইতাছি।' বলে সে উঠোনে নেমে অন্য অনেক বাড়িতে সংবাদ সরবরাহের জন্য খোজখবর নিচ্ছিল। জাবিদা সব শুনে আতঙ্কিত। ইসমতালীর পেটে সুপারির শলা ঢুকে গেছে! ওদের স্কুল বাড়িতে কিছু লোককে আশ্রয় দিয়েছিল ইসমতালী, ওর দলটা ওদের বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ লড়ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি। স্কুলে এখন আগুন জ্বলছে। মাঠের ভিতর ইসমতালী চিৎ হয়ে শুয়ে এখন আশমান তারা নক্ষত্র গুনছে।

হাসিম বলল, 'ইসমতালী-অ গ্যাল।'

পরাণ ঘটনাটা যেন এতক্ষণে ধরতে পারছে। যেন এতক্ষণ পর বুঝতে পারল ইসমতালী যাদের স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিল, তারা সব পুড়ে মরেছে। অনেক হতাহত হয়েছে। চোঙ মুখে লোকটা সবাইকে সেই খবর দিয়ে মাঠের দিকে যে মসজিদ আছে—যেখানে চাকের কূপ আছে এবং জলের ভিতর এখনও যেখানে ছায়া সৃষ্টি হয়—সেদিকে চলে যাচ্ছে।

পরাণের ভয় হল সে বুঝি হাসিমের বিপদ ডেকে আনবে। সে উঠে বলল, 'বৈন আমি যাই। মাঠে নাইমা যাই।' বলে সে ছুটতে চাইলে হাসিম আগলে দাঁড়াল দরজায়। বলল, 'যাইবা কৈ? মাঠে? আমি তো এখনও মরি নাই।' তারপর বিবির দিকে তাকাল পরামর্শের জন্য। তফন পরে টুপি মাথায় পরাণ নেমে যেতে পারে মাঠে। ছদ্মবেশে সে শহরে উঠে গেলে ভয় নেই। কিন্তু অঞ্চলের মানুষ পরাণ, ধরা পড়ে যাবে। জাবিদা কোনো বুদ্ধি দিতে পারল না। মাঠে মাঠে অনেক দূর যেতে হয়, তারপর নদীর পার ধ'রে। সহসা জাবিদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বেশি সময় আর ঘরে রাখা যাচ্ছে না পরাণকে, বাড়ি বাড়ি চর ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওর মুখে আশার আলো দেখা গেল। সামান্য বুদ্ধি করে নদী পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। তারপর নদীর জলে পরাণ, সঙ্গে একটা পাতিল, পাতিলটা জলের উপর ভেসে যাবে, জলের নিচে পরাণের মুখ, পাতিলের নিচে মুখ রেখে শ্বাস নেবে পরাণ। নদীর পারে বসবে হাসিম, কাঁধে বাঁশের লাঠি, ছোট এক পুঁটলি ঝুলবে চিড়ার, এক বাটি জলে চিড়া ভিজিয়ে মাঠের কোন ঝোপে অথবা বন-বাদাড়ে খুদা পেলে পরাণকে খেতে দেবে। জাবিদা নদীর পারের মানুষ। নদীর জল সম্পর্কে, কচুরিপানা সম্পর্কে এবং কোন পারে কি আছে সব তার টিয়া পাখির মত মুখস্থ।

গোয়াল থেকে হাসিম সামান্য দুধ দুয়ে নিল। জাবিদা শীতের রাতে সেই দুধ গরম করে চারিদিকে তাকাল, এই সময়, নয়ত মশালের আলো নিয়ে যারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা পর্যন্ত টের পেয়ে যাবে। জাবিদা দুধ দিল খেতে পরাণকে। পুঁটলিতে চিঁড়া বেঁধে দিল। হাসিম পাহারাদারের মতো অথবা বরকন্দাজের মতো পাহারা দিয়ে নদী পার করে দিয়ে আসবে। আর পরাণ নদীর জলে পাতিলের নীচে মুখ রেখে, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সময় সময় পাড়ে হাসিমের লাঠির শব্দ শুনে জলের উপর ভেসে উঠবে, অথবা এই পাতিলের ভিতরও ইচ্ছা করলে পরাণ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। ওর কোন কষ্ট হবার কথা নয়। নদীতে কী যায়, পাতিল ভেসে যায়, পাতিলের নীচে পরাণ আছে, জলের নীচে সাঁতার কাটছে। কেউ টের পাবে না। পরাণ অনেক জলের নিচে মাছের মত, অথবা পাখনা মেলে মাছের মত জল কেটে শহরে গিয়ে উঠবে।

ঘোড়াগুলোর আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। বাবুদের ঘোড়াগুলো মরে গেছে। মাঝে মাছে আকাশে বাতাসে ভীষণ এক কল্লোলের-মতো

ইতর সব ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছিল। নিরীহ নারী-পুরুষগণ আগুনের ভিতর জ্বলছিল। পোড়া স্যাৎস্যাতে চামসে গন্ধ মাঠে মাঠে, কখনও গোপাটের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। মাঠের উপর শুধু অন্ধকার গম্বুজে শাদা পায়রা উড়ছে। বড় বড় মাঠ নদীর পারে—ওরা উড়ে উড়ে সেদিকে চলে যাচ্ছিল। জাবিদা লণ্ঠন হাতে উঠোনের নিচে নেমে এসেছিল। পরাণ সকলের পিছনে। হাসিম বলল তখন, খুদা ভরসা। ওরা মাঠে নেমে এলে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল। যত অন্ধকারের ভিতর ওরা অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল, তত মনে হল জাবিদার—আহা কত ঘাস এখানে, কত পাখি এখানে, সবুজ গন্ধ ছিল মাঠময়। পরাণ সব পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। ওর কিরণী কোথায় এখন, ওর সংসার! মাটির মতো আর কি প্রিয় জিনিষ আছে চাষী মানুষের। জাবিদার চোখের উপর কিছু স্মৃতি ভেসে উঠল, দুঃখের দিনে, সুখের দিনে পরাণ, পরাণের মা মাধুপিশি—সকলের কথা মনে হল, মোত্রা ঘাসের জঙ্গলে একবার পরাণ আবিষ্কার করেছিল—জাবিদা, দশমাসের পোয়াতি, জাবিদা ছাগল নিতে এসে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। কোলে করে সে এই মাঠ পার করে দিয়েছিল, ঘরে এনে হাসিমকে গালমন্দ করেছিল, সেই পরাণ ওর প্রিয় মাঠ এবং ফসল ফেলে চলে যাচ্ছে। আর এদেশে ফিরবে না। জাবিদার চোখে জল এসে গেল।

ওরা কখনও আগুনের ভিতর দিয়ে কখনও নির্জন মাঠের অন্ধকার অতিক্রম করে ছুটে চলছিল। পরাণ তফন পরেছে, টুপি মাথায় অন্ধকারে মুখ ঢেকে রেখেছে। হাসিম লাঠিতে চিঁড়ার পুঁটলি ঝুলিয়ে নিয়েছে। পুঁটলির ভিতর জামবাটি। যখন পরাণ চলতে পারবে না, জলের ভিতর শীতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন এই সামান্য চিঁড়াগুড় এবং কিছু উত্তাপ পরাণকে ফের ডুব-সাঁতার দিতে অথবা পাতিলের নিচে ভেসে থেকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পরাণ 'আমার কিরণী গেল কৈ' এইসব বলে যেতে যেতে কপাল থাপড়াচ্ছিল। 'আমার বাইচা থাইকা কি হৈব হাসিম' এই সব বলে মাঝে মাঝে অন্ধকার মাঠে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছিল। তখন কেমন পাগলের মত পরাণ। পিছনে দাঁড়িয়ে হাসিম। নানারকম আশার কথা শোনাচ্ছিল ফিশফিশ করে, মাঝে মাঝে বেঁচে থাকার জন্য, নদী পার হবার জন্য এবং নদীতে ভেসে অনেক দূর অনেক পথ সাঁতার কাটার জন্য প্রেরণা

দিচ্ছিল—যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে, যেভাবে পারছে পালাচ্ছে, গঞ্জে কিরণী হয়ত তাঁবু, সরকারি তাঁবুতে পরাণের জন্য অপেক্ষা করছে, সবই আন্দাজে বলছিল হাসিম। পরাণকে প্রেরণা দেবার জন্য নানারকমের পাঁচ-মেশালি কথা পরাণের পিছনে দাঁড়িয়ে বলছিল।

পরাণকে প্রেরণা দিয়ে কোনরকমে সাঁকো পর্যন্ত হাঁটিয়ে এনেছে। এবার সাঁকো পার হতে হবে। মসজিদের অন্ধকারে ক'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল—ওরা কারা হাসিম টের করতে পারছিল না। সে হাঠের নিচে নেমে গেল। তামাক-খেত, পেয়াজের খেত চাধ্বারে। সে মসজিদের পাশ দিয়ে গেল না' তামাকের খেতের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে থাকল। কুয়াশার জল লেগে ওদের শরীর ভিজে গেল। পরাণ মণ্ডলের কোন খেয়াল ছিল না, হাসিম মন্ত্রের মতো ওর নাম, বাপের নাম নূতন ভাবে শেখাচ্ছে—নাম, মহম্মদ ইদ্রিস, বাজীর নাম—মহম্মদ ইমামুল্লা। অথবা বোবা বনে থাকবে—যা বলবার হাসিম বলবে, ব্যারামী নাচারী মানুষ, শহর গঞ্জে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে। তবে এই অন্ধকার রাতে কেন? তখন কি বলবে হাসিম? সে ভাবল—না এটা ঠিক হবে না। বোবা পরাণ মণ্ডল বড় বড় চোখে তাকিয়ে ব্যা ব্যা করবে শুধু, কোন কথা বলবে না, সে বাছুরের মতো টেনে বিপদের স্থানগুলো পার করে নেবে। যেন গঞ্জের হাটে পরাণ মণ্ডলকে বিক্রী করতে যাচ্ছে হাসিম।

মাঠ, জমিন, শ্যাওড়া গাছের বন অতিক্রম করে ওরা হিজলের মাঠে এসে নামল। ওরা সোজা পথে গেল না। বাঁকা পথে গেল। ঘুরে ঘুরে, যেখানে খুনজখম কম হচ্ছে সে পথ ধরে গেল! কিছু মানুষের শব্দ পেল। হৈ হৈ করে গ্রামে ফিরছে। সে বুঝল ওরা কোথাও এতক্ষণে খুনজখমে লিপ্ত ছিল—এখন গ্রামে ফিরছে। সে পরাণকে নিয়ে ফের ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়ল। যখন দেখল মানুষগুলো গ্রামের ভিতর ঢুকে গেছে—এখন ছুটতে পারলে আর ধরতে পারবে না, তখন ওরা বড় মাঠে পড়ে ছুটতে থাকল।

পরগনাতে পরগনাতে দুঃসহ অরাজকতা। উত্তর দক্ষিণে সোনার গাঁ, পুবে পশ্চিমে মহেশ্বরদি অথবা শীতলক্ষ্যার দুই তীর ধরে ধ্বংসের উল্লাস। মানুষের ভয়ানক দুর্দিন—ধর্মের কথা কেউ শুনছে না, ধর্মবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, উগ্র বিদ্বেষ ক্রমশ এক ভুজঙ্গের মত গোটা অঞ্চলকে গ্রাস করে ফেলছে। যেতে যেতে হাসিম সেই আগের মতো বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছে। ওর প্রায় চারিদিকে নজর রাখতে হচ্ছে। কারণ পরাণ, বেহুঁশ পরাণকে না বাঁচাতে

পারলে ওর সম্মান থাকে না, মানুষের সম্মান থাকে না—হাসিম ছুটতে ছুটতে পরাণকে বাঁচার জন্য ফের নানা ভাবে প্রেরণা দিতে থাকল।

ওরা গরিপরদীর আশ্রমে পৌঁছে প্রথম থামল। অশ্বত্থের জঙ্গল এবং ভাঙা মঠের ভিতর কিছু পাখির কলরব শোনা যাচ্ছে। ভোর হতে বাকি নেই। নদীর জলে কিছু পাখির ছায়া পড়ছিল, কোন পাখি উত্তর-দক্ষিণে হারিয়ে যাচ্ছে। কাক-শালিখেরা তেমনি ডানা মেলে আকাশে উড়ছিল, এত বড় খুনের উল্লাস দিনের বেলাতে আর্শির মত পরিচ্ছন্ন, যেন কোথাও কোন মালিন্য লেগে নেই। কিন্তু হাসিম টের পাচ্ছিল, জলের নীচে তখনও বড় এক অজগর ফোঁশে ফোঁশে উঠছে, সময় পেলেই ছোবল দেবে। এখন সামনে শুধু নদীর জল। দিনের বেলায় যেতে গেলে পরাণ মণ্ডল ধরা পড়ে যাবে। জলে নেমে পাতিল মাথার উপর রেখে জলে জলে এখন থেকে হেঁটে যাওয়া। গঞ্জে উঠে যেতে তিন ক্রোশের মতো পথ আর। মাত্র এই তিন ক্রোশ টেনে নিতে পারলেই হাসিমের সম্মান বাঁচে। পরাণকে সে জামবাটিতে চিঁড়া-গুড় দিল খেতে। সারা দিনের জন্য পরাণকে জলে ডুবে থাকতে হবে। পরাণ পাতিল মাথায় জলে ভেসে যাবে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটুকু মুখ ভাসিয়ে পাতিলের নিচে সেরে নেবে। কিন্তু হায় পরাণের ভিতর জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে শরীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে গত সালের মেলার কথা বলে, মেলার লাভ-লোকসানের কথা বলে অন্যমনস্ক করতে চাইল পরাণকে। কিন্তু পরাণ, ভূতের মতো বসে আছে, খাচ্ছে না, যেন জোর করে চিঁড়ে গুড় ঠেলে দিচ্ছে মুখে—হাসিম বসে নজর রাখছে চারিদিকে, খাওয়া হয়ে গেলে আর দেরি করল না হাসিম। পরাণকে নদীর জলে নামিয়ে নিজে পায়ে পায়ে হেঁটে যেতে থাকল। যেন হাসিম এখন যথার্থই তীর্থযাত্রায় বের হয়ে পড়েছে, মক্কা মদিনা যাচ্ছে, মানুষের ভালবাসার স্থান, যেখানে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ থাকে না, সবই ঈশ্বরপ্রেরিত, জীব মাত্রেই করুণার যোগ্য—সুতরাং প্রাণধারণে অবহেলা করলে পাপ, হাসিম হাঁটতে হাঁটতে মদিনা যাচ্ছে, মক্কা যাচ্ছে—নিচে শীতের জল, জলে একটা শুধু এখন পাতিল ভাসছে। পাতিলটা বেগে দক্ষিণ দিকে উঠে যাচ্ছে, দক্ষিণ দিকে জলের উপর ভেসে যাচ্ছে—কোন টের পাবার কথা নয়, অঞ্চলের একজন মানুষ পাতিল মাথায় নিরুদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে। নদী এখানে অগভীর—জল কম, জলজ ঘাস নেই, জলের নিচে

বালি মাটি। পরাণ জলের নীচে গোসাপের মতো সাঁতার কাটছিল। মনে হবে সব কীটপতঙ্গের মতো, মরা বাঁদর অথবা বেড়ালের মতো কচুরিপানার পাশে সামান্য এক পাতিল ভেসে যায়, পাতিলের নিচে এক মানুষ আছে, মানুষ জলে ভেসে যায় কেউ বলবে না। পাড়ে লম্বা হয়ে হাসিমের ছায়াটা জলের উপর এসে পড়ছে, আর ঘোড়ার খুরের মতো শব্দ ঠক ঠক, বাঁশের লাঠির শব্দ করছিল—এক দুই। এক দুই। ভয়, ভয়। শব্দটা জলের নিচে পরাণ শুনছে—ভয় ভয়। সে ডুবে থাকছে। এক দুই তিন, তিনটা শব্দ করছে পাথরে ঠুকে ঠুকে, আর ভয় নেই। সে মুখ তুলে কচুরিপানার ভিতর দিয়ে হাঁটতে থাকল।

নদীর পাড় ক্রমশ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে যাচ্ছিল। অনেক উঁচুতে হাসিম হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। ওর শরীরটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। অনেক দূর থেকে এখনও সেই শব্দ, ক্রমাগত শব্দ, এক দুই, এক দুই—অদ্ভুত শব্দটা, জলের নিচে মনে হয় কোন এক পাতালপুরী আছে, সেখানে রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ঠক ঠক করে যাচ্ছে, অথবা কদম দিচ্ছে ঘোড়ায়—এক দুই তিন, কদম তুলে ঘোড়া ছুটলেই আর পরাণের ভয় থাকছে না। সে জলের নীচে কিরণীর স্বপ্ন দেখছে। ছোট মুখ কিরণীর, বড় চোখ কিরণীর, ছাগল গরু পায়রা কিরণীর সব পুড়ে গেছে। এখন কিরণী কোথায়! হল্লাটা বড় সহসা আরম্ভ হয়েছিল, সে জেগে দেখল আগুন জ্বলছে গোয়ালে, বের হয়ে দেখল মানুষের আর্তনাদ। সে সব ফেলে ছুটতে থাকল।

নদীর দুপারে গ্রাম মাঠ ফসল। ঝোপে জঙ্গলে টুনি ফুলের লতা। সামনে মাঝের চরের শ্মশান। আবার সেই এক দুই—ঠক্ ঠক্ শব্দ। পরাণ জলের নিচে, পাতিলে মুখ ভাসিয়ে ডুবে থাকল, অথবা জলের নিচে যেন পরাণ ঝিনুক খুঁজছে, ঝিনুক নয়, পরাণ কিরণীকে খুঁজছে, হাতড়ে হাতড়ে জলের নিচে জলের পাশে, গ্রামে, মাঠে অথবা ফসলের ভিতর কিরণীকে খুঁজছে। কিরণী, আমার কিরণী, জলে মাঠে যে কিরণী প্রাণের সঙ্গে লেগে থাকত। পরাণ যেতে যেতে বলল, কিরণী, তুই কোন্‌খানে আছস ক। আমি পরাণ তরে ফালাইয়া কৈ যামু।'

জলের নিচে সে আবার শব্দটা পেল—ঠক্ ঠক্ ঠক্। আর ভয় নেই। সে মুখ ভাসিয়ে রাখল জলের উপর। দুহাতে কচুরিপানা কেটে সে

এগুতে থাকল। শক্তি ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসছে। শীতের সময় বলে জল হিমের মতো ঠাণ্ডা। সে ভিতরে ভিতরে মরে যাচ্ছিল, ভয়ে বিস্ময়ে এবং কিরণীর জন্য, এই শীতের জন্য, হিম ঠাণ্ডার জন্য ওর প্রাণশক্তি ক্রমশ উবে যাচ্ছে। হাসিম পাড় থেকে ওকে চিৎকার করে সাহস দিচ্ছে— 'আর বেশি দেরি নাই, পরাইন্যা। ধামগড়ের কলের চিমনি ছাখা যাইতাছে। ওখানে তর কিরণীরে পাইবি।' ঠিক সেই জলেডোবা মানুষের মত। যেমন পিতা পুত্রকে বলছে— দেখো, দূরে বাতিঘর দেখা যাচ্ছে, আমরা আর একটু সাঁতার কাটতে পারলেই সেই বাতিঘর পাব। আলো, খাদ্য এবং তাপ পাব। অথবা দেখো জন, আকাশের নক্ষত্র দেখ, তোমার মা বাড়িতে আমাদের দুজনের প্রতীক্ষাতে বসে আছেন, আর একটু সাঁতার কাটতে পারলেই আমরা এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র অতিক্রম করে চলে যেতে পারব। জাহাজডুবি মানুষ পুত্রকে যেন উদ্বুদ্ধ করছে। হাসিম পরাণকে প্রেরণা দিচ্ছে—আর একটু যেতে পারলেই সেই বাতিঘর, বাতিঘরে আমাদের পৌছাতে হবেই।

হাসিম এখন লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। যত নদী নিচে নেমে যাচ্ছে, যত হাসিম উপরে উঠে যাচ্ছে, তত পাড়ের ফাটল গভীর এবং প্রশস্ত হচ্ছে। ওকে খুব সাবধানে ফাটল পার হতে হচ্ছিল। একটু ঘুরে গেলে পথ, কিন্তু সেখান থেকে নদীর জলে পরাণকে দেখা যায় না, পরাণ অতদূর থেকে লাঠির শব্দও শুনতে পাবে না। বর্ষার সময় জলে যখন প্রচণ্ড স্রোত থাকে, তখন যেসব জমি স্রোত ভাঙতে ভাঙতে ভাসিয়ে নিতে পারে নি, তারা এখন প্রচণ্ড ফাটল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষা এলেই ঝুপ ঝুপ শব্দ হবে, জলে ভেসে মোহানায় চলে যাবে। নদী ভাঙতে ভাঙতে পরাণের মত দূরে সরে যাবে।

পরাণ বোধ হয় ওর ডাক জলের ভিতর থেকে শুনতে পায় নি। অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়েছিল হাসিম। নদীর খাড়া পাড়, নিচে সামান্য বালুমাটি, যখন ভয় নেই, যখন কোন মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তখন পরাণের আর কি করণীয়। সে বিশ্রামের জন্য ঘাষের ভিতর বসে থেকে ওপারের মাঠে বসন্তের ফসল দেখল। যব গমের গাছ, পাশে বড় গ্রাম নাঙ্গলবন্দ। কামার কুমোর একঘরও নেই। দেবদেবীর মন্দির আছে এখানে। মাটির মূর্তি, ভৈরব ঠাকুরের পূজা হয় এখানে, পাঁঠা বলি হয়, এখন আর কিছুই নেই, দেবদেবীর মূর্তি খড়ের গাদার মত পড়ে আছে।

গরিব চাষী মানুষেরা এসেছিল দেবীর গায়ে সোনার অলঙ্কার থাকলে তুলে নিতে। ঠিক মাথার উপরে অনেক উঁচুতে হাসিম লাঠিতে শব্দ করল ঠক্ ঠক্—ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙের মত লাফ, পরাণ ব্যাঙের মত জলের ভিতর ডুবে গেল।

হাসিম যেতে যেতে দেখল দুজন যুবক কলা গাছে সুপারির শলা বল্লমের মত গেঁথে রেখেছে। ওরা বর্শার মত দূরে সুপারির শলা নিক্ষেপ করছিল—তখন ওরা নদীর এত খাড়া পাড় ধরে এক মানুষ যায় দেখতে পেল। পথ ফেলে, বিপথে যাচ্ছে মানুষটা। ওরা হাতের উপর সুপারির শলা তুলে বলল, 'যায় কোন মাইন্‌সে! কোন্‌খানে যায়!' বলে ওরা হাসিমকে ধরার জন্য যব খেতের ভিতর দিয়েই ছুটতে থাকল। হাসিম কি করবে ভেবে পেল না। পরাণের পরিবর্তে যেন সেই বোবা বনে গেল, বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল তারপর চোখ উল্টে দিল। কিন্তু মানুষের শখ কতরকমের হয়! ওরা খোঁচা দিল একটা হাসিমকে—'মিঞা, কৈ যাও?'

'নারানগঞ্জে যাই।' সে চোখ উল্টেই রাখল। হাবাগোবা মানুষ হাসিম। বেশি কথা না বলার জন্য নিজেই বিড় বিড় করে বকতে থাকল।

'তোমার নাম, মিঞা?'

'মহম্মদ হাসিমালি। সাং নয়াপাড়া, ইসমতালি সেখ আমার চাচা।'

ওরা বলল, 'পথেঘাটে লোক খুন হৈতাছে। তোমার বেজায় সাহস, মিঞা।'

'আমি সেখের বাচ্চা। আমারে খুন করব কোন্ মাইন্‌সে।' বলে চোখ সোজা করে ফেলল। তারপর যেন দাঁড়াতে নেই, সোজা হেঁটে যেতে হয়, সে থপ থপ করে লাঠিতে ঠক ঠক শব্দ করল আর হাঁটল। কিন্তু হায়, পাশের কল্‌মিলতার ভিতরে এক পাতিল ভাইসা যায়, পাতিলের উপর এক কাক বইসা যায়, নিচে এক মানুষ ভাইস্যা যায়। মানুষের শ্বাস পড়ে না, জলের ভিতরে এক মানুষ কিরণীর খোঁজে নারানগঞ্জে উইঠা যায়। হাসিম হাঁটছিল, শব্দ হচ্ছে লাঠিতে ঠক ঠক—কাঁসার জামবাটিতে, অথবা হাতের পাথরে সে শব্দ করে যায়, ভয় ভয়! পরাইন্যা ভাইস্যা উঠলে ডুইবা মরবি জলে, পরাইন্যা ভয় ভয়। তখন পিছনের লোক দুটো চিৎকার করে উঠল—'অ মিঞা, দ্যাখছনি পানিতে এক পাতিল ভাইস্যা যায়।'

হাসিমের শরীর অসাড় হয়ে আসছে। সে তেমনি হাঁটছে থপ থপ।

থামলেই লোকগুলো টের পাবে। হাসিম এক গেরস্থ মানুষ, হাসিম এক নাচারি ব্যারামী মানুষ, সে পরাণকে নিয়ে শহরে যাচ্ছে। সে কোনরকমে ব্যারামী নাচারি মানুষ সেজে ওদের গাজীর গীতের গান শোনাল—এক ছিল গাজী ভাই, গাজীর পরাণে সুখ নাই রে নাই। সে ঘুরে ঘুরে লাঠি বাজাল ঠক ঠক। পরাণ ভয় ভয়। চান্দের লাখন মুখখান, গাজীর গীদের বায়ানদার—পরাণ ভয় ভয়। সে ঘুরে ঘুরে ওদের অন্যমনস্ক করতে চাইল। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওরা শলা হাতে নিয়ে পাতিলের দিকে নেমে যাচ্ছিল।

হাসিম এবার চিৎকার করে উঠল, 'অ মিঞা ভাই, পাতিল তোমার হাওয়ায় ভাইস্যা যায়।'

'হাওয়া কোন্খানে দ্যাখতাছ মিঞা!'

হাসিম এবারে আদাব দিল, যেন এবার যথার্থই গাজীর গীত শেষ। সে এবার বিদায় নিয়ে চলে যাবে। গানের শেষে আদাব দেবার মত ভঙ্গি করে ডাকল—'অঃ মিঞা ভাই, কন দেখি চান্দে সূর্যে তফাৎ কী? কন দেখি গমে যবে তফাৎ কী' মাটিতে ফসল ফলে, অঃ মিয়া, কার লাগি! কোন্ সে মানুষ আছে তিন ভুবনে ফসলের রস দেয়, পরাণের ভিতর রস দেয়— অঃ মিঞা, দৌড়ান ক্যান, আল্লা বুঝি আপনেগ জ্বালায় সব হাওয়া গিল্যা ফ্যালাইছে।'

ওরা হাসিমের কথা শুনল না। ওরা পাতিলটার পাশে গিয়ে জোরে শলাটা ছুঁড়ে দিল। পাতিলের ভিতর দিয়ে শলাটা পরাণের ব্রহ্মতালুতে ঢুকে পালকের মতো খাড়া হয়ে থাকল। পরাণ জল থেকে উঠে দাঁড়াল সহসা। মুখে পিঠে রক্তের ফোয়ারা নেমেছে। চোখগুলো গোল গোল হয়ে গেল। দুহাত উপরে তুলে পরাণ চিৎকার করে উঠলো—কিরণীরে পাইছি। বলে সে পাতিলটা বুকে জড়িয়ে ডুবে গেল ফের। কিছু বুদবুদ দেখা গেল। মানুষ দুজন হা হা করে হাসল তারপর যেদিকে হাসিম পাগলের মত পালাবার জন্য ছুটছে সেদিকে ওরা ছুটতে লাগল। 'কাফের যায়!' ওরা মাঠের ভিতর, খাড়া পাড়ের ভিতর সেই কাফেরকে ধরার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছিল। আর বলছিল, 'ঐ দ্যাখ কাফের যাইত্যাছে। দ্যাখ এক কাফের যায়, যব গম খেতের ভিতর দিয়া এক কাফের যায়। সন্ধ্যা হয় হয়, যব গম খেতের ভিতর এক কাফের ছুইটা যায়।' পাখিরা ঘরে ফেরে—

যব গম খেতের ভিতরে এক কাফের লুকিয়ে রয়। ওরা শলা দিয়ে গাছগুলোর মাথায় বাড়ি মারছে আর সেই গাজীর গীতের বায়ানদারের মত কাফেরটাকে খুঁজে মরছে। পেলেই শলা দিয়ে পেটে একটা খোঁচা। কাফেরটা হাঁ করে আলিশান এক ভুজঙ্গের মতো পড়ে থাকবে মাঠে।

হাসিম খুব নুয়ে যব খেতের ভিতর দিয়ে ছুটছে। সামনে বড় বড় ফাটল। সে ফাটলগুলো লাফ দিয়ে পার হচ্ছে। মৃত্যুভয় হাসিমকে অস্থির করে তুলছিল, সে একবার গলা তুলতেই দেখল ওরা ঠিক পিছনে পিছনে আসছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে এতক্ষণে। মরা চাঁদের ফালিটা রামগড়ের মিলটার চিমনিতে মরা কাকের মতো ঝুলে আছে যেন। সামনের ফাটলটা অতিক্রম করতে গিয়েই মনে হল নিচে এবার পড়ে যাবে। পড়ে গেলে সেই অতল এক গহ্বর। অন্ধকারে গহ্বরটা ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে উঁকি দিতেই দেখল, ওরা এসে গেছে, ওরা ওকে লক্ষ্য করে শলা এবার নিক্ষেপ করবে! সে ফের বলল, খুদা ভরসা. বলে লাফ দিয়ে অন্য পারে পড়তেই মনে হল বাঁ পাটা ভেঙে গেছে। সে নাড়তে পারছিল না। ওরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হা হা করে হাসছে। এখন খোঁচা মারলেই হাসিম সারা হয়ে যাবে, সে হাত জোড় করে পড়ে থাকল মাটিতে। সে গোঙাতে থাকল। এমন কাছে যখন পাওয়া গেছে, যখন আর কোন দিক থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তখন লাফ দিয়ে ওপারে চলে গেলে পিঠের ওপাশ থেকে শলাটা ঢুকিয়ে দিলে সুখের হয়। হাসিম ভয়ে কুকুরের মত গুটিয়ে ছিল। হাসিম কিছু বলছিল না, কি যেন দেখছিল। শুধু শক্ত করে লাঠিটা ধরে রেখেছে ডান হাতে। সে শেষবারের মত ওরা লাফ দিলে লাঠি দিয়ে ফাটলের মাঝখানে আটকে দিল পথটা। ওরা হড়কে নিচে পড়ে যেতে থাকল। হাসিম কোন তাড়াতাড়ি করল না। সে নিচে মুখ ঝুলিয়ে দিল—'কি মিঞারা আসমান গ্যাখ, নদী গ্যাখ। কিরকম লাগে। কোনখানে আছ মিঞা। দোজখের পথটা চোখে পড়তাছেনি।' হাসিম এবার জোরে হা হা করে হেসে উঠল। পরাইন্যারে আর ভয় নাই। নদীতে সাঁতার দিয়া গ্যাখ পানিতে ঝিনুক আছে, সব ঝিনুকে মুক্তা হয় না রে, পরাইন্যা। বলে কেমন বিলাপ করতে লাগল। তারপর লাঠিটা পাশে রেখে খাদের ভিতরে মুখটা ঢুকিয়ে বলল, 'কিগ মিঞারা, আল্লা সব হাওয়া গিল্লা ফ্যালাইছে। 'আল্লা কি কয়?'

কাতর শব্দ দ্রুত ফাটল থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছিল মাঠময়। ফাটলের ভিতর মানুষ দুটোর উপর পাড় থেকে মাটি খসে পড়ছিল। তখন আঁধার মাঠে। তখল লণ্ঠন নেমে আসছে মাঠে। যব গমের খেতে লণ্ঠন হাতে মানুষ নেমে এসেছিল, কাফের যায় এক, চিৎকারে মানুষেরা ছুটে আসছিল। আর হাসিম হা হা করে হাসছিল। যেন বলার ইচ্ছা ছ্যাখ ছ্যাখ দুই কাফের জীবন্ত কবর যায়। বলে সে তার জামবাটির বাকি চিড়াগুড়টুকু ফাটলের মুখে ঢেলে দিল এবং বাটি দিয়ে বালি মাটি টেনে বড় বড় ধ্বস নামাল। নিচে তখন আর কাতর শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সে মানুষজনদের ভিড় বাড়তে দেখে বলল, দুই কাফের যাচ্ছিল মিঞা—দিলাম, গোরে দিয়া দিলাম।

আর অন্ধকারে হাসিমের মাটি টেনে ফেলার কাজ শেষ হচ্ছিল না। পরাণের মুখ কেবল মনে পড়ছিল। পরাণের মাথায় শড়কিটা পালকের মত আটকে ছিল। ওর চোখেমুখে কোন দৃশ্য ঝুলে ছিল না। মৃত দুই চোখ দিয়ে সে অন্ধের মত জলের উপর কেবল ভালবাসার ধন, ভালভাসার মাটি এবং ভালবাসার কিরণীকে খুঁজছিল। হাসিমকে দেখে মনে হচ্ছে সে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ভুলতে পারছে না, পাগলের মত কেবল মাটি টেনে ফেলেছে। জোয়ারের জল ফাটলের মুখে ঢুকে গেছে তখন। মাটি জলের ভিতর পড়ে গুলে গুলে যাচ্ছে। ঘামে ওর শরীর ভিজে গেছে, যে খুঁট দিয়ে মুখ মুছে ফেলতেই দেখল সামনে এক লণ্ঠন জ্বলছে। দুজন লোক লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

'অ মিঞা, পাগলের মত মাটি ফ্যালতাছ ক্যান ?"

হাসিম জবাব দিল না। সে পাগলের মতো মাটি আঁচড়ে নিচে টেনে টেনে ফেলছে।

ওরা ফের বলল, 'মাটির নিচে কি খোঁজতাছ।'

হাসিম এবার হায় হায় করে বিলাপ করে উঠল, 'মাটির নিচে সোনা খোঁজতাছি, মিঞা। আমার সোনা হারাইয়া গ্যাছে'।

ওরা হাসিমকে এবার যেন চিনতে পারল, তুমি হাসিম না ?

কত দীর্ঘকাল পর যেন মনে হল সে যথার্থই হাসিম। সে সব ভুলে গিয়েছিল। ঘরে ওর বিবি জবিদা আছে। সে এবার জামবাটিটা বুকের কাছে নিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল পারছে না, উঠতে পারছে না। সে ফের বসে বলল, 'আপনেরা !'

'পরাণের বৌ কিরণীরে তুইলা দিয়া আইলাম।'

'আমারে ইবার তুইলা লন, আমি যাই।'

যব গম খেতের ভিতর পরাণের পায়রাগুলি তখন উড়ছিল, 'বক বকম করছিল। নদীর জলে পরাণ ডুব দিল। পাতিল বগলে পরাণ জলের নিচে শুয়ে ছিল। কোন দুঃখ ছিল না। নিজের দেশ, নিজের এই মাটিতে শুয়ে পরাণ স্বপ্ন দেখছে—কলমিলতায় আবার ফুল ফুটেছে। পাখি উড়ছে আকাশে। যব গম খেতের ভিতর পরাণ কিরণীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

নীল চোখ

অমুত্তমকে নিয়ে আমি দুবার দু' ভাবে গল্প লিখেছিলাম। অমুত্তম একদিন অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, তোর দুটো গল্পই আমি পড়েছি বাঁড়ুজ্যে। কিন্তু তুই বড় মিথ্যা কথা বলছিস। প্রথম গল্পটাতে তুই লেডি আলবাট্রসের বুকের নীচে পুরুষ চড়ুইটাকে রেখে এক আহামরি ভাব—যা হয় না, কোন দিন হতে পারে না, —করেছিস। দ্বিতীয়টায় আমার মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছিস। সহজ গল্পটাকে এত গোলমেলে করে ফেললি ভাবতে অবাক লাগে। তারপর অমুত্তম এক কাপ চা খেল, আমার দুই সন্তানের খবর, সমুদ্রে আবার ফিরে যাচ্ছি কিনা এসব বলে সে আমার কাছে একটা দামী ঘড়ি রেখে দিল। বলল, তোর জন্য এনেছি, তোর যা ইচ্ছা হয় দাম দিবি।

অমুত্তমের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ভদ্রা ট্রেনিং শিপে। অমুত্তম আমাদের জুনিয়র রেটিংস ছিল। প্রথম সফরে আমরা একই জাহাজে বের হয়ে পড়েছিলাম। অমুত্তমের চোখ বড় ছিল, চুল লম্বা করে ছাঁটত এবং মুখে সব সময় সরল বালকের মত হাসি। সেই অমুত্তম মাঝে মাঝে জাহাজে বিষণ্ণতায় ভুগত এবং ওর সরল হাবাগোবা চেহারা জাহাজের সকলকে প্রায় আকৃষ্ট করছিল।

অমুত্তম বলল, তুমি বাঁড়ুজ্যে প্রথম গল্পটাতে আমার পড়শীর কথা একেবারে অস্বীকার করেছ।

আমি বললাম, স্পষ্ট মনে করতে পারছি না।

অমুত্তম বলল, দ্বিতীয় লেখাটাতে শুধু পড়শীই সব। যেন তার জন্যই আমি জীবন বিপন্ন করে পাখিটাকে রক্ষা করতে গেছিলাম।

—অনেক দিন আগে লিখেছি এখন সব মনে আসছে না। তবু মনে আছে জাহাজ মোহনায় পৌঁছাতে আমাদের তিন জোয়ার লেগেছিল। গ্রীষ্মের দিন ছিল, নদীতে জল কম। জোয়ারে জোয়ারে আমরা নীল সমুদ্রে নেমে গেলাম। জাহাজটার নাম সিউল ব্যাঙ্ক—কার্গো শিপ।

অমুত্তম বলল, তোমরা—গল্প লিখিয়েরা সহজ কথা সহজে ভাবে না বলে

বড় বড় প্যাচ মারতে চাও। কি দরকার ছিল নাটক করার। পাখির এমন নীল চোখ তুমি আর কোথাও দেখেছ? আমি ত ভাই দেখিনি! তোমার গল্পে সেসব কিছুই নেই।

অমুত্তম চলে গেল। চলে গেলে মনে হল জাহাজটা আমাদের সাদা রঙের ছিল। মেজমালোম আমাদের বড় প্রিয়জন ছিলেন। আমরা এনজিন রুম রেটিংস, তবু আমাদের সঙ্গে মেজমালোমের হৃদ্যতার অভাব ছিল না। অমুত্তম ওয়াচ শেষ করে প্রায় সময়ই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকত। নূতন জাহাজী আমরা—দু' দিনেই মনে হল শুধু জল আর জল। এত জল আছে পৃথিবীতে, এত নীল জল এবং আকাশটা এত বড় কোনদিন মনে করতে পারিনি। নূতন জাহাজী বলে যা হয়—দেওয়ানী আমাদের বেশ কাবু করে ফেলেছে। জাহাজে সামান্য পিচিং ছিল। আমরা ঠিক মত দাঁড়াতে পারতাম না। মনে হত সব সময় কে বা কারা যেন সামনে অথবা পিছন থেকে ঠেলছে। অমুত্তমকে দেখলে মনে হবে সে আর দু' দিন বাদে মরে যাবে। কারণ সে কিছু খেতে পারতো না, শুলে ঘুম আসত না। দাঁড়িয়ে থাকলে কেবল বমি করত। সমুদ্রে পড়তেই অমুত্তম অসুস্থ হয়ে পড়ল। এনজিন-সারেঙ অমুত্তমকে ওয়াচে রাখলেন না। ওকে ফালতু করে দিয়ে কাজ হালকা করে দিলেন। অমুত্তম সেই থেকে পাঁচ নম্বর সাবের সঙ্গে উইনচে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল।

সংসারে থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যা হয়—বড় একাকী, কাজের সময়টা তবু কেটে যেত, কিন্তু অবসর সময় আর কিছুতেই কাটতে চাইত না। শুধু জল আর জল, নীল জল, কোন পাখি পর্যন্ত সমুদ্রে দেখা যাচ্ছে না। পুরোনো জাহাজীরা বেশ কলরব করে দিনগুলো বন্দরের আশায় কাটিয়ে দিচ্ছে। অমুত্তম এবং আমি পাশাপাশি বাংকে শুয়ে থাকি, নিশি দিন শুধু মাটির গল্প; বাংলা দেশের ফুল ফলের গল্প। সেই গল্প শুনতে শুনতে অমুত্তম মাঝে মাঝে হাই তুলত। পোর্টহোল খুলে দিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে কেমন হতাশ স্বরে বলত, ভালো লাগছে না। বাঁড়ুজ্যে, বড় একঘেয়ে।

কাল আমরা কলম্বো বন্দর পাব। রসদ নেওয়া হবে। খবর শুনে জাহাজীরা উল্লাসে ডেকময় ছুটাছুটি করে বেড়াছিল। বন্দর আসছে, বন্দর আসছে। বন্দর এলেই জাহাজীদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত থাকে না। সোনার পুতুলটি সমুদ্রে হারিয়ে গেছে, বন্দর এলেই যেন সেই

সোনার পুতুল মিলে যাবে। জাহাজীরা উল্লাসে সমুদ্রের গান গাইছিল। অমুত্তম পর্যন্ত পোর্টহোলে মুখ রেখে শিস্ দিতে থাকল। কলকাতা থেকে কলম্বো আমাদের প্রায় ন' দিনের যাত্রা। এই ন' দিনেই অমুত্তমের চোখে মুখে দুঃখ ও হতাশা ফুটে উঠেছিল।

কিন্তু জাহাজ বন্দর পেল না। দূরবর্তী এক বয়াতে জাহাজ বাঁধাছাঁদা হল। জাহাজ নোঙর ফেলে দিল। কলম্বো বন্দর চোখের উপর স্পষ্ট হয়ে ভাসল না। নারকেল বীথির ভিতর বন্দরের রূপসী মুখটা অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেল। তখন অপরাহ্ন বেলা, সূর্য কিছুক্ষণের ভিতরই অস্ত যাবে। আকাশে কত সব উপকূলের বিচিত্র পাখি উড়ছিল। অমুত্তম বন্দর দেখতে না পেয়ে পাখি দেখছিল আকাশে। জাহাজ থেকে কেউ বন্দরে নামতে পারছে না। ওদের ভিতর যে উল্লাসটুকু ছিল, পাখি এবং দূরে দূরে যেসব লাল নীল অথবা সাদা রঙের জাহাজ আছে তা দেখতে দেখতে নিবে গেল। আমাদের মেজমালোম বড় প্রিয়জন। অমুত্তম ডেক থেকে টুইন-ডেকে নামতেই দেখল মেজমালোম হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, চোখে দূরবীন। অমুত্তম তাড়াতাড়ি পাশে বসে গেল এবং বলল, এনি ওম্যান, সেকেণ্ড ?

—নো।

সে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে কেমন অধৈর্য গলায় বলল, ইফ এনি ওম্যান উড হউ প্লিজ···

তিনি চোখ থেকে দূরবীন না তুলে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন। যদি সহসা কোন রকমে দূরবীনের কাচটা কোন যুবতীর মুখ ধরে ফেলতে পারে তবে তিনি নিশ্চয়ই অমুত্তমকে ডেকে বলবেন, দ্যাখো নীল লাল সাড়ী পরা যুবতী, দ্যাখো। মুখে দ্যাখো, ঠোঁট দ্যাখো। যাদুকরের মত মেজমালোম সুদূর এক গ্রাম্য মেয়ের হাসি কলরব এবং ভালোবাসার ছবি ধরে ফেলার জন্য যেন বসে আছেন। কিন্তু সূর্য অস্ত গেল, পাখিরা সব বন্দরে ফিরে গেছে। আলোর শহর এবার ধীরে ধীরে সমুদ্রের বুকে জেগে উঠবে। মেজমালোম দূরবীনের কাচে কোন যুবতী মেয়ের মুখ সহসা আবিষ্কার করতে পারলেন না। ধীরে ধীরে তিনি কেবিনের দিকে ফিরে গেলেন। অমুত্তম তখন একাকী হাঁটছিল বোট-ডেকে। নীল আকাশে সোনার চাঁদ আলো দিচ্ছে সমুদ্রে। সাদা ধবধবে জ্যোৎস্নায় অমুত্তম

বোট-ডেকে পায়চারী করছে। কিছু নক্ষত্র আকাশে, পড়শীর মত মুখ নিয়ে নক্ষত্রগুলো আকাশে জেগে রয়েছে। সে এক দুই করে আকাশের সব নক্ষত্র গুনতে বসে গেল।

রাতে রাতেই জাহাজের রসদ তোলা হয়ে গেল। ভোর রাতের দিকে জাহাজ বন্দর থেকে নোঙর তুলে ফেলল। আবার যাত্রা, আবার একঘেয়ে যাত্রা। জাহাজের কার্গো সামান্য। কিছু পাখি আছে ডারবানের জন্য। সারস পাখি আর পাটের গাঁট আছে। ডারবানে আমাদের সেই সব পণ্য নামিয়ে দিতে হবে। বন্দরে পৌঁছাতে জাহাজ তেইশ দিন সময় নিয়েছিল। দিনগুলো তখন একভাবে ভোর হত, সূর্য উঠত একভাবে এবং সূর্য অস্ত যেত একভাবে। মাঝে চার পাঁচ দিন সামান্য ঝড় পেয়েছিলাম। আকাশ অপরিচ্ছন্ন ছিল সে ক'দিন। সারাদিন সমুদ্রে ঝির ঝির করে বৃষ্টি থাকত। অন্ধকারে অনুত্তমকে আমি অনেক দিন চুপচাপ রেলিঙে ঝুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। দিনগুলো আমাদের তখন ক্রমে ছোট হয়ে আসছিল। যত উপকূলের নিকটবর্তী হচ্ছি তত সূর্যের আলোতে উত্তাপ কমে আসছে। অনুত্তম আর আগের মত বোট থেকে দাঁড়িয়ে নক্ষত্র গুনতে পারত না। আমরা ফোকসালে বসে যুবতীদের ভালবাসার গল্প করতাম, অথবা শীতের দিনে পিঠে, পায়েস, বর্ষার দিনে নৌকাবাইচ এবং শরৎকালে কাশফুলের গল্প। কবিতার মত যেন আমাদের ভিতর বাংলা দেশের সেই সব স্মৃতি দুর্জনকে কোন কোন সময় নিবিষ্ট করে রাখত। এমন এক নিবিষ্ট আলো—অন্ধকারে অনুত্তম ফিস ফিস করে বলেছিল, পড়শী আমাকে আজও চিঠি দিল না।

আমি বললাম, ডারবানে তুমি পড়শীর চিঠি পাবে। আমি ওকে ওর পড়শীর ভালবাসা সম্পর্কে সাহস জোগাচ্ছিলাম।

ডারবান বন্দরেও জাহাজীরা বন্দরে নামতে পারল না। জাহাজের জন্য সামান্য বাংকার, কিছু পণ্য নামালো এবং রসদ তুলে নিতে পারলেই কাজ সারা। রাতে রাতেই প্রায় কাপ্তান কাজটা সেরে ফেললেন। বন্দরে এত ব্যস্ততা ছিল যে, মেজমালোম পর্যন্ত সময় করে দূরবীন নিয়ে বোট-ডেকে বসতে পারেন নি। আমরা সারারাত জেগেছিলাম। ভোর রাতের দিকে যখন মেজমালোম দেখলেন কাজ শেষ, পণ্য নামানো শেষ, বাংকার নেওয়া হয়ে গেছে তখন সন্তর্পণে প্রায় সকলের অলক্ষ্যে তিনি বোট-ডেকে হাঁটু গেড়ে

বসলেন এবং দূরবীন চোখে নিয়ে যতক্ষণ না জাহাজ বন্দর থেকে নেমে গেল ততক্ষণ বসে থাকলেন। অনুত্তমও মেজমালোমের পাশে বসে বসে অধীর হতে হতে এক সময় বলত, এনি ওয়্যান, সেকেণ্ড ?

মেজমোলাম একইভাবে উত্তর করতেন।—না।

পড়শীর চিঠি ভারবানেও এল না। এজেণ্ট ডাক পাঠিয়ে দিয়েছে। সারেঙ সকলকে বিলি করছিলেন। অনুত্তম চিঠির লোভে বোট-ডেক পার হয়ে দুই লাফে ছুটে এল। সারেঙ সাব আমার চিঠি। অনুত্তম চিঠির জন্য প্রতীক্ষা করতে গিয়ে হতাশ হল। দেশ থেকে তার কোন চিঠি আসে নি। পড়শী কোন চিঠি দেয়নি। সে দুঃখিত মুখে টুইন-ডেকে নেমে গেল। তারপর এনজিন-রুমে নামার জন্য চিফ-কুকের গ্যালি ডাইনে ফেলে ভিতরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর কী কাণ্ড! সকলেই দেখছি টুইন-ডেক ধরে ছুটছে: সোজা এনজিন-রুমের দিকে ছুটছে। আমার ভয় ধরে গেল প্রাণে। দুর্ঘটনার কথা মনে এল। জাহাজ সমুদ্রে নেমে গেছে তখন। বন্দর ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা সকলে এনজিন-রুমে ঢুকে দেখলাম অনুত্তম দুটো চড়ুই পাখির সঙ্গে গল্প করছে। ছোট পাখিটাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, হ্যালো তুমি কেমন আছ? সমুদ্র কেমন লাগছে? দুই পাখি, তীরের পাখি উড়ে এসে আর তীরে ফিরে যেতে পারেনি। সকলেই এই ঘটনায় খুব হাসহাসি করল। একদিন, তখন জাহাজ কেপ অফ গুড হোপ পার হয়ে গেছে, জাহাজ রাজরানীর মত দুলতে দুলতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, দিন ক্রমশ বড় হচ্ছিল, আটলাণ্টিকের ঘন নীল জলে জাহাজটা প্রায় মর্জিমত ভেসে চলছিল—মেজমালোম বললেন, কি অনুত্তম তোমার মিসেসের খবর কি ?

—ভালো, সেকেণ্ড। আজকাল কথা শুনছে। তবে কি জানেন কদিন শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। ওদের জন্য একটা বাসা তৈরী করেছি। হলে কি হয়। পাখিত পাখি। কথা শোনে না। কেবল ডেকময় উড়ে বেড়ায়।

সূর্য তখন অস্ত যেত সমুদ্রে, অনুত্তম পাখিদের ডেকময়, বোট-ডেকে এমন এমন কি আফটার-পিকে উড়িয়ে বেড়াত। কোন কোন দিন মেজমালোম বোট-ডেকে এসে বসতেন। বসে ফল খাচ্ছেন, পাখি দুটো তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকত ফলের জন্য। কোন কোন দিন মেজমালোমকে দেখলে

পাখি দুটো মাথার চারপাশে উড়ে বেড়াত। পাখি দুটো বাতাসে ডিগবাজি খেত। একঘেয়ে সমুদ্র যাত্রা থেকে অনুত্তমকে এই পাখি দুটো রক্ষা করেছিল। মেজমালোম পর্যন্ত এই পাখি দুটোর ভালোবাসায় কি করে যেন পড়ে গেলেন।

আমাদের পরবর্তী বন্দর ভিক্টোরিয়া। লেগুন ধরে গেলে ভিক্টোরিয়া বন্দর। ব্রাজিলের সেই ছোট্ট বন্দরের প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। লৌহ আকরিক নেবার কথা বন্দর থেকে। কিন্তু এমন সময়ে দুঃখের খবর ভেসে এল, জাহাজ যাচ্ছে পোর্ট অফ সালফার। ক্যারেবিয়ান সমুদ্র অতিক্রম করে মিসিসিপিতে ঢুকে গেলে ছোট্ট সে বন্দর। সালফার বোঝাই হবে জাহাজে। আবার যাত্রা, আবার দীর্ঘদিন সমুদ্রে। দিন রাত শুধু জল, নীল আকাশ, এবং সমুদ্রের লোনাজলে ডালফিনের ঝাঁক—যেন আর কিছু নেই, এমন কি একটা তিমি মাছ পর্যন্ত আমরা সমুদ্র আবিষ্কার করতে পারলাম না।

কিন্তু বন্দরে পৌঁছেই বোট-ডেকে আমাদের মাস্তার দিতে হল। বড়-মালোম খুব দীর্ঘকায় ব্যক্তি। তিনি দুবার হেঁটে গেলেন। তারপর ফিরে সকল জাহাজীদের উদ্দেশে বললেন, বন্দরে দাঙ্গা বেঁধেছে, সাদা আর কালো মানুষের দাঙ্গা। ভাগ্যবানেরা তোমরা কেউ বন্দরে নামতে পারছ না।

অনুত্তম চুপচাপ রেলিংঙের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ওর পড়শীর চিঠি এ বন্দরেও আসে নি। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। দ্বীপের মত এই অঞ্চলে বড় বড় দেওদার জাতীয় গাছ। বড় চিমনি সব দূরে দূরে ভেসে আছে। কেমন সব বন জঙ্গল অতিক্রম করে গেলে শহরের পথ। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা কংক্রিটের পথ জেটীতে নেমে আসার। কিছু রেড-ইণ্ডিয়ান জেটীতে কাজ করছিল।

মাত্র তিন দিনের ভিতর আমাদের জাহাজ বোঝাই হয়ে গেল। এই তিন দিন শুধু ফাঁক পেলেই ডেকে চলে আসা এবং কিছু অনুসন্ধান করা। চোখ দেখলে সকলে টের পেত—চোখে মুখে কি এক উগ্র কামনা বাসনা আমাদের, আমরা মানুষের মত ছিলাম না, আমরা যুবতীর মুখ ভুলে গেছি কবে—যেন কোনও দিন আর যুবতীর মুখ দেখতে পাব না।

সালফার নিয়ে যাচ্ছি নিউ প্লাইমাউথ বন্দর। সাত আট দিন পর আমরা পানামা ক্যানেল অতিক্রম করব। তারপর প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের

জাহাজ দীর্ঘদিন ভেসে চলবে। কতদিন কে জানে? কোথায় সে বন্দর কে জানে। অনুত্তম মাঝে মাঝে মেজমালোমের কেবিনে ঢুকে বড় একটা মানচিত্রের সামনে দাঁড়াত। জাহাজের গতি কত থাকত, সেই হিসাব করে সে বলে দিতে পারত আর কত দিন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে এখন আমরা তা পর্যন্ত জানতে ভরসা পাচ্ছি না। যেন এই জাহাজ আমাদের এক অসীম সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে, বায়ুহীন, আলোহীন এক অন্ধকারে ছেড়ে দেবে কোনদিন। সুতরাং আমরা সকলেই চুপচাপ, তবু আশা করা গেল জাহাজটা যখন পানামা ক্যানেলের তিনটে লক গেট অতিক্রম করে উপরে হ্রদের মত জলাশয়ে উঠে যাবে তখন হয়ত দু' তীরে শহর ঘর বাড়ি দেখতে পাব। সেই এক উৎকণ্ঠিত আবেগ আমাদের—যুবতীদের মুখ দেখতে পাব আমরা। কিন্তু শুধু জলাশয় দু পাশে, যেন বন জঙ্গল হ্রদের বুকে ছোট দ্বীপের মত জেগে আছে। এমন কি শালুক সাপলার পাতা পদ্মপাতার মত জলে ভাসছিল। আর কিছু ছিল না। কত দীর্ঘদিন হয়ে গেল—কতকাল আগে মনে হচ্ছিল সেই কবে যেন স্বপ্নের মত যুবতীর মুখ আমরা আমাদের শহরে রেখে এসেছি। -তারপর কতকাল কেটে গেল, কত যুগ কেটে গেল, শুধু জল আর জল, নীল জল এবং ফড়িং কোথাও উড়োক্কো মাছের ঝাঁক. কোন কোন সময় ডালফিনের ঝাঁক দিগন্তে ভাসতে দেখেছি।

যখন কোলন শহরে ঢুকব ঢুকব- খালের দু তীরে যখন বাজনা বাজবে আশা করেছিলাম তখন রাতের শহর আমাদের ভেল্কি দেখাল। অনুত্তম ফোক-সালে ছিল না। সে মেজমালোমের পায়ের কাছে দূরবীন নিয়ে বসে আছে। পায়ের কাছে বসে বলছে, একটা বড় হলঘর দেখা যাচ্ছে সেকেণ্ড। দুটো বড় সদর রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। পাব, একটা দুটো তিনটে পাব। বড় পার্ক সামনে। দুটো ব্রীজ পাশাপাশি। কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না। এত রাতে কি মানুষ থাকে। পুলিস, সেকেণ্ড! পুলিস টহল দিচ্ছে। দুটো কুকুর সেকেণ্ড। একটা একটার পিছনে ছুটছে। তিন চারটা লোক সেকেণ্ড। ওরা বুঝি মাতলামি করছে। বড় একটা গীর্জা সেকেণ্ড। ইয়েস ইয়েস বড় গীর্জা, সিঁড়িতে কি যেন দেখা যাচ্ছে। কে যেন দরজায় হাত রাখছে, দরজাটা খুলে ঢুকে যাবে গীর্জায়। ইয়েস ইয়েস, সেকেণ্ড। ইয়েস ওম্যান। সে দূরবীন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এত জোরে চীৎকার করে উঠেছিল আমরা যারা পিছিলে বসে জাগছি তারা পর্যন্ত সে চীৎকার শুনতে পেয়ে-

ছিলাম। ডেক ধরে ছুটোছুটি। কাছে গিয়ে দেখি অমুত্তম-দু' ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে পড়েছে। দূরবীনটা ওর পাশে পড়ে রয়েছে। মেজমালোম দুঃখে কেবিনে চলে গেছেন। হতাশায় অমুত্তম চোখে অন্ধকার দেখছিল—সে বিড় বিড় করে তখনও বকছিল, মনে হচ্ছে, সদরে ঢুকে গেল, ইয়েস ইয়েস সেকেণ্ড, বাট সাম গুড ওম্যান। জাহাজ তখন সমুদ্রে নেমে গেছে। আমরা সমুদ্রের ভিতরই গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলাম। বুড়ি মেমসাব ভেঙ্কি দেখিয়ে গীর্জার ভিতরে ঢুকে গেল। দুটো আলবাট্রস পাখি আমাদের জাহাজের পিছনে উড়ে উড়ে আসছে। ফোকসালে ফিরে যাবার পথে পাখি দুটোকে দেখতে পেলাম।

উপকূলভাগ পিছনে পড়ে থাকল। জাহাজ থেকে উপকূলভাগের দিকে তাকালে শুধু এখন দুই পাখি—আলবাট্রস পাখি। ওরা উড়ে উড়ে জাহাজের পেছনে আসছে। উড়ে উড়ে খুব উপরে উঠে যাচ্ছে তারপর গ্লাইড করতে থাকল। এখন নীচে নেমে আসছে পাখি দুটো এবং দূরে প্রপেলারটা যে জল ভেঙে এসেছে সেখানে বসে সাঁতার কাটছে।

সন্ধ্যার পর যখন চরাচর অন্ধকার হয়ে এল, যখন কোন আলো ছিল না সমুদ্রে, ঢেউ ছিল না, শান্ত নিরিবিলি বাতাসের ভিতর জাহাজটা ধীর গতিতে চলছে তখন আমি এবং অমুত্তম আবিষ্কার করলাম মাস্টের উপর দুটো পাখি বসে আছে। মাস্টের আলোতে ওদের বুকের সাদা অংশটা পশমের মত মসৃণ দেখাচ্ছিল। পরদিন ভোরে পাখি দুটো রেলিঙে নেমে এল। গ্যালী থেকে সব উচ্ছিষ্ট তারা উড়ে উড়ে খাচ্ছিল। ডেক-ভাণ্ডারী মাংসের চর্বি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। জাহাজীরা সকলে খেলার ছলে ভিড় করে দাঁড়াল। ছোট পাখিটার সাহস দেখে আমরা তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম।

অমুত্তম বলল, লেডি আলবাট্রসের চোখ দেখেছিস বাঁড়ুজ্যে।

ঠাট্টা করে বললাম, তোর পড়শীর মত বুঝি?

অমুত্তম উত্তর করল না। কেমন দুঃখের গলায় শুধু বলল, কত বড় চোখ। আর কী নীল! সে নিজেও দুটো চর্বির টুকরো এনে ছোট আকারের পাখিটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিতে থাকল।

চড়ুই দুটো আপন মনে ডেকের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। মিসেস স্প্যারো একটা রেলিঙের উপর বসে লেজ নাচাচ্ছে। অ্যালবাট্রস পাখি দুটো এখন জাহাজে নেই। ওরা ফের সমুদ্রে উড়ে গেছে। ওরা

জাহাজের উপরে অথবা পিছনে এবং কোন কোন সময় দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ফের কোত্থেকে প্রায় যাদুকরের মতন সহসা মাস্টের উপরে গ্লাইড করার সময় মনে হল অতিকায় দুই পাখার অন্তরালে মিসেস স্প্যারোকে ঢেকে ফেলছে। নিমেষের ভিতর মনে হল লেডি অ্যালবাট্রসের ঠোঁটে ছোট্ট এক পাখি, আমাদের প্রিয় চড়ুই পাখি অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্রুত ছুটে গেলাম বোট-ডেকে। স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম, অমুত্তম, লেডি অ্যালবাট্রস মেয়ে চড়ুইটাকে খেয়ে ফেলেছে। অমুত্তম সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে উঠে এল। সে প্রথম বিশ্বাস করতে পারল না, সে ডেকময় দুই পাখিকে খুঁজে বেড়াল, কিন্তু যখন দেখল ডেকে কোন পাখি উড়ছে না, অ্যালবাট্রস দুটো পর্যন্ত সমুদ্রের কোথাও হারিয়ে গেছে তখন সে পাগলের মত ছুটে গেল বোট-ডেকে। ব্রীজের নীচে দাঁড়িয়ে ডাকল, সেকেণ্ড গেট ডাউন প্লিজ। মিসেস স্প্যারো ডেড। সোয়ালোড বাই লেডি অ্যালবাট্রস।

মেজমালোম সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন নীচে। কিছু বললেন না। সোজা কেবিনে ঢুকে কাপ্তানের বন্দুকটা নিয়ে এসে বোট-ডেকে দাঁড়ালেন। সমুদ্রে পাখি দুটো কোথায় এখন—কোথাও দেখা যাচ্ছে না, বোধ হয় সমুদ্রের জলে বসে ওরা এখন সাঁতার কাটছে। তিনি পাখির আশায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভিতরে কেমন দুঃখের আবেগ ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। মনে হল, তখন বিশাল দুই পাখি ডানা মেলে উড়ে উড়ে আসছে। জাহাজের উপর দিয়ে এত দ্রুত উড়ে গেল যে, তিনি বন্দুক তোলার আগেই সমুদ্রের ঢেউ অতিক্রম করে জলের ভাঁজে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। সেকেণ্ড তবু দু তিনটে পর পর গুলি করলেন। গুলিগুলো ফাঁকা হাওয়ার শিষ তুলে হাউইয়ের মত নিবে গেল। দক্ষিণের আকাশে তিনি পাখি দুটোকে দেখতে পেলেন—ওরা বিন্দুবৎ আকাশের গায়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁকে নির্বোধের মত দেখাচ্ছিল।

সারা বিকাল অমুত্তম পুরুষ চড়ুইটাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। কোথাও সে পুরুষ চড়ুইটাকে আবিষ্কার করতে পারল না। সন্ধ্যায় সে টর্চ মেরে এনজিন-রুমের সব ফাঁক ফোকর দেখে এল—কোথাও যদি চুপচাপ ভয় পেয়ে পাখিটা লুকিয়ে থাকে। কাঠের বাক্সটাতেও টর্চ মেরে দেখেছে। না, কোথাও নেই পাখিটা। অমুত্তম হতাশ মুখে ফিরে এল ফোকসালে।

এই করে আমাদের দিনগুলি জাহাজে কেটে যাচ্ছিল। তিন মাসের

বেশী হয়ে গেছে আমরা মাটিতে নামতে পারিনি। কখনও যদি কোথাও প্রবালদ্বীপ দেখেছি তবে ডেকে উঠে সকলের কী কোলাহল! অনুত্তম তেমনি চড়ুই পাখিটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মেজমালোমের ক্ষোভ আরও প্রবল হচ্ছে। অ্যালবাট্রস দুটো জাহাজের পেছন ছাড়ছে না। কারণ জাহাজের পেছন ছাড়লে ওরা আর কিনারায় পৌছাতে পারবে না। অবসর পেলেই বোট-ডেকে বন্দুক হাতে তিনি পায়চারি করছেন এবং দূরবীনে পাখির গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন।

একদিন ভোরবেলা বন্দুকের গর্জনে সব জাহাজীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। যারা ওয়াচে ছিল তারা পর্যন্ত ছুটে এসেছে। সূর্য উঠছিল, সমুদ্রের বুক ঠেলে সূর্য উঠছে। ডেকের উপর জাহাজীদের ছুটোছুটি বেড়ে গেছে। আমরা দেখলাম, অতিকায় এক পাখি ডেকের উপর পড়ে আছে। এত বড় পাখি অথচ সমুদ্রের কোলে কত না ছোট মনে হয়। অনুত্তম পাখিটার পাশে দাঁড়াল।

লেডি অ্যালবাট্রস জাহাজটার চার পাশে উড়ছে। উড়তে উড়তে দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অতি দূর সমুদ্রের বুকে মনে হতে লাগল পাখিটার কান্না কেমন প্রবল ফুলে ফেঁপে ওঠা ঢেউয়ের মত আমাদের দিকে ছুটে আসছে। বোধ হয় পড়শীর মুখ মনে পড়ছিল অনুত্তমের। সে যেন এক দূর বনবাসে পড়শীকে ফেলে চলে এসেছে। ফুলফলবিহীন অথবা মরু-ভূমির মত এই সমুদ্র ওকে পুরুষ অ্যালবাট্রস পাখির মত অসহায় করে তুলেছে। পাখিটা ঠোঁট খুলে হাঁ করছিল, ডানা ঝাপটাচ্ছিল। মেজমালোম কেবিনে ফিরে যাচ্ছেন। যেতে যেতে তিনি রেলিঙে ঝুঁকে লেডি অ্যালবাট্রসকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন সমুদ্রে, পাখি নেই। শুধু নীল জল অনন্ত আকাশের নীচে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। তাঁর যেন ক্ষোভের অন্ত নেই। মেয়ে চড়ুইয়ের মৃত্যুর পর থেকে তিনি আর বোট-ডেকে বসতে পারতেন না। তাঁর কেমন বড় নিঃসঙ্গ এবং একা লাগত এই জাহাজ, সমুদ্র এবং বোট-ডেক। অনুত্তম পাখিটার ঠোঁটে একটু জল দিল। তারপর পাখিটা মরে গেল।

আমরা সকলেই গোল হয়ে দাঁড়ালাম পাখিটার চারপাশে। অনুত্তম পাখিটার মাথার কাছে বসে থাকল কিছুক্ষণ। বসে বসে লেডি অ্যালবাট্রসের জন্য কেমন সে বেদনা বোধ করল। এই পাখির মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে

দায়ী ভেবে খুব বিমর্ষ হয়ে গেল। সে দিগন্তে লেডি আলবাট্রসকে খুঁজল। সমুদ্রের কোথাও সে প্রথমে পাখিটাকে দেখতে পেল না। তারপর মনে হল, বিন্দুবৎ কি আকাশের প্রান্তে দেখা যাচ্ছে, তারপর দেখা গেল সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে এবং তারপরই পাখিটা মরিয়া হয়ে জাহাজটার দিকে উড়ে আসতে থাকল। কি যেন এক সঞ্জীবনী সুধা আছে সমুদ্রে। পাখিটা তার প্রিয় পুরুষ পাখিটার জন্য বুঝি সেই সঞ্জীবনী সুধা আহরণ করে এনেছে এবার। সুতরাং আমরা তাড়াতাড়ি পাখিটাকে তুলে ধরলাম এবং একজন মৃত নাবিকের মত ওকে জলে নামিয়ে দিতেই লেডি অ্যালবাট্রসটা সেই যে মৃত পাখিটার পাশে বসে জলে ভাসতে থাকল আর উড়ল না। আমাদের মনে হয়েছিল লেডি অ্যালবাট্রস আর কোনদিন উড়বে না।

প্রাচীন নাবিকের মত আমাদের কোন সংস্কার ছিল না। বিকালে জাহাজের পিচিং সামান্য বাড়ল। লেডি অ্যালবাট্রসকে দিগন্তে দেখা যাচ্ছে না। ক্রমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। অল্প অল্প বৃষ্টি। অল্প বাতাস। বাতাসের জোর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল। মেজমালোম সময় পেলেই বন্দুক হাতে ফের বোট-ডেকে উঠে আসছেন। তিনি তাঁর রেঞ্জের ভিতর পাখিটাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেন। ক্রমে বাতাসে ঝড়ের দৃশ্য ফুটে উঠতে থাকল। জাহাজ ওঠানামা করতে থাকল। এলোমেলো বাতাস। কোন কোন সময় বাতাস ঘূর্ণির মত—আমাদের স্টোকহোলডে ষ্টিম রাখতে প্রাণান্ত, অমুত্তম বোট-ডেকে ঝড়ের ভিতর পাখিটার প্রত্যাশায়। কিন্তু দিগন্তে না পাখি, না তার কোন চিহ্ন। বড় বড় ঢেউ, এলোমেলো বৃষ্টির ছাট এবং সন্ধ্যার দিকে যখন চরাচর অন্ধকার হয়ে এল, সমুদ্রের গর্জন প্রবল হচ্ছে, ঢেউ পাহাড়প্রমাণ ফুলে কেঁপে উঠছে, ষ্টিয়ারিঙ এনজিন কক কক করে উঠছে ঝড়ের তাড়নায় তখন আমরা সকলে বিস্ময়ে লেডি অ্যালবাট্রসকে উত্তরের আকাশে আবিষ্কার করলাম। ঝড় বৃষ্টির ভিতর পাখিটা জেটের মত উপরে উঠে যাচ্ছে, আবার নীচে নেমে আসছে। ঝড় সঙ্গে নিয়ে পাখিটা জাহাজের পেছনে ছুটছে। খুব কাছে এলে আমরা তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

জাহাজটা আমাদের বড় পুরানো। কয়লার জাহাজ। ব্যাঙ্ক লাইনের এটাই সবচেয়ে পুরানো জাহাজ। আমাদের জাহাজের বৃদ্ধ কাপ্তান পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাত্রিতে ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিলেন। কারণ, মনে

হচ্ছিল, উত্তরের ঝড় জাহাজটাকে লম্বাভাবে খাড়া করে দিচ্ছে, দক্ষিণের ঝড় জাহাজটাকে সামনের দিকে তুলে আনছে, পুবের ঝড় জাহাজটাকে যমুনাবাজু গঙ্গাবাজুতে একটা ভেলার মত দোলাচ্ছে। কেবিনময় সমুদ্রের জল। এবং এক সময় কড় কড় করে কোথাও সমুদ্রে বজ্রপাতের শব্দ। ভোর রাতের দিকে সাইক্লোনের তাণ্ডব সামান্য কমে এল এবং আমরা ভাবলাম দুঃস্বপ্নের রাত্রি বুঝি কেটে গেল। কিন্তু হায় কী হবে—পাখি ত পাখি, পাখির সঙ্গে এই সমুদ্র আমাদের উপর বিরূপ হয়ে উঠছে। ঝড়ের জন্য ডেকের উপর দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। দ্বিগুণ উৎসাহে ঝড় এবং সমুদ্রের জল আমাদের জাহাজটাকে ঢেকে দিল। হিবিং লাইন ছিঁড়ে গেছে। জাহাজীরা ডেকে উঠতে প্রায় কেউ সাহস পাচ্ছিল না। এনজিন জাহাজীদের জন্য টানেল পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। আর যত এখন গণ্ডগোল এনজিন রুমে, বয়লারে, স্টোকহোলডে। ট্যাণ্ডেল পাগলের মত ছুটাছুটি করছে।

ভোরবেলা খুব সাহস ভরে সমুদ্রের তাণ্ডব দেখব বলে ডেকে উঠে গেছি। জাহাজটা ছোট্ট ভেলার মত অথবা খোলা মুচকির মত ডুবো ডুবো অবস্থায় চলছে। এমন সময়ে মনে হল যেন অনুত্তম ডেকের উপর দিয়ে টলতে টলতে ছুটে যাচ্ছে। মেজমালোম পোর্টহোলের কাঁচে সমুদ্র দেখছেন। তিনি বন্দুকটা শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন। এমন ভয়াবহ জাহাজডুবির ভিতরেও ওঁর প্রতিশোধ-স্পৃহা দমছে না। আমি চুপি চুপি মেসরুম বয়দের দুটো কেবিন অতিক্রম করে সব দেখতে পাচ্ছি। অনুত্তম পাগলের মত হাঁটতে হাঁটতে এক নম্বর মাস্টের নীচে এসে দাঁড়াল। পাখিটাকে দেখল। পাখিটা এখন মাস্টের উপর বসে আছে। অনুত্তম হাতে তালি বাজাতেই পাখিটা উড়ে ঝড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুত্তম নিজের ফোকসালে ফিরে গেল না। সে সোজা হেঁটে এলওয়েতে ঢুকে ডাকল, সেকেণ্ড! সেকেণ্ড! দরজা খোলার শব্দ, কি যেন কথা কাটাকাটি! মেজমালোম আমাদের যতই প্রিয়জন হোন, তিনি অনুত্তমের মত সাধারণ নাবিকের এমন ব্যবহারে রুষ্ট হতে পারেন ভেবে ছুটে নীচে নেমে গেলাম। দেখলাম, তিনি অনুত্তমের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন। এবং বলছেন, সি ইজ দা রুট অফ অল ইভিলস! সি মাষ্ট ডাই।

আমি অনুত্তমের হাত চেপে ধরলাম।—তোর এটা বাড়াবাড়ি অনুত্তম, কোথাকার কি এক পাখি তার জন্ত তোর চোখে ঘুম নেই।

অমুত্তম আমার কথার জবাব দিল না। কোথায় কোন এক অসীমে পরস্পরকে ভালবাসার নক্ষত্র জেগে থাকে কে জানে। অমুত্তম ডেকে দাঁড়িয়ে এখন দেখলে মনে হবে সে সেই নক্ষত্রের অনুসন্ধানে আছে। আমি অমুত্তমের সেই করুণ মুখ দেখে আর কোন কথা বলতে পারিনি।

ঝড়ের ভিতর জাহাজ প্রাণপণে শেষ পর্যন্ত লড়ছে। দুপুরের দিকে দুটো ডেরিক হাল্কা শোলার মত ঝড়ে উড়ে গেল! সন্ধ্যার দিকে চালা উড়ে যাবার মত ব্রীজের একটা ছাদ উড়ে গেল সমুদ্রে। কনকনে ঠাণ্ডার ভিতর নাবিকেরা সমুদ্রের সঙ্গে যুঝে চলেছে। মেজমালোম ভাঙ্গা ব্রীজের উপর সাহসী যোদ্ধার মত ক্ষেপা সমুদ্রকে উপেক্ষা করে স্টিয়ারিং হুইলে হাত রাখলেন। কোয়ার্টার মাষ্টার পর্যন্ত ভয়ে দাঁড়াল। তিনি এনজিন রুমে নানারকমের সংকেত পাঠাতে থাকলেন থেকে থেকে। আর দেখছিলেন, লেডি অ্যালবাট্রস সমুদ্রে প্রায় পুতুলখেলার মত ঢেউ নিয়ে তামাশা করছে। ঢেউয়ের মাথায় পাখিটা ভেসে থাকছে, ঢেউ জাহাজের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মেজমালোম অন্ধকার দেখছেন। নোনা জলে শরীর কামড়াচ্ছে। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, ইউ ইভিল! ইউ মাষ্ট ডাই।

ঝড়ের সঙ্গে যুঝে আমরা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। আমার ওয়াচ বারটা-চারটা। ওয়াচ শেষে ফোকসালে ফিরে হুঁশ থাকত না। নোংরা জামা কাপড় নিয়েই বাংকে শুয়ে পড়তাম। ওয়াচ শেষ করে ফোকসালে ফিরেছি। শুকনো খাবার লকার থেকে বের করার সময় দেখি, অমুত্তমের বাংক খালি। ঝড়ের ভিতর সে গেল কোথায়! যদি বাথরুমে গিয়ে থাকে। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে দেখছি বাথরুমের দরজা খোলা। কেউ নেই। ডেকের উপর যাওয়া এখন বিপদজনক। তবু স্টেনশান ধরে ধরে হাটছি। খুব শক্ত হাতে একটার পর একটা ডেকে উঠে গেলাম। কোন আলো ছিল না ডেকে। কী নির্মম অন্ধকার! তবু অন্ধকারে আমি এক নম্বর ফলকা পর্যন্ত হেঁটে গেছি। চীৎকার করে ডাকলাম, অমুত্তম তুমি কোথায়? সহসা বিদ্যুৎ চমকালো। গোটা জাহাজের ডেক, ফলকা মাষ্ট এবং ভাঙ্গা ডেরিকের ভিতর মনে হল অমুত্তম রাজার মত মাষ্টের নীচে বসে আছে। মাস্টের মাথায় পাখি। সে বসে বসে পাখিটাকে পাহারা দিচ্ছে। যেন পাখি তার প্রিয়জনের মত। সে ফিস ফিস করে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, বাড়ুজ্যে, জোরে কথা বলো না। পাখিটার ঘুম ভেঙে যাবে।

আমি এখানে বসে আছি, পাখিটাকে পাহারা দিচ্ছি। ভোর হলে তালি বাজাব হাতে—পাখিটা উড়ে যাবে; মেজমালোম টের পাবে না—কোন-রকম পাখিটাকে তীরে পৌছে দেব।

অমুত্তমের কথায় আমি হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। এক সামান্ত পাখির জন্ত জীবন বিপন্ন করে মাষ্টের নীচে বসে থাকা—ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা আসছে এবং ঢেউয়ের ভিতর ফসফরাস জ্বলছে আর চারিদিকে তাকালে মনে হয় মরীচিকার মত আলো-আঁধারির খেলা চলছে সমুদ্রের গর্ভে। আমরা দুই তরুণ নাবিক মাষ্টের নীচে বসে সেই আলো-আঁধারের খেলা দেখছি। মৃত্যুর ছায়া আমাদের চার পাশে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। অতিকায় ঢেউ এসে আমাদের যে-কোন সময় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি অনুত্তমের হাত ধরে বললাম, ফোকসালে চল, এখানে বসে থাকলে মরে যাবি।

অমুত্তম কোন উত্তর করল না। হাই তুলল, হাই তুলতে তুলতে সতর্ক হয়ে গেল। সে উইনচ ম্যাসিনের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। সে যেখানে বসে ছিল তার ঠিক সামনে দু নম্বর ফলকা, ফলকা পার হলে ডান দিকে চীফ কুকের গ্যালী বাঁ দিকের কেবিনটা ফাঁকা এবং এলওয়ে বরাবর মেজমালোমের কেবিন। কেবিনের দরজা খুলতেই নীল রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ল। আলো দেখে অনুত্তম সামান্ত সময় চুপচাপ বসে থাকল। মেজমালোম টলতে টলতে সোজা সামনের দিকে না এসে বয় কেবিনের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলেন। হাতে বন্দুক। তিনি ঝড়ে উড়ে যেতে পারেন ভেবে বোট-ডেকে হামাগুড়ি দিতে থাকলেন। তারপর চারিদিকে সতর্ক নজর। পাখিটা ভোর-রাত্তের দিকে জাহাজের উপর উড়ে এসেছে, তিনি কক কক শব্দে টের পেয়েছেন। পাখিটা জাহাজের কোথাও না কোথাও এখন বসে আছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেই আলোর ভিতর তিনি পাখিটার সন্ধানে আছেন। তিনি সন্তর্পণে বন্দুক তুলে এমিঙ করছিলেন। অনুত্তম সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল। মেজমালোম বন্দুকের নলটা একটু তুলে ধরলেন। সামনে মেসরুম বয়দের কেবিন। কেবিন পার হলে তিনি একটু আড়াল পাবেন। এই জায়গাটা তিনি প্রায় ছুটে পার হয়ে এলেন। তারপর বন্দুকের নলটা সোজা উপরে তুলে দিলেন। বিদ্যুৎ চমকালেই তিনি গুলি করবেন।

অনুত্তম আর দেরি করল না। সে তালি বাজাল। কিন্তু আশ্চর্য, পাখিটা উড়ছে না। সে ফের জোরে তালি বাজাতে লাগল। পাখিটা কিছুতেই উড়ছে না। রাজ্যের ক্লান্তি এসে পাখির ডানায় জমেছে। কতকাল উড়ে উড়ে পাখিটা বুঝি এখন জরদ্‌গব পাখি হয়ে গেছে। হতাশা এবং বিষণ্ণতা পাখিটার চোখে। অসহায় এই পাখির জন্য অনুত্তম এখন কি করবে, কি করলে সে পাখিটাকে উড়ে যেতে সাহায্য করতে পারে, ভাবতে পারছে না। সে চীৎকার করে উঠল এবার, ফর গডস সেক সেকেণ্ড, তুমি ওকে মেরো না। সে অন্ধকারে ছুটতে থাকল। পাগলের মত ছুটে সে বন্দুকের নলের নীচে মাথা দিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, সেকেণ্ড, ডোণ্ট কিল হার। সে সমুদ্রের দোহাই দিল মেজকে।

—সি মাষ্ট ডাই। বলে তিনি ফের বন্দুকের নল তুলতেই অনুত্তম ফিস-ফিস করে কানের কাছে কি বলল। বিদ্যুতের আলোতে আমি দেখলাম, তিনি পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন। মোমের মত সাদা এক পুরুষ, যেন কতকাল পর সমুদ্র এবং উপকূল দেখতে দেখতে দেখতে এক নিরুদ্দিষ্ট জাহাজ বন্দর পেয়েছে। তাঁর চোখে মুখে মহিমময় ঈশ্বরের মত বিস্ময় ফুটে উঠছিল। —তিনি বন্দুকের নলটা এবার নীচু করে দিলেন। মনে হল, অনুত্তমের কাঁধে হাত রেখে তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন—বিশ্ব চরাচরে এক পাখি উড়ে উড়ে নিরন্তর এক নীড়ের সন্ধানে আছে। তিনি সে স্বপ্নের ভিতর ডুবে যেতে যেতে বললেন, দেন অনুত্তম সি'জ দা ওনলি ওম্যান ইন দ শিপ।

—ইয়েস, সেকেণ্ড।

—ওনলি ওম্যান ?

—ইয়েস, সেকেণ্ড।

—লেট আস দেন এনজয় টুডে। বলে তিনি কেমন সরল বালকের মত বন্দুকের সব গুলি এক দুই করে ছুঁড়ে দিতে থাকলেন। যেন তিনি উৎসবের দিনে বাজি পোড়াচ্ছেন।

মন্ত্রের মত সে রাত্রেই আমাদের ঝড় থেমে গিয়েছিল।

বন্দুকের গর্জন শুনে সব জাহাজীরা ডেকে ছুটে এল। ভোর হয়ে আসছে। আমরা বিপর্যস্ত জাহাজীরা মাষ্টের নীচে বসে পাখিটাকে দেখছিলাম। জাহাজটা এখন হালভাঙ্গা জাহাজের মত স্থির। সমুদ্রের নীল জল আকাশের নীচে ছোট ছোট ঢেউ তুলে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। পরিচ্ছন্ন আকাশ।

বড় একটা নক্ষত্র দক্ষিণের আকাশে জ্বলছে। পাখিটা ঠোঁট পালকে গুঁজে বুঝি ঘুমিয়ে আছে। নির্বিঘ্নে, এবং নির্ভয়ে যেন ঘুমুচ্ছে। মেজমালোম এবং অনুত্তম বন্দুকটা পাশে রেখে বসে আছে। অনুত্তম দূরবীনের ভিতরে পাখিটাকে দেখছিল। পাখিটা দেখা যাচ্ছে না। পালক থেকে পাখিটা ঠোঁট তুলতেই শুধু চোখটা দূরবীনের কাচে ধরা পড়ল। আর মনে হল, সেই এক নীল জলরাশি, অনন্ত জলরাশি এই নীল চোখের ভিতরে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

মেজমালোমও পাখিটা দেখছিলেন।

অনুত্তমের কাছে আমি প্রথম আজ দূরবীনটা চেয়ে নিলাম। তারপর শুধু চোখটা কাঁচের ভিতর ধরতেই মনে হল অনন্ত এক সমুদ্রের নীল জলের খেলা শুধু। সাদা এক জাহাজ সেই নীল জলে ভেসে আছে। নীল জলে আমাদের ভালবাসার জাহাজ পাখিটার চোখে পাল তুলে যাচ্ছে। পাখির এমন উজ্জ্বল নীল চোখ আমি আর কোন দিন দেখিনি।

তারপর এক উৎসবের দিনে পাখিটাকে আমরা বন্দরে পৌঁছে দিলাম। ক্রীসমাসের উৎসব। গির্জায় গির্জায় তখন ঘণ্টা বাজছিল।

গ্রেট ক্যালকাটা শো

বকুল কলকাতার ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। অবিনাশ বকুলের হাত ধরে হাঁটছে। ট্রাম বাস, মানুষের মিছিল। বকুল গ্রামের ছেলে। সেই বকুল সহসা একটা গলিপথ দেখে থেমে গেল। বলল, বাবা, আমরা সেই পথটা খুঁজে পাব না?

অবিনাশ ছেলের কথার কোন জবাব দিল না। ঠিক যেমন বিদ্যালয়ে অবিনাশ ভূগোল পড়াবার সময় নীচু ক্লাসের ছাত্রদের প্রশ্ন করে থাকে, তেমনিভাবে বলল, কলকাতায় কি কি দেখবার স্থান আছে, বকুল?

বকুল বলল, পরেশনাথের মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, চিড়িয়াখানা, হাওড়ার ব্রীজ।

—আর কি?

ওরা প্রায় দ্রুত হাঁটছিল। শীতকাল, দ্রুত হাঁটলে শরীরে শীত থাকে না। অবিনাশ হাঁটতে হাঁটতে ছেলের জবাবের প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু বকুল জবাব দিতে পারছে না। অবিনাশের চোখ মুখ রাগে লাল হচ্ছে। কিচ্ছু মনে রাখে না বকুল, পড়াশোনায় মন নেই। সে ফের বলল, আর কি?। বল, আর কি?

বকুল জবাব দিতে পারছে না। ভয়ে সে ট্রামের তার দেখছে। বড় রাস্তা। বড় অট্টালিকা। তারপর ট্রাম ডিপো। বকুল দেখল, এখানে সব ট্রামগুলো ঢুকে যাচ্ছে। কে যেন তখন ভিতরে ঘন্টি বাজাচ্ছিল। কিসের ঘন্টি? বোধ হয় ট্রামের ঘন্টি। কিন্তু ট্রাম ঘন্টি দিতে দিতে বের হয়ে আসছে।

অবিনাশ বলল, তোমার কিছু মনে থাকে না, বকুল। দেখো, দেখো। অবিনাশ বড় এক প্রাসাদের মত বাড়ি দেখাল বকুলকে, বলল, বসু বিজ্ঞান মন্দির। জগদীশ বসুর জন্ম কত সালে. ব কুল?

ঘন্টির জন্য হোক অথবা কোন মানুষের কলরবে হোক, বকুল অবিনাশের কথা শুনতে পায় নি। সে গলি-ঘুঁজি দেখলে, লাইট পোষ্ট দেখলে।...

বোধ হয় এই সেই পথ, বকুল সেই অসামান্য পথটির কেবল অনুসন্ধান করছে।

বকুল হাঁটতে হাঁটতে বলল, বাবা এটা সেই পথ নয়?

—তুমি বড় বাজে বকো, বকুল। তুমি সব ভুলে যাচ্ছ। জগদীশ বসুর জন্ম কত সাল বলতে পারলে না।

সে ভয়ে ভয়ে অবিনাশের দিকে তাকাল। অবিনাশ এখন অন্য ফুট-পাথে পা-কাটা এক মানুষের ছবি দেখছে। পা-কাটা মানুষ ফুটপাথে, পিঠের উপর ভর করে সাপের মত এগুচ্ছে। শীতকাল—ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পা-কাটা মানুষটার শরীরে কোন পোশাক নেই, শুধু এক বিজ্ঞাপন ঝুলছে। বুকের উপর। পাশে বোর্ড,—ইংরেজী এবং বাংলায় লেখা কত সাল, কোন তারিখে তার পা দুটো বাসে কাটা গেছে।

পা কাটা মানুষটার বিসদৃশ ছবি বকুলকে ভিতরে ভিতরে কষ্ট দিচ্ছিল। মানুষটার বুকের উপর এনামেলের বাটি। মনে হল, এই মানুষ বেশি সময় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকলে বকুলকে তাড়া করবে। বকুল বাবার পিছনে পিছনে হাঁটছে। তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হবার জন্য বকুল ছুটতে থাকল।

কিন্তু সামনে সদর দরজা; লোহার বড় গেট, ভিতরে কৃত্রিম পাহাড়, জলের হ্রদ আর বনজ ঘাস হ্রদের চারপাশে। গেট দেখে, ছোট্ট পাহাড় দেখে বকুল গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। অবিনাশও ছুটে আসছে। ছেলেকে ছুটতে দেখে অবিনাশও দ্রুত ছুটছে।

অবিনাশ দেখল বকুল রাজবাড়ীর সদর ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। বড় ফটক, ভিতরে এক উর্দিপরা দারোয়ান—অবিনাশ বকুলের পাশে দাঁড়িয়ে দানবীর মহারাজের গল্প বলল বকুলকে।

অবিনাশ ছেলেকে প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের এই বাড়ি দেখাতে পেরে বড় খুশী। বড় ভাল লাগছিল অবিনাশের। অবিনাশ সামান্য শিক্ষক, এই সব মানুষের ইতিহাস ওর সম্পদ, সে সময়ে অসময়ে বকুলকে এই সব প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের গল্প বলে বড় হতে শিক্ষা দিচ্ছে।

পাহাড়টার অন্য পাশে প্রাসাদে উঠে যাবার পথ। দু পাশে দেশী-বিদেশী ফুল ফুটে আছে—রঙবেরঙের গাড়ি, এবং ভিতরে মানুষের কোলাহল। বকুল ভিতরে ঢুকতে চাইলে অবিনাশ প্রায় তাকে টেনে

টেনে রাস্তায় নামিয়ে আনল এবং বলল—তোমাকে আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দেখাব, বকুল। তুমি তো বকুল শুধু হাওড়ার ব্রীজ বলেই থেমে থাকলে। এখানে রাজা রামমোহনের বাসস্থান আছে, তুমি আজকাল আর কিছু মনে রাখতে পারছ না। কিছু মনে না রাখলে বড় হওয়া যায় না। বড় না হলে তোমাকে আমরা ভালবাসব না। কোথাও কোনদিন ফেলে দিয়ে আসব।

পথে নামতেই মনে হল বকুলের, পা-কাটা মানুষটা ওকে ফের তাড়া করছে। ভয়ে ওর ফুটপাথ ধরে আবার ছুটতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু অবিনাশ ওকে শক্ত হাতে ধরে আছে, ইচ্ছা করলেই সে ছুটতে পারছে না। সে ফিরে ফিরে পিছনে তাকাচ্ছিল শুধু।

অবিনাশ যেতে বলল, কত বড় রাজবাড়ি না রে?

—খুব বড় না বাবা! ভিতরে অনেক পাখি আছে, না বাবা!

—পাখি কেন আবার? রাজবাড়ির ভিতর পাখি থাকবে কেন? অবিনাশ বকুলের কথায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

শহরে কোন গাছগাছালি নেই, পাখি নেই, শুধু ট্রামের তার, মানুষের মিছিল। বকুলের মনে হচ্ছিল, সব গাছপালা শহরের অথবা পাখপাখালিভরা রাজবাড়ীর সদর দিয়ে ঢুকে পড়লে দেখা যাবে। সেখানে সব শহরের পাখিরা আছে, গাছগাছালি আছে—গল্পের মত রাজবাড়ি আর সেই সুখী দেবদূত আছে, যে সব রঙবেরঙের ফুল ফুটিয়ে রেখেছে এবং ফুলের ভিতর এক দুঃখী রাজকন্যা, দুঃখী রাজকন্যা শুয়ে শুয়ে দেবদূতের গল্প শুনছে।

অবিনাশ বলল, তোমার যত সব আজগুবি চিন্তা, বকুল। তুমি পথ দেখে হাঁটছ না, মানুষের সঙ্গে কেবল ঠোকাঠুকি হচ্ছে। একটু তাড়াতাড়ি হাঁট। সামনে ষ্টেশন, সেখানে আমরা দোতলা বাসে উঠে পড়ব।

বকুল প্রায় হাঁটতে পারছিল না। মানুষ চারধারে গিজগিজ করছে। সে কিছুতেই গা বাঁচিয়ে হাঁটতে পারছে না। একটু অন্যমনস্ক হলেই মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। গ্রামের ছেলে বকুল—ওর ছোট্ট গ্রাম পলাশপুর রাণাঘাট ষ্টেশনে নেমে চলে যেতে হয় গরুর গাড়িতে—অনেকটা পথ, একবার বকুল রাণাঘাট ষ্টেশনে এসে রেলের বড় বড় থাম দেখছিল, রেল-লাইন দেখছিল আর শহরের বড় কুঠির বাড়ি দেখে সারা গ্রামময় রাষ্ট্র করছিল—এই গ্রাম ছেড়ে মাঠ ছেড়ে এবং নদী অতিক্রম করে চলে

গেলে সেই শহর, বড় শহর। তখন অবিনাশ বলেছিল, বকুল তুমি আর একটু বড় হও, তোমাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। বড় শহর কলকাতা। কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পায়ে হেঁটে এসেছিলেন।

অবিনাশ যেতে যেতে বলল, ঈশ্বরচন্দ্রের বাবার নাম কি, বকুল?

—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

—মায়ের নাম?

—ভগবতী দেবী।

—গুড। তুমি, বকুল, ইচ্ছা করলে সব মনে রাখতে পার।

—বাবা, লোকটা আর কোনদিন পায়ে হাঁটতে পারবে না?

—না। সেই এক পা-কাটা মানুষের কথা। বকুল ফিরে এখনও পেছনে তাকাচ্ছে। অবিনাশ বকুলের কাণ্ড দেখে এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল যে, সে তার বিরক্তি প্রকাশ না করে আর থাকতে পারল না। বলল, পথ দেখে না হাঁটলে হোঁচট খাবে। পথ দেখে না হাঁটলে তুমি হারিয়ে যাবে।

অবিনাশের এই কড়া ব্যবহার বকুলকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল। বারবার মার মুখ মনে পড়ছে। মার মুখ মনে আনলেই ভিতর থেকে এক অভিমানের আবেগ কেমন বুক গলা বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। দু দিন হল এই কলকাতায় আসা। আত্মীয়ের বাড়িতে থাকা, বাবা ভোরে বিকেলে শহর দেখতে বের হবেন। ক্রমশ অবিনাশ বকুলের উপর অসাধারণ রুক্ষ হয়ে উঠছে। সুতরাং বকুল আর সহজভাবে অবিনাশকে কোন প্রশ্ন করতে পারছে না। সব সময় ভয়, বাবা বিরক্ত হবেন।

একগুঁয়ে মানুষের মত অবিনাশ হাঁটছে। সে বাসে উঠল না। হেঁটে হেঁটে এই গোটা শহরটা দেখাবে বকুলকে এমন এক ভাব যেন অবিনাশের। ওরা হাঁটতে হাঁটতে আরও একটা ট্রাম ডিপো পার হয়ে এল, সামনে গির্জা, গির্জার পাশে পড় এক কবরখানা। ভিতরে ঝোপজঙ্গলের মত। কাঠের, অথবা কংক্রিটের ক্রস। বড় মাঠের ভিতর ক্রসগুলো ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে।

বকুল এতু দূর হেঁটে এসেছে—ওর মনেই হচ্ছে না, সে অনেক দূর হেঁটে এসেছে। এত বড় মাঠ দেখে, পলাশপুরের মত নির্জন ফাঁকা মাঠ দেখে ঝোপজঙ্গল দেখে সে প্রায় স্থির থাকতে পারছিল না। সে বাবার কঠিন

ব্যবহারের কথা ভুলে গেল। সে বলল দেখ বাবা, রামাদের গ্রামের মত বড় মাঠ সামনে।

অবিনাশ বলল, ওটা বড় কবরখানা। সাহেবদের কবর হয় এখানে। বলে অবিনাশ বকুলের হাত ধরে রাস্তা পার হবার সময় বলল, কবি মধু-স্থদনের কবর দেখবে এস। বলে ওরা বড় রাস্তা ধরে অন্য পথে এক অপরিসীম ছায়াস্নিগ্ধ জায়গায় ঢুকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল।

বকুল দেখল মাথার উপর সেই স্নিগ্ধ ছায়া আর কত পাখপাখালি এবং নীচে এক কবর। কবরে কবি মধুস্থদন শুয়ে আছেন—ওর মনে হল বারবার ঃ জন্ম যদি তব বঙ্গে···

অবিনাশ বুঝি ফলকে লেখা কবিতা পডছে মনে মনে।

বকুল অবিনাশের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, বাবা আর পড়তে পারছেন না কেন। বাবা ভাঙা রেকর্ডের মত একই কথা বারবার উচ্চারণ করছেন। বকুল দেখল, কবিতা পড়তে পড়তে বাবার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। দুঃখে দারিদ্র্যে কবির মৃত্যু। পাশাপাশি আর এক মহান মানুষের স্মৃতি ভাসল, বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে। বাবা বারবার বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে বলেছেন। বের হবার মুখে অবিনাশ দেখল, একদল বাচ্চা ভিখারি ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। যেন ওরা জানত, অবিনাশ কবর থেকে 'দয়ার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে' বুকে এই বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে বের হবে। ওরা ভিক্ষা চাইছিল। অবিনাশ গরীব শিক্ষক, সামান্য উপার্জন, সে বকুলকে হেঁটে হেঁটে কলকাতা দেখাচ্ছে। সূর্য উপরে উঠে যাচ্ছিল, শীতকাল হলেও ওরা গরম অনুভব করছে, বকুল জল খেতে চেয়েছিল কখন—ওরা যেন মরুভূমি পার হচ্ছে এমন ভাব অবিনাশের কথাবার্তায়। সে দিই দিচ্ছি করে বকুলকে অনেক দূর নিয়ে এসেছে। স্থতরাং গরীব ভিখারিদের পয়সা দেবার সামর্থ্য না থাকলেও অবিনাশকে পয়সা দিতে হল।

বকুল বলল, বাবা, আমরা এখন কোথায় যাব?

—তোমার রাঙা জ্যেঠু আছে, আমরা এখন তাঁর বাড়িতে যাব।

—চিড়িয়াখানায় যাবে না?

—বিকেলে যাব।

—হাওড়ার পুল?

—যাবার সময় দেখে যাব।

—আর বাবা, যাদুঘর।

—এই তো বকুল তোমার মনে পড়েছে। তুমি প্রথমে যাদুঘর বলতে পারনি।

ওরা যত এগুচ্ছিল পথ তত বড় এবং লম্বা মনে হচ্ছিল। বাড়িগুলো সুন্দর এবং সাজানো। উজ্জ্বল পোষাকে যুবক-যুবতীরা হাঁটছে। এখানে অনেক রঙ-বেরঙের গাড়ি, নদীর স্রোতের মত গাড়ীর স্রোত। বকুল এক এক করে গাড়ী গুনছে, গাড়ি গুনে গুনে শেষ করতে পারছে না।

সুন্দর সাজানো বাড়ির দরজায় অবিনাশ এবং বকুল, পাশে বড় ডাষ্টবিন, ডাষ্টবিনে নম্বর দেখে হাঁটছে। ফুটপাথে, অফিসে দুই যুবতী—এখন আর যুবতী বলে চেনা যায় না, চুলে জট, মাথায় ছেঁড়া কম্বল, গায়ে প্রায় কিছুই নেই—কোমরে ছেঁড়া চটের থলে। ওরা উচ্ছিষ্ট অন্নে ভোজন করছে। বাড়ির নম্বর মিলিয়ে দরজা ঠেলতেই সামনে বড় নেমপ্লেট এবং নীচে লেখা ইংরেজীতে—কুকুর থেকে সাবধান।

বকুল অবিনাশের মত ইংরাজী হরফ পড়ার চেষ্টা করল। বলল, বাবা, বিওয়েয়ার অব ডগ মানে কি?

—মানে কুকুর থেকে সাবধান।

বাবার মুখ এখন বেশ শুকনো দেখাচ্ছে। বকুল চুপচাপ বাবার পিছনে। বাবা খুব ভীতু মানুষের মত হাঁটছে বলে বকুলের আনন্দ হচ্ছিল। বোধ হয়, বাবা কুকুরটার ভয়ে এমন করছে। সে চারিদিকে তাকাল—কোথায় কুকুর, কোথায় সেই ডগ—? এখানে কুকুরকে সকলে ডগ বলে, বকুল ভাবল, রাঙা জ্যেঠুকে বলবে, কুকুরকে ডগ বলতে নেই, কুকুর কুকুরই। রাঙা জ্যেঠু প্রায় রাজার মত বকুলের কাছে। রাঙা জ্যেঠুই হয়ত সেই পথটার খোঁজ দিতে পারবে।

অবিনাশ বলল, দেখেছিস কত বড় বাড়ি করেছে রাঙাদা। চেষ্টায় মানুষের কি না হয়।

ঠিক তখুনি মনে হল, বাড়ির ভিতরে এক কুকুর আর্তনাদ করছে। বকুল তাড়াতাড়ি বাবার হাত ধরে বলল, সেই কুকুর বাবা।

—দুষ্টুমি ক'রো না। করলেই কামড়ে দেবে।

কুকুরের ডাক শুনে ভয়ে বকুলের বুক কাঁপছিল।

দরজার মুখে দারোয়ান হাঁকল, কিয়া মাঙ্‌তা?

অবিনাশ প্রথমে থতমত খেল। ওর গ্রাম্য চেহারা, পায়ে কেড্‌স জুতো দেখে দারোয়ান হেঁকে উঠল, কিধার যানে হোগা বাবুজী! কথায় কেমন রসিকতা অথবা ব্যঙ্গ, যেন ভুল করে অবিনাশ এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। অবিনাশ, গ্রামের অবিনাশ শিক্ষকের মত বলল, বাবু আছেন? বলে সে দারোয়ানের উপর অবহেলা দেখানোর জন্য জবাবের প্রত্যাশা না করে ভিতরে ঢুকতে চাইল। কিন্তু দারোয়ান পথ ছাড়ল না, পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকল।

অবিনাশ বলল, পথ ছাড় বাপু।

দারোয়ান বিন্দুবিসর্গ বুঝল না।

—তুমি দেখছি, বাপু, বাংলা বোঝ না। সে ভাঙা হিন্দীতে বলল, বাবু আমার আত্মীয় হ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান স্যালুট দিল একটা। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশের মনে হল, সে তত ছোট মানুষ নয়। মনে হল, সাহেবমানুষ এই নিকট-আত্মীয়টি একদা বড় গরীব ছিল। অবিনাশের বাবা এই সাহেবমানুষকে পূর্ববঙ্গের বাড়িতে রেখে পড়িয়েছে। শহরে রেখে পড়িয়েছে। বুদ্ধিবলে সাহেবের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসাতে মোটা মুনাফা, বড় বাড়ি, বিলাতী কুকুর আর দেশী বউ (এখন বিদেশিনীর মত)। অবিনাশ সব শুনেছে। সহজে আর কলকাতা আসা হয় না, এলেও এই আত্মীয়কে এতদিন দেখার ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু বকুল, নষ্টের মূল যত এই বকুল। বকুলের এখন বড় হওয়ার পালা। কৃতী পুরুষের জীবনীর মত ওর রাঙা জ্যেঠুর জীবনী ওকে বড় হতে সাহায্য করবে। অবিনাশ ছেলেকে কলকাতা দেখাতে এনে একবার ওর রাঙা জ্যেঠুকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বকুল দেখল, এত বড় বাড়ি অথচ মানুষজন একেবারেই নেই। দু'দিকে দু'টো পাম গাছ, কিছু হলুদ ফুলের লতা পাঁচিলে, দুটো ছোট পাইন গাছ—সবই প্রায় অপরিচিত গাছ। ছোট লনের পাশে ডালিয়ার বেড। বড় বড় ডালিয়া, এত বড় ফুল সে যেন জীবনে দেখেনি।

কুকুরটাও আর চিৎকার করছে না। কেমন নিঝুম এক ভাব। বকুলের মনে হল—কুকুরটা কোথাও লুকিয়ে আছে, কোথাও ওত পেতে আছে। সুযোগমত কুকুরটা লাফিয়ে পড়বে। সে ভয়ে ভয়ে অবিনাশের হাত ধরে সিঁড়িতে পা দিতেই হতবাক—গাড়ি-বারান্দা পার হলেই হলঘর, দেয়ালে

নানারকম চিত্র, ছোট ছোট পা দানিতে পাথরের মূর্তি, প্রায় মেলার পুতুলের মত, শুধু জামা-কাপড় নেই পরনে।

বকুল বলল, বাবা, কুকুরটা কোথাও লুকিয়ে নেই ত?

অবিনাশ কিছু বলার আগেই দেখল, বাঁ দিকের দেয়াল সরে যাচ্ছে অল্প। সুন্দর মুখ, রিবন-বাঁধা চুল, কোমরে লাল ফিতা, স্কার্ট হাঁটুর উপর—একটি মেয়ে দরজার ফাঁকে উঁকি দিল। এই মেয়েই অঞ্জু হবে, অবিনাশ ভাবল। একবার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অবিনাশকে সুদেব চিঠি দিয়েছিল। চিঠিতে অঞ্জুর দুষ্টুমির কথা, মেয়ে ফুল ভালবাসে, কনভেণ্টের ছাত্রী, বিলেত থেকে মাসিক পত্রিকা আনাতে হচ্ছে মেয়ের জন্যে, এসব লিখে জানিয়েছিল।

অবিনাশ বলল, তুমি অঞ্জু না?

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওকে আর দেখা গেল না। ভেল্কিবাজির মত দরজার ওপাশে অঞ্জু অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সিঁড়িতে ওঠার সময়েই সুদেবের সঙ্গে দেখা। সুদেব দোতলা থেকে নেমে আসছিল।

—আরে তুই, অবিনাশ! 'কি অবাক! এটি কে?

—এ বকুল।

—বকুল! বা, বকুল নামটা ত ভারী সুন্দর। হ্যাঁ, অবিনাশ তোর মনে আছে—কিছু যেন মনে করার চেষ্টা করল সুদেব—আমাদের বাড়ির পাশে একটা বুড়ো বকুল গাছ ছিল। সারা বছর গাছটা কিন্তু ফুল দিত। বকুল ফুলের কথা ভুলেই গেছলাম। তোর ছেলের নাম তবে বকুল রেখেছিস!

—ওর মা রেখেছেন।

—হ্যাঁ, তা বউমার শরীর কেমন?

—খুব ভাল নেই।

—যা হোক, তবে তুই শেষ পর্যন্ত এলি!

—এসে গেলাম। কলকাতা বড় শহর। বকুলকে শহর দেখাতে এনেছি। হাতে কিছু কাজ আছে, সেটাও সেরে যাব।

সুদেব কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। —তোরা বোস। বলে বেল টিপতেই বয় হাজির। বকুল একবার সারকাসে পুতুল খেলা দেখছিল। পুতুলগুলো কথা বলে না। ইশারায়, হাতের ভঙ্গিতে, পায়ের ভঙ্গিতে লোক হাসাবার চেষ্টা করে। সুদেব যেন সুতো ধরে সব টানছিল। টানলেই সেই মানুষ হাজির, সুদেব ইংরেজী অথবা হিন্দীতে কি বলছে, ওরা সেই কথামত

কাজ করে চলে যাচ্ছে, কত রকমের কাগজপত্র টেবিলে, ছোট বড়, লাল নীল রঙের পাথর টেবিলে। মানুষগুলো সব এই বাড়ির কুঠরিতে যেন লুকিয়ে আছে, বেল টিপলেই আসে যায়। ওর শুধু সেই মেয়েটির কথা মনে আসছে, মেয়েটিকে সে বাবার পাশ থেকে দেখেছে। মেয়েটি বকুলকে দেখেনি। সহসা দরজা খুলে গেল—সব যেন ভোজবাজির মত।

বকুল টুপ করে প্রণাম করে ফেলল সুদেবকে। তারপর বলল, জল খাব।

কাঁচের গ্লাসে ঢাকা জল, পাশে ছোট্ট রুমাল মুখ মোছার জন্য এবং বড় ট্রে একটা। বকুল ঢকঢক করে জল খেয়ে নিল। হাতের আস্তিনে মুখ মুছল। এবং এ সময়েই অঞ্জু বাবার ঘরে কারা এসেছে দেখার জন্য ঢুকে বের হয়ে গেল।

অবিনাশ বলল, অঞ্জু না?

—হ্যাঁ।

—নীচে দেখা হল, কথা বলল না। অবিনাশ কেমন বালকসুলভ অভি-মানে দাদাকে নালিশ করল।

—মুশকিল, বুঝলি অবিনাশ, মেয়েটা বাংলা জানে না। বাংলা বোঝে না। তোর কথা বোধ হয় বুঝতে পারেনি।

—বাংলা জানে না কেন?

—ওদের স্কুলে বাংলা-টাংলা পড়ায় না।

বকুল অবিনাশের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, অঞ্জুদির বন্ধু নেই?

সুদেব হাই তুলছিল। সুদেব একটা কাগজ তুলে কি দেখল. তারপর বকুলের দিকে তাকিয়ে বলল, অনেক বন্ধু। তোমার বন্ধু নেই? বন্ধুদের নাম কি!

বকুল বলল, ওর বন্ধুরা কথা বলে না?

—খুব বলে। ওরা কথা বলে, হাসে, গায়। বিকালে এই সামনের বাগানে মেলা বসে যাবে।

ওরা হাসে, গায়, কথা বলে, তবে অঞ্জুদি বাংলা বোঝে না কেন? ওরা কি হাসে, কি গায়, কি কথা বলে? বাংলা বাদে পৃথিবীতে অন্য কথা আছে, বকুল বিশ্বাস করতে পারছিল না। বকুল বড় বিস্মিত হচ্ছিল। ওর চোখ বিস্ময়ে টলটল করছে।

বকুল বাবার পাশ থেকে সরে এসে সুদেবের পিছনে দাঁড়াল। সুদেব পিছনে হাত বাড়িয়ে বকুলকে অন্ধের মত ধরার চেষ্টা করতেই বকুল খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর কোন ভয় থাকল না। সে লাফিয়ে লাফিয়ে ফের ঘোরাফেরা করার জন্য চারিদিকে চোখ মেলে তাকাতেই সামনে বড় সিঁড়ির পাশে গোল বারান্দা, বারান্দার পাপে ছোট ছোট ব্যালকনি, নানারকমের ফুলের টব সাজানো দেখল।

অবিনাশ প্রায় কথা বলতে পারছিল না। সুদেবকে খুব দূরের মানুষ মনে হচ্ছে। খুবই অন্যমনস্ক সুদেব। কথা বলতে বলতে সহসা থেমে যাচ্ছে। সুতরাং পুরনো দিনের স্মৃতি যদি মন সহজ স্বাভাবিক করতে পারে ভেবে অবিনাশ বলল, রাঙাদা, স্কুল-জীবনের কথা তোমার মনে পড়ে না?

সুদেব বলল, কিছুই মনে করতে পারি না অবিনাশ। বলে সুদেব কোন শব্দ শোনার জন্য কান পেতে থাকল।

কুকুরটা ফের কোথা থেকে আর্তনাদ করছে। সুদেব এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, তুই বোস, আমি আসছি।

বকুল বাইরে। ঠিক তখন বারান্দা পার হয়ে রাঙা জ্যেঠু এদিকে আসছেন। পাশে কেউ নেই। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। ডাকল, রাঙা জ্যেঠু।

—আমাকে ডাকছিস, বকুল?

—আচ্ছা রাঙা জ্যেঠু—কি ভাবল কিছু সময় বকুল, আচ্ছা রাঙা জ্যেঠু, তুমি জান, বিদ্যাসাগর কলকাতায় পায়ে হেঁটে এসেছিলেন?

সুদেব অনেকক্ষণ কি মনে করার চেষ্টা করল।

বকুল বলল, তুমি কলকাতায় থাক, তুমি সব জান।

সুদেব যেন বলতে চাইল, আমি কিছুই জানি না বকুল; আমি শুধু আমদানি-রপ্তানি জানি।

বকুল নালিশ করল সুদেবকে, জান জ্যেঠু, বাবা আমাকে সেই পথটা দেখাবে বলে কলকাতায় এনেছিল। কিন্তু এখন বললে বাবা শুধু রাগ করেন।

সুদেব বলল. কোন্ পথটা।

বকুল চোখ-মুখ টান-টান করে বলল, বিদ্যাসাগর বাবার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন না, সেই পথটা। তুমি জান না?

—না।

—তোমরা সবাই সে পথটা ভুলে যাও। আশ্চর্য। বকুল সুদেবের সঙ্গে কথা বলায় আর কোন উৎসাহ পেল না। সে ফের মালীদের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহে নুয়ে পড়ল।

সুদেব ভিতরে ঢুকে দেখল, কুকুরটা শুয়ে আছে। সে ঘরটার ভিতর অন্য কেউ লুকিয়ে আছে কি না দেখল। না, অঞ্জু নেই। সে এই ঘরে এসে কুকুরটার পেছনে লাগেনি। সে ধীরে ধীরে কুকুরটার গায়ে দামী কম্বলটা টেনে যে ঘরে অবিনাশ বসেছিল, সেই ঘরে চলে গেল।

অবিনাশ বলল, তোমার মনটা ভাল নেই ?

সুদেব বলল, রুনার খুব অসুখ।

—রুনা !

—রুনা হচ্ছে তোর বউদির প্রিয় কুকুর।

—বাড়িতে তবে কুকুরের অসুখ।

—কুকুরের অসুখ। সুদেব কথাটা পুনরাবৃত্তি করল। কাল রাতে খুব বাড়াবাড়ি গেছে। তোর বউদি সারা রাত ঘুমোয়নি। সারা রাত কুকুরটার সেবা করেছে। সারা রাত কান্নাকাটি করেছে।

—কোন নার্স-টার্স ?

—তোর বউদির বিশ্বাস নেই ওদের ওপর।

অবিনাশ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। কুকুরের অসুখ, ভয়ংকর অসুখ। কথা নেই বার্তা নেই, সহসা মনের ভিতরে পা-কাটা মানুষটা তার বিজ্ঞাপন উপরে তুলে অবিনাশের চোখের সামনে নাচতে আরম্ভ করে দিল। অবিনাশ কেমন ভয় পেয়ে ডেকে উঠল, বকুল, বকুল, তুমি দুষ্টুমি করবে না।

বকুল চিৎকার করে বলল, আমি এখানে, বাবা। আমি দুষ্টুমি করছি না।

বকুল জবাব দেবার সময় দেখল, পা টিপে টিপে সেই মেয়েটি ওর পাশে হাজির। ওর চেয়ে অনেক লম্বা। বকুল ওর কাঁধে পড়ছিল। ভিতর দিকে কিসের যেন বাজনা তখন অদ্ভুত সুরেলা ঢং, কিছু ইংরেজী শব্দ। বকুল ধীরে ধীরে বলল, আমি দুষ্টুমি করছি না অঞ্জুদি।

সন্তর্পণে ঠোঁটে হাত রেখে বকুলকে সাবধান করে দিল অঞ্জু। চিৎকার করে কথা বলতে নেই। এবার অঞ্জু বকুলের হাত ধরে ভিতরে ঢুকে গেল। দুটো ঘর পার হয়ে বড় একটা জানালার সামনে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর দামী

আতরের গন্ধ। বিছানার উপরে এক কুকুর কম্বল গায়ে শুয়ে আছে। শীতকাল। উত্তাপের জন্য হোক, অথবা আলোর জন্য হোক, ঘরে নীল আলো। অঞ্জু হাত তুলে প্রথম কুকুর দেখাল বকুলকে। তারপর যেন বলতে চাইল, কথা বলবে না, বকুল।

কুকুরটা এবার বকুলের দিকে তাকাল। কুকুরটার চোখ ভয়ংকর লাল। বকুলের চোখে সেই ভয়। সেই হাত-পা কাটা লোকটাকে দেখে যেমন ভয় ধরেছিল। কুকুরটা জিভ বের করে নাকটা চাটছে। দুবার জিভটা ডান দিকে বাঁ দিকে ঘোরাল। ভয়টা বকুলের বাড়ছে। কুকুরটা গোঙাতে থাকল এবং সহসা শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছাতে উঠে দাঁড়াল। বকুল ছুটে গিয়ে অঞ্জুকে জড়িয়ে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা শুয়ে পড়ল এবং ধুঁকতে থাকল। হতাশায় কুকুরের মুখটা নীল হয়ে যাচ্ছে।

অঞ্জু কুকুরটাকে উদ্দেশ করে ধমকাল। কুকুরটা রাগে দুঃখে ফের গর গর করতে থাকল।

এবার বকুল দেখল, কুকুর এবং অঞ্জুদি উভয়ে ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পরস্পর দীর্ঘ দিনের রাগ বিদ্বেষ পুষে রাখলে যা হয়। যেন কোন চরম ঘটনা ঘটবে। অঞ্জু চিৎকার করে বলল, স্কাউণ্ড্রেল।

বকুল এখন পালাতে পারলে বাঁচে। সে অঞ্জুদির পিছনে দাঁড়িয়ে কুকুরের রাগ দেখছে। সে পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পারছে না। বকুল বুঝতে পারছে না—কোন্ দিকে ছুটলে অবিনাশের ঘরে যাওয়া যাওয়া যায়। ওর মনে হচ্ছিল, কুকুরটা এক্ষুনি অঞ্জুদির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। এতটুকু নড়ছে না অঞ্জুদির জিদ। ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ যেন ; এই কুকুর পরিবারের সব সুখ-শান্তি হরণ করে নিয়েছে। কুকুরটার লম্বা জিভ দেখে বকুল কেঁদে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার করে উঠল— প্রচণ্ড শব্দ। চিৎকারে গোটা বাড়িটা কাঁপছে। দেয়ালের সব অদৃশ্য দরজাগুলি খুলে গেল। অবিনাশ ছুটে এল সুদেবের সঙ্গে। অন্য দরজা দিয়ে সুদেবের স্ত্রী ছুটে এল। ওরা দেখল, কুকুরটা খাঁচায় পোরা সিংহের মত মুখ নীচের দিকে রেখে খাটের উপর অস্থিরভাবে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

সুদেব ভিতরে ঢুকেই দৃঢ় গলায় বলল, কী হচ্ছে অঞ্জু? তুমি আবার কুকুরটার পিছনে লেগেছ।

সুদেবের স্ত্রী এইসব অপরিচিত মানুষের সামনে খুব তীক্ষ্ণ হতে পারল না। খুব স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল, কালই তোমাকে হোষ্টেলে পাঠিয়ে দেব। তুমি এলেই ওর অসুখটা বাড়ে।

সুদেব এবং সুদেবের স্ত্রী টেনে টেনে এক ধরনের ইংরেজী বলছিল মেয়ের সঙ্গে, যা অবিনাশ পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। এই জগৎ বড় বেশি অপরিচিত মনে হচ্ছে। সুদেবকে চেনাই যাচ্ছিল না যেন। অথবা এই ভদ্রমহিলা—যিনি একদা ভট্টাচার্য বামুনের মেয়ে ছিলেন, যিনি সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে—যাঁর লক্ষ্মীর শ্রী ছিল সেই অমলা, অমলা বৌদি কেমন ট্যাস উচ্চারণে রপ্ত হয়েছেন। অবিনাশ নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করল।

সুদেব বলল, চিনতে পারছ ?

অমলা কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর কুকুরটার গলায় হাত দিয়ে বলল, ঠাকুরপো না ?

—যাক, বাঁচা গেল। ভুলে যান নি একেবারে।

অমলা কুকুরটা শান্ত করার কাজে ব্যস্ত ছিল। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারল না। কুকুরের গলায় হাত দিতেই সব শান্ত।

অমলা ফের বলল অঞ্জু, তুমি এই ঘরে এলে অনর্থ হবে।

সুদেব বলল, বুঝলি অবিনাশ, এই কুকুর নিয়ে ভীষণ অশান্তিতে আছি।

অমলা কটাক্ষ করল। সুদেব তাড়াতাড়ি অন্য কথায় এল। —এর নাম বকুল। অবিনাশের ছেলে।

অমলা ঠিক যেমন গলায় হাত রেখে কুকুরটাকে শান্ত করছিল, তেমনি বকুলের গলায় হাত দিয়ে বলল, বা, বেশ ছেলেটি ত, বেশ ছটফটে।

সুদেব বলল ঠিক মামাবাবুর মত দেখতে হয়েছে।

অবিনাশই কথাটা সামান্য সমর্থন করল—বাবার চেহারার সঙ্গে সামান্য মিল আছে।

এ বাড়িতে কুকুরের অসুখ। অমলাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। অমলা ডাক্তারকে এখন ফোন করছে—হ্যাঁ, এইমাত্র ও ফের চিৎকার করে উঠেছে। অমলা প্রায় টলতে টলতে রিসিভার রেখে অন্য ঘরে চলে গেল।

সুদেব বলল, ছেলেমানুষের কথা ধরতে আছে! বলে সুদেব অবিনাশকে নিয়ে মানে মানে এই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুদেব যেতে যেতে বলল, আমার অফিস-টফিস এখন লাটে উটেছে। ওরা কেউ কাকে সহ্য করতে পারে না।

বকুলের মনে হল, রাঙা জ্যেঠু বড় দুঃখী মানুষ। সে বলল, জ্যেঠু তোমাকে আমাদের পশ্চিমের মাঠ দেখাতে নিয়ে যাব। আমাদের ছোট্ট নদী আছে, নদীতে বালুচর আছে, তুঁতগাছের জঙ্গল আছে। নদীর দুপারে রেশমের গুটিপোকা, অশ্বত্থ।

অবিনাশ বকুলের বাচালতাটুকু সহ্য করতে পারছিল না। সে ফের ধমক দিল—তুমি এত বেশি কথা বলতে পার বকুল।

সুদেব বলল, না না বকুল ঠিকই বলেছে। বকুল যেন সুদেবের স্বপ্নের জগৎকে ফিরিয়ে আনছে। ঠিক সেই—পাখি সব করে রবের মত—মনে আসছে, মনে আসছে না। বড় মাঠ, বড় নদী, আম জাম গাছ, ফুল ফল পাখি—মনে আসছে না। ছোট উঠোন, ভাঙা তক্তপোশ, দুলে দুলে বাল্যশিক্ষা অধ্যয়ন—মনে আসছে, আসছে না। দামোদর নদী—ঝড়ের রাত—বিদ্যাসাগর মশাই মেদিনীপুরে ফিরছেন মায়ের চিঠি পেয়ে। সুদেব মনে করতে পারল, ওর সেই স্বপ্নের জগৎটা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নাম নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, আর এখন সেই জগতে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য।

সুদেব বলল, তারপর বকুল?

বকুল অবিনাশের দিকে তাকাল—তারপর কি আছে, বাবা?

অন্য ঘরে রেকর্ড প্লেয়ার বাজছে—দি হিলস আর অ্যালাইভ, উইথ দি সাউণ্ড অব মিউজিক।

অবিনাশ কিছু বলছে না বলে বকুল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর কি ভেবে বলল, আমার একটা ছোট লাইব্রেরী আছে। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ······

অবিনাশ বুঝল, বকুলকে যে ক'টি বই কিনে দিয়েছে তার প্রত্যেকটির নাম এক এক করে বলে যাবে। অবিনাশ কথাটা সংক্ষিপ্ত করে বলল, আমি ওকে একটা ছোট্ট লাইব্রেরী করে দিয়েছি।

সুদেব ফের কেমন স্মৃতির ভিতর ডুবে গেল। সুদেব চওড়া বারান্দা পার হয়ে খুব আলস্যভরে নিজের ঘরে ঢুকে সোফায় পা এগিয়ে দিল। অবিনাশ এবং বকুলের জন্য কিছু খাবার এসেছে। ওরা বসে তাই খাচ্ছিল। সুদেব কিছু খাচ্ছিল না, সে চুরুট টানছে। অন্য ঘরে রেকর্ড প্লেয়ার

বাজছে। সংসারে এক কুকুর সব সময় কোন না কোন অসুখ বাধিয়ে রাখে—সংসারে এই অসুখ নিরাময় হয় না…এত সম্পত্তি, এত টাকা, …কার টাকা, কিসের টাকা…সব চুরির টাকা, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে ঘুষ, ব্ল্যাক পারচেজ, ঘুষ দিয়ে আমদানি লাইসেন্স, লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফাতে বিক্রী। শুধু কাগজপত্রের রেকর্ড। সেই মাঠ, সেই দামোদর নদী সহসা জীবন থেকে হারিয়ে যায়; সুদেবের সেই গ্রাম্য ছবি মনে আসছিল—নদী-নালা-ভরা এক বাংলা দেশ সবুজ শ্যামলে ঘেরা ছোট্ট পল্লী, পায়ে হাঁটা পথ—অনেক দূরে দূরে মেলার দিনে যাত্রীদের জন্য জলসত্র।

এই বাড়িতে তখনও অন্য গান—রেনড্রপস্ অন রোজেস আণ্ড হুইসকারস অন কিটেনস্। অঞ্জু ওর ঘরে গান গাইছে, পায়ে তাল দিচ্ছে। অবিনাশ এবং বকুল বসে বসে খাবারগুলো শেষ করছিল। সুদেব চোখ বুজে আছে। ওর চরুটের আগুনটা নিবে আসছে।

খাবার শেষ হলে অবিনাশ বলল, তা হলে আসি আমরা। তোমাদের দেখে গেলাম। কতদিন দেখি না তোমাদের।

সুদেবের কেমন সব গোলমাল হয়ে গেছে। সে চোখ মেলে তাকাল। সামান্য এক গ্রামের ছেলে বকুল কেমন সব গোলমাল করে দিয়েছে।

অবিনাশ বলল কৃতী পুরুষদের কথা বলতে বলতে বকুলকে আমি প্রায়ই তোমার কথা বলি।

সুদেব কোন কথা বলছে না। সে কথা বলতে পারছিল না। কারণ ভাঙা রেকর্ডের মত এক গান—সাউণ্ড অব মিউজিক অথবা রেন ড্রপস্ অন রোজেস অথবা এই বকুল সারা জীবনের প্রাপ্তিকে অস্বীকার করে গেল। সুদেবের ইচ্ছা হচ্ছিল, বকুলের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে—কোথা সে মাঠ আছে, কোথায় সে পথ—কোন পথ যে পথের সন্ধানে ছেলেটা এসেছিল, সে পথটার খবর সে বকুলকে দিতে পারেনি। সুদেব কাতর স্বরে বলল, বকুল, তুই কলকাতা এলে আবার আসবি!

নীচে সিঁড়ির মুখে অঞ্জু দাঁড়িয়েছিল। সে ডাকল, এই বকুল।

বকুল বলল, তুমি না বাংলা বলতে পার না?

—চুপ, মা শুনতে পাবে।

অবিনাশ সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেছে। বকুল অঞ্জুকে একা পেয়ে বলল, ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় কোন্ পথে হেঁটে এসেছিলেন, জান?

—ঈশ্বরচন্দ্র! সে আবার কে?

—তুমি তাও জান না। সে ছুটে গিয়ে অবিনাশকে ধরে ফেলল এবং বলল, বাবা, স্কাউণ্ড্রেল মানে কি?

অবিনাশ বলল, বদমাশ। দরজা দিয়ে বের হবার মুখে অবিনাশ পেছন ফিরে ছেলের দিকে তাকাল—তুমি, বকুল, আজকাল সব বাজে কথা, বাজে :খবর মনে রাখ দেখছি। কাজের কথা তোমার আজকাল মনে থাকে না। তুমি নেমে আসার সময় কাউকে প্রণাম করনি।

তারপর পথ ওদের সামনে। ওরা আরও দু দিন এই কলকাতায় ছিল। বকুল ভিক্টোরিয়ায় গেছে, যাদুঘর দেখেছে আর এই ফুটপাথ, দেখছে বড় মাঠ—গড়ের মাঠ, মাঠে মনুমেণ্ট, নীচে আখ মাড়াইয়ের কল। জল তেষ্টা পেলে সে আবার রস খেত। কখনও ডাস্টবিনে মানুষের ছবি, ভুখা মিছিল আর আলোর ছবির কথা ভেবে সে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ত। সেই পথটা কোথায় গেছে, ভাবত। অবিনাশকে সে দুবার প্রশ্ন করলে অবিনাশ বলেছে, সে পথটা নেই, পথটা আমাদের হারিয়ে গেছে। তুমি বড় আজ কাল বিরক্ত কর বকুল। তোমাকে নিয়ে আমি আর কোথাও যাব না। বোধ হয় পথটা সম্পর্কে অবিনাশেরও এখন আর কোন ধারণা নেই।

বিকেলে অবিনাশ ছেলেকে হাওড়া স্টেশন দেখিয়ে ফিরছিল। বিরাট হাওড়ার পুল। শেষ নেই পুলের যেন। ট্রাম বাস যাচ্ছে, মানুষ যাচ্ছে। ছোট ছেলের দল যাচ্ছে। বকুল যাচ্ছে, অবিনাশের সঙ্গে। দূরে জাহাজ সিটি মারছিল, জাহাজ দেখার জন্য অবিনাশ সকলকে নিয়ে রেলিঙে ভর করে দাঁড়ল। নীচে গঙ্গা, গাধাবোট, বোটে মানুষগুলো পুতুলের মত এত ছোট যে, স্পষ্ট কিছু চেনা যাচ্ছিল না। বকুলের মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। সে একটু দূরে সরে এসে বলতে চাইল বাবা, আমার ভয় করছে। কিন্তু বলতে গিয়ে ভয়ে থেমে গেল। অবিনাশ কথায় কথায় রাগ করছে, বকুলকে আর ভালবাসছে না।

বকুল এবার মরিয়া হয়ে বলল, বাবা, আমি মার কাছে যাব।

—আমরা কাল যাচ্ছি, বকুল।

—আমার ভাল লাগছে না। অভিমানে বকুলের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল।

—আমরা আজকে চিড়িয়াখানায় যাব।

—আমার কিছু ভাল লাগছে না, বাবা।

অবিনাশ এবার সামনের একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখিয়ে বলল, দেখ ত কেমন হাঁটছে মেয়েটি। লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। এই বলে বকুলকে পুলের উপর দিয়ে হেঁটে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করছিল। কিন্তু বকুলের ভয়—সে এই পুল পার হতে পারবে না, মাথা ঘুরে নদীর জলে পড়ে যাবে। বাবা তাকে নানাভাবে উৎসাহিত করছে। কিন্তু সে কোন উৎসাহ পাচ্ছে না।

ছোট্ট হরিণশিশুর মত মেয়েটি দু পা গিয়েই একটা লাফ দিচ্ছে। সামনে লম্বা এক মানুষ। শীর্ণ এবং ক্লান্ত। খুব নিঃসঙ্গ। কোন কথা বলছে না। মেয়েটি নানারকমের কথা বলে মানুষটিকে বিরক্ত করছে। ছোট্ট মেয়েটি বলল, বাবা, চিড়িয়াখানায় বাঘ আছে?

লোকটি সামান্য নুয়ে বলল, আছে।

—বাবা, চিড়িয়াখানায় সিংহ আছে?

লোকটি আরও নুয়ে পড়ে বলল, আছে।

—বাবা, ভল্লুক..

লোকটি এবার এত নুয়ে পড়ছে যে, মনেই হয় না মানুষটা ফের সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে জীবনে। সে নুয়ে তার শিশু কন্যাটির মুখে কি যেন দেখল। তারপর আরও নুয়ে শরীর শক্ত করে ফেলে। দুহাতে মেয়েকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে হৃৎপিণ্ড থেকে সব রক্ত শুষে, সব ভালবাসা নিঙড়ে রেলিঙের ওপাশে নদীর জলে ফেলে দিল। ঘুরে ঘুরে মেয়েটি নদীর দিকে নেমে যাচ্ছে আর সেই চিৎকার: বাবা, দুষ্টামি আর করব না। খিদে পেলে কাঁদব না। মানুষের মিছিল তখন হাওড়ার পুলে, সব গাড়ী ঘোড়া থেমে গেছে, সব মানুষেরা ছুটে আসছিল। মানুষটা কী পাগল। হাসছে তা হাসছেই।

এই নিষ্ঠুর ঘটনা বকুলকে অবিনাশের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলল। যেন এই অবিনাশ এখন বকুলকে নদীতে ফেলে দিতে চায়, নদীতে ফেলে দেবার জন্য বকুলকে এই সেতুর ওপর তুলে এনেছে। বকুল ছুটতে থাকল। দ্রুত এই শহর থেকে পালাবার জন্য ছুটতে থাকল। প্রায় প্রতিযোগিতার মত দুজনে ছুটছে। হইহল্লা, মানুষের চিৎকার, ভিড়, ট্রাম বাসের জ্যাম সব ফেলে ছুটছে। বকুলের সঙ্গে অবিনাশ পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারছে না। বকুল প্রাণপণ ছুটছে। তার কোন দিকবিদিক জ্ঞান ছিল না।

কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মশাই এই পথে পিতার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন।

রাজা গোপালের আত্মচরিত

গোপাল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল। সুন্দর হলঘর। কাঁচের দেয়াল। সাদা প্লাষ্টিকের ছাদ, ছাদের নিচে সাদা রঙের আলোর স্টিক। মানুষগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে। সারি সারি তাঁত। কাপড়ে মিহি সুতোর ফুল তুলছে গোপাল। মানুষ-গুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে—সোনার মাকুতে রূপোর ববিন, মানুষগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে—শানার ওপাশে দু-সারি 'ব'; 'ব'-এর ভিতরে ফুলগুলি অথবা ফুলেরা নেচে নেচে যেন শানা অতিক্রম করে দপ্তির এপাশে এসে গেল, সব ফুল হয়ে গেল, মুক্তোর মত সেই ফুল কাপড়ের গায়ে গায়ে লেগে গেল। সোনার মাকু রুপোর ববিন নড়ছে, গড়াচ্ছে, আর মুক্তোর ফুল কাপড়ের গায়ে গায়ে ফুটে উঠছে। সেই ফুলের ভিতর গোপাল মুখ রেখে দেখল চেনা চেনা মানুষগুলো ওকে বাহবা দিচ্ছে—আহা গোপাল, তুমি গোপাল, নকৃশিপাড় শাড়ি বানালে, তুমি গোপাল ঘণ্টায় ঘণ্টায় কত নকৃশিপাড় শাড়ি বানালে, তুমি গোপাল উদয়াস্ত শ্রম করে নকৃশি কাঁথার মাঠের মত অথবা সুন্দর নীল আকাশের মত, কখনও নদীর মত, পাহাড় পর্বতে ছবি আঁকার মত শাড়ি বানালে···আহা গোপাল, তোমাকে আমরা রাজা বানাব।

বড় অন্ধকার, তীক্ষ্ণ শীত। মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকার। রাত গভীর মনে হচ্ছিল। এই পথে যদি কোনোদিন কেউ ফিরে গিয়ে থাকে, কোনো রাজা অথবা নবাব, কথিত আছে সিরাজদ্দৌলা এই পথে পলাশির প্রান্তর থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেছেন, আর কথিত আছে, রাজা রাজবল্লভ ভয়ে এই বনের আশেপাশে কোথাও কয়েক রাত কাটিয়ে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছিলেন, সেই বন এখন আর নেই, সেই পথও এখন আর একেবারে জনহীন নয়, পথ কাঁচা নয়, কংক্রিটের, বনের বদলে ছোট ছোট মাটির ঘর, শনের চাল, চালের নিচে গোপালের মত কত ছোট মানুষ রাজা হবার স্বপ্ন দেখছে।

এবং সেই গোপাল সহসা স্বপ্নে চিৎকার করে উঠল।

নীহারকণা, বৌ গোপালের পাশে শুয়ে থেকে প্রথম গোপালের চিৎকার শুনে

ভেবেছিল ঘরের কোথাও আগুন, সুতরাং নীহারকণা উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি কি খুঁজতে গিয়ে দেখল—চারিদিকে হিমের মত ঠাণ্ডা শীত, তীক্ষ্ণ হিমকণা ভাঙা দরজার ফাঁকে ভিতরে ঢুকছে। সে স্বামীর স্বপ্নের কথা ভেবে তাকে ডেকে তুলল, কোথাও আগুন নেই। দেখো, উঠে একবার দেখো কোথাও আগুন নেই। নীহারকণা এইসব বলে স্বামীকে সাহস দিতে চাইল।

গোপাল কেমন ঢোক গিলে বলল, বৌ আমি রাজা হতে চাইনা, লোকগুলো আমাকে রাজা করে দিতে চাইছে। বলে সে উঠে বসল, এবং চারিদিকে কি হাতড়ে খুঁজতে থাকল যেন অন্ধকারে।

নীহারকণা ফস্ করে আগুন জ্বালল। কুপিতে আলো জ্বালল। কুপির আলোতে গোপালের মুখ ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। যেন গোপাল ভূত দেখে ভয় পেয়েছে। সে ঠোঁট চাটছিল। মনে হচ্ছে গোপালের ভয়ংকর তেষ্টা। চোখের নিচে এই তীক্ষ্ণ শীতেও ঘাম, কপালে ঘাম। ঘাড় গলা ঘামে ভেজা। গোপাল বালিশের নিচে এখন হাত ঢুকিয়ে কি খুঁজছে। নীহারকণা, গোপালের বৌ নীহারকণা শুধু দেখছিল, ভয়ংকর অন্নাভাব গোপালকে কেমন ভীতু করে তুলেছে ক্রমশঃ। গোপাল, তল্লাটের গোপাল, পেশিবহুল গোপালকে এখন চেনাই যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গোপাল যেন প্রচণ্ড শীতের ভিতর সামান্য জল এবং চাদরের আশায় নীহারকণার দিকে তাকিয়ে আছে। জলে তার তেষ্টা মিটবে, চাদরে তার শীত নিবারণ হবে।

নীহারকণা কথাটা মনে করিয়ে দেবার মত বলল, তুমি স্বপ্ন দেখছিলে, তুমি আগুন আগুন বলে চিৎকার করে উঠেছিলে। দেখো কোথাও আগুন নেই।

গোপাল স্বপ্নের ভিতর ডুবে যেতে চাইল ফের। কি দেখছিল সে? আগুন, না অন্য কিছু! আর এখন মনে হচ্ছে সে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখেছে। ধীরাপদ-বাবুর মুখ দেখেছে, মালিক ধীরাপদবাবু। তার বড় প্লাইমাউথ গাড়িটা দেখেছে আর দেখেছে সেই বড় হলঘর, হলঘরে হাজার হাজার সোনার তাঁত, রুপোর ববিন, নানা রঙের আলো, নীল লাল হলুদ আলো কাঁচের শার্সিতে চিকমিক করছে। ওখানে কি হয়? কে যেন প্রশ্ন করেছিল। ওখানে কি হয়—কে যেন হেঁকে হেঁকে বলেছিল—ওখানে মানুষের জন্য লজ্জা নিবারণের বস্ত্র তৈরি হয়, মানুষের জন্য, যুবক-যুবতীর জন্য রহস্যের জাল তৈরী হয়—না সেটা জাল নয়, সেটা হাল্কা এক তসর গরদ অথবা অমূল্য আভরণ যার ভিতর যুবক-যুবতীরা ডুবে থাকে—গোপাল, সামান্য গোপাল সেই সব আভরণ তৈরির ভিতর রাজা

হবার স্বপ্ন দেখত। তার নিখুঁত হাত কাপড়ে মুক্তোর মত নক্ষত্র বসিয়ে দিন-মান পরিশ্রমের পর সোজা ঘরে না ফিরে সেই ইউনিয়ন অফিসে বসে বড় বড় ইস্তাহার লিখত—শ্রমিকের এক আন্দোলন, বেঁচে থাকার আন্দোলন।

গোপাল বসে বসে ঠোঁট চাটল। সাহসভরে সে বৌকে পর্যন্ত বলতে পারল না, দে একটু জল দে, তেষ্টা নিবারণ করি ; দে, শীতের কাঁথা দে, গায়ে দিয়ে বসে থাকি। সে শুধু কান পেতে কি শোনার জন্য বসে থাকল। বোধহয় ওর মনের ভিতরে সেই স্বপ্নের সত্য বড় বেশি গেঁথে আছে, স্বপ্নটাকে সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না। স্বপ্ন একেবারে মিথ্যা হয় না, সুতরাং মনে মনে গোপাল মিলের সিটি শোনার জন্য আর একবার কান পাতল। কত আর দূর মিলের চিমনি, রাতে এই শব্দ হলে, মিলের ভোঁ বাজলে—বিশ্বচরাচর কেঁপে ওঠে, কলিজার ভিতর দ্রুত রক্তসঞ্চালন হয়—গোপাল তখন বসে থাকতে পারে না, সে হাতে লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকার পথে বের হয়ে পড়ে। সামনে সব গাছ, বড় বড় শিরীষের গাছ, পাতার অন্ধকারে তখন কোনো পাখির ডাক অথবা দূরে দূরে হুইস্‌ল, বোধহয় কলকাতাগামী এক ট্রেন আসে যে কেবল আসে আর যায়, গোপাল নিজেকে সেই ট্রেনের মত আসা-যাওয়ার সামিল ভেবে অন্ধকারের ভিতর হেসে উঠত। বৌ নীহারকণা, দুই শিশুসন্তানের মুখ বড় করুণ—সে আর পারছে না, কারণ মিলের সিটি আর বাজছে না। সে অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও মিলের সিটি বাজতে শুনল না।

নীহারকণা বলল, তুমি শুয়ে পড়। রাত পোহাতে দেরি আছে।

গোপাল বলল, আমাকে জল দে বৌ। আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।

—এই শীতে জল খাবে ?

—আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে বৌ। গোপাল নিজের বৌয়ের মুখ দেখল। পাশে দুই শিশুসন্তান, গায়ে জামা নেই। উলঙ্গ ওরা। ছেঁড়া কাঁথার নিচে পা-দুটো কুঁকড়ে শুয়ে আছে। গোপাল বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। সে তার শিশুসন্তানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ওরা সারাদিন অভুক্ত ছিল। রাতে সামান্য রুটি, শুকনো রুটি খেয়ে শুয়ে আছে। দীর্ঘদিন মিল বন্ধ বলে যা কিছু সামান্য পেতল কাঁসা ছিল ঘরে সব গেছে। গোপালের কিছু আর নেই। ছোট এই ঘর, টালির চাল, বেড়া পাটকাঠির, আর জীব বলতে গোপালের এক কুকুর আছে, এই কুকুর গোপালকে মিলে পৌঁছে দেয়, মিল থেকে নিয়ে আসে। গোপালের সেই বিশ্বস্ত কুকুর পর্যন্ত দু-তিন দিন থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে

বেড়াচ্ছে। রাতে আর বাড়ি পাহারা দিচ্ছে না। সুতরাং গোপাল, নিঃস্ব গোপাল বড় সহায়সম্বলহীন। অভাব গোপালকে বড় বেশি ভীতু করে তুলেছে।

গোপাল ঢক্-ঢক্ করে জলটা খেয়ে ফেলল। সে জলের গ্লাসটা নিচে রেখে বলল, দেখ ত কুকুরটা বারান্দায় আছে কি না?

নীহারকণা বলল, তোমার কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি তুই দেখনা বারান্দায় কুকুটা আছে কিনা দেখ। বলে সে কাঁথার নিচে ঢুকে দুই শিশুসন্তানকে বুকের কাছে টেনে আনল। শুকনো শরীর গোপালের, দুই শিশুসন্তানের শরীরে এখনও সামান্য মাংস লেগে আছে, সুতরাং উত্তাপের জন্য হোক অথবা ভয়ের জন্য হোক এবং এও হতে পারে মন্বন্তরের এক করাল ছবি এই ছোট ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই মন্বন্তর থেকে দুই শিশুকে রক্ষা করার জন্য সে বুকের উপর রেখে দিল তাদের। তথাপি গোপালের ভয় গেল না, গোপাল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, শরীর থেকে শীত নামছে না, শীতে হি হি করে কাঁপছে। স্বপ্নটা দেখার পর বার বার মনে হয়েছে কারা যেন ওকে, ওর নীহারকণাকে হত্যা করার জন্য ছুটে আসছে। বস্তুত গোপালের চোখে এক মন্বন্তরের ছবি বার বার ভেসে উঠেছিল। সে ভয়ে দুই সন্তানকে বুকে আঁকড়ে চোখ বুজে ফেলল।

চোখ বুজতেই মনে হল যারা তাকে রাজা বানাতে এসেছিল, যারা গোপালের গৌরবে কোলাহল করছিল, জয় কি, অথবা গোপাল জিন্দাবাদ করছিল তারা গোপালের জন্য এবং নিজেদের জন্য বড় এক আগুনের কুণ্ড করে বসে আছে। সেখানে প্রথম গোপাল নিক্ষিপ্ত হবে, পরে ওরা নিজেরা। গোপাল স্বপ্নের ছবিটা এখন যেন হুবহু মনে করতে পারছে। দীর্ঘদিনের মালিক-শ্রমিক বিরোধ ওদের একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। গোপালের জন্য অথবা এই সব মানুষেরা যারা সুতোর জালে নক্ষত্র বানায় তাদের জন্য কিছুই রইল না। কারণ ধীরাপদ মানুষটি অসৎ, লোভী এবং অর্থ তাকে অমানুষ করে ফেলেছে। ধীরাপদ এই সব নিঃস্ব মানুষের কথা ভাবল না, সে রাজার মত রুমাল উড়িয়ে ঘোড়ায় চেপে অথবা কলকাতাগামী এক ট্রেন আছে যার নিচে উপরে ধীরাপদ, লোভী ধীরাপদ ইচ্ছা করলে গোটা মিল তুলে নিয়ে ট্রেনের নিচে উপরে বেঁধে হাওয়ায় ভেসে চলে যেতে পারে—তার কাছে সামান্য গোপাল আর গোপালের কুকুর! হায় ধীরাপদ সেই যে কলকাতা গিয়ে বসে থাকল আর ফিরল না।

নীহারকণা কুপিটা নিয়ে বাইরে গিয়েছিল। বারান্দায় কিছু খড়কুটো, একটা ভাঙা পিঁড়ি এবং গোপালের পায়ের খড়ম। কুকুরটা কোথাও নেই। শীতে নীহারকণা হি হি করে কাঁপছিল, তবু সে এই নিশীথে কুকুরের নাম ধরে ডাকল, শশী, শ···শী!

শীতের রাত বলে কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে সব। সব কেমন হিমকাতর হয়ে আছে। এসময়ে কোনো শকুন ডেকে উঠলেও নীহারকণা যেন মনে বল পেত। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বলল শশী নেই। কোথায় রাতে চলে গেছে।

অন্যদিন হলে গোপাল রাতেই খোঁজাখুঁজি করতে বের হয়ে পড়ত। শশী কোথায় গেল। কোথায় যায়! শশীর ছানা হবে, এত বড় উদর নিয়ে এই শীতে শশী কোথায় যায়! সে শুয়ে থেকেই ডাকল—শশী···শশী। তারপর ডাকল—আ···তু, আ···তু···তু।

শশী কোথা থেকে এবার যেন কুঁই কুঁই করতে থাকলে নীহারকণাকে উদ্দেশ্য করে গোপাল বললে, দেখ ত ছাগলের ঘরটাতে আছে কি না?

একটা ঘর, পাশেই ছোট ঘরটা। তালপাতার চাল, বাঁশের চারটে ছোট ছোট খুঁটি, দুটো চারটে ছাগল পুষত নীহারকণা, অভাবে অনটনে ছাগলগুলো সব বিক্রী করে দিয়েছে নীহারকণা। শুধু খালি ঘর এখন, কিছু শুকনো বনজ ঘাস এবং আগুন জ্বালাবার জন্য ঝোপ জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা কিছু কাঠ।

নীহারকণা কুপি নিয়ে ঘরটাতে ঢুকে দেখল শুকনো ঘাসের ভিতর শশী দুটো বাচ্চা দিয়েছে। শীতে কুণ্ডলী-পাকানো শরীর। স্তনের ভেতরে দুই ছানাপোনা গুঁড়ি মেরে শুয়ে আছে। নীহারকণার এত অভাব, এত অনটন, হা-অন্নের সংসার, তবু এই শশীর জন্য সামান্য আবেগ বোধ করছিল। সে তাড়াতাড়ি ছেঁড়া পাটের থলে দিয়ে শশীকে ঢেকে দিয়ে বলল, হ্যাঁগা শুনছো, শশী দুটো বাচ্চা দিয়েছে।

গোপাল ছেঁড়া কাঁথা মাথায় মুখে দিয়ে শুয়েছিল বলে নীহারকণার কথা স্পষ্ট শুনতে পায় নি। ভীতু কাপুরুষের মত সে কেবল নীহারকণাকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে চাইছে। এই অন্ধকার রাত, কোথাও কোনো পাখি ডাকছে না ঝোপ-জঙ্গলে সব কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মৃতবৎ পড়ে আছে—তখন নীহারকণা, যুবতী নীহারকণা, বয়স আর কত নীহারকণার, ষোল বছরে ঘর করতে এসেছে, এখন ছব্বিশ বছর, নীরোগ নীহারকণা অন্নের অভাবে শুকনো কাঠ হয়ে গেছে। কোনো ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু দুটো অন্নসংস্থানের জন্য হাঁ করে বসে থাকে—

কখন গোপাল এসে বলবে দু-পাঁচ টাকা সংগ্রহ হয়েছে—সামান্য চালডাল তেলনুন, আর কি বা প্রাপ্য জীবনে! সেই তুচ্ছ প্রাপ্যই ওর কাছে অসামান্য ছিল। শুধু একটু আশ্রয়, দু-বেলা আহার আর কিঞ্চিৎ ভূষণ। গোপাল সেই অসামান্য বস্তুর জন্য ধীরাপদ নামক এক ব্যক্তির কাছে নিজেকে গচ্ছিত রেখেছিল। গোপাল, গোপালের মত হাজার মানুষ দুষ্ট নিশাচর প্রাণীর মত অপরের অন্নে লোভী সেই ধীরাপদ নামক ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রেখে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছে। কত শীতগ্রীষ্ম কেটে গেল, তবু ধীরাপদ ওদের জন্য কোনো আবেগ বোধ করল না। বলির পাঁঠার মত এই সব মানুষেরা রক্ত দিয়ে ধীরাপদকে গাড়ি বাড়ি এবং মহল্লার পর মহল্লা বসিয়ে দিয়েছে। ধীরাপদ নামক বস্তুটির ভিতরে শুধু রক্তমাংস, মাংসের অপব্যয়—কিছু মদ মেয়ে আর মা কালীর থানে নরকের সংসার, অথবা যেন বলার ইচ্ছা—তোমরা আর কে? তোমরা নিমিত্ত মাত্র। সবই ভোগের নিমিত্ত মাত্র। তোমরা হাজার মানুষ আমার ভোগের নিমিত্ত—পেলে শুধু ধরে ধরে খাই।

নীহারকণার কথা গোপাল স্পষ্ট শুনতে পায়নি। সে এখন কেবল শুনতে পাচ্ছে—ওর চারধারে কারা যেন হল্লা করছে—পেলে শুধু ধরে ধরে খাই। সুতরাং গোপালের ভয়ে আর ঘুম কিছুতেই এল না। নীহারকণা পাশে শুয়ে শশীর দুই বাচ্চা সম্পর্কে রসিকতা করে গোপালকে উত্তেজিত করতে চাইল। এত অভাবের ভিতরও ভালোবাসার জন্য নীহারকণা গোপালকে কাছে টেনে নিল এবং শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পায়ের ভেতরে পা রেখে—হায় গোপাল, তুমি গোপাল, তুমি আমার অন্তরের গোপাল—নীহারকণা বাঁ পা-টা গোপালের কোমরের কাছটায় তুলে ঘষতে থাকল। গোপাল চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ওর কানে কেবল এক শব্দ, পেলে শুধু ধরে ধরে খাই। কারা যেন অন্ধকার রাতে নিশাচর প্রাণীর মত হল্লা করছে আর বলছে—পেলে শুধু ধরে ধরে খাই। কি পেলে ধরে খাই? গোপালকে পেলে ধরে ধরে খাই। নীহার-কণাকে পেলে ধরে ধরে খাই। নীহারকণা গোপালকে পেলে ধরে ধরে খায়। গোপাল ছাগল পেলে ধরে ধরে খায়। ধীরাপদ গোপালের মত মানুষ পেলে ধরে ধরে খায়।

ভোরবেলা গোপাল উঠে দেখল পেছনের বেড়াটা ইস্তাহারে-ইস্তাহারে ছেয়ে গেছে। সব নির্বাচনী ইস্তাহার। লেখা, ভোট দেবেন কিসে—কাস্তে ধানের শীষে! নাম, জয়গোবিন্দ দাস। জয়গোবিন্দ দাসকে ভোট দিন। তারপর-

লেখা, জমি তার লাঙল যার—অন্য এক প্রার্থী, তিনি কংগ্রেস মনোনীত, সংযুক্ত ডান সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী। তারপরই বড় বড় হরফে লেখা—ভোট পাবে কারা, কাস্তে হাতুড়ি তারা। পরে দুটো ষাঁড়ের ছবি। একেবারে তেড়ে আসার মত ভাব। নিচে ভোটপ্রার্থীর নাম। চালের ব্যবসায়ে এখন অঞ্চলের বড় মহাজন। সেই মানুষটার নামও গোপাল জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়ল।

সকালবেলা। রোদ উঠে যাবে এবার। তবু গোপাল কিছু শুকনো লতা পাতা সংগ্রহ করে আগুন জ্বালল শরীর গরম করার জন্য। রাতে ভাল ঘুম হয় নি, নানারকমের দুঃস্বপ্ন ওকে সারারাত ক্লিষ্ট করেছে। এখন এই সকালের রোদ, লতাপাতার উত্তাপ কেমন সজীব করে তুলল গোপালকে। রাতের ক্লিষ্ট চেহারা সে প্রায় জোর করে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় আছে। সে নীহারকণাকে ডাকল, ঠাণ্ডায় জল ঘেঁটে কাজ নেই। ববং এই আগুনের পাশে বসে উত্তাপ নাও, শরীর সজীব কর—আমাদের আর কি আছে! কোনো সঞ্চয় নেই, জমি নেই, ফসল তোলার আনন্দ নেই। আছে শুধু দুঃখ কষ্ট এবং শীতের ভিতর জমে যাওয়া। এইসব কথা শুনে গোপালের দুই মেয়ে কমলা এবং মালিনী ছেঁড়া ফ্রক গায়ে—প্রায় পিঠের সবটাই ফাঁকা এবং নাকে সর্দি জমে আছে, হি হি করে শীতের ভিতর কাঁপতে কাঁপতে আগুনের পাশে বসে গেল।

গোপাল ফের পোস্টারগুলো দেখছিল। মালিনী কমলা বাপের মুখ দেখছিল। আর নীহারকণা ওদের এই সকালে কি খেতে দেবে ভাবছিল। কাল সারাদিন গোপাল অভুক্ত এবং নীহারকণা একঘটি টিউবওয়েলের জল খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। একপো-র মত আটা ছিল—ঐ দিয়ে রুটি ছয়খান—তিনটি মালিনী এবং তিনটি কমলা। গোপাল মেয়েদের থেকে একটু ছিঁড়ে নিয়ে প্রায় আমসত্ব মুখে দিয়ে স্বাদ দেখার মত করে থেকেছে দিনমান। সুতরাং গোপাল যতই তাজা হবার চেষ্টা করুক, যতই আগুনের উত্তাপ নিয়ে শরীর গরম করার চেষ্টা করুক সেই হাঁ-করা মুখ কিছুতেই বন্ধ হল না। ওর ক্লিষ্ট চেহারা কিছুতেই শরীর থেকে মুছে গেল না।

গোপালের মুখে কেবল থুথু উঠছে। মুখে অনাহারজনিত দুর্গন্ধ। ভিতর থেকে সে বড় অসহায় বোধ করছে। নীহারকণার চোখ বসে যাচ্ছে ভেতরে কমলা এবং মালিনী এই শীতে কোনো চাদর গায়ে দেয় নি। পরনের প্যাণ্ট ছিঁড়ে গেছে। সেই কবে একবার মিল দুমাসের জন্য খুলে ধীরাপদ সকলের

বিল আংশিক মিটিয়েছিল, কবে একবার গোপাল শহরের দোকানে গিয়ে দুটো প্যাণ্ট কিনেছিল, এখন আর সে তা মনেও করতে পারে না। মালিকের সঙ্গে সংগ্রাম বলতে ওদের সামান্য দাবী—মিল চালিয়ে যেতে হবে, অন্যায়-ভাবে যে শ্রমিকদের চার্জশিট দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দীর্ঘদিনের এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আদায়কৃত টাকা জমা দেবার ব্যবস্থা অথবা এও হতে পারে। এই সব দাবীদাওয়া না থাকলেও ধীরাপদ এই মিল বন্ধ করে দিত, কারণ ওর যেন জানা ছিল সাধারণ টাকা থেকে নিজের নামে টাকা করতে গেলে কোম্পানিকে নানাভাবে লোকসান দিতে হয়। তখন মিল আর চলে না। চাকা বন্ধ হয়ে যায়। ধীরাপদ, অসৎ মানুষ ধীরাপদ সেই কবে মিল বন্ধ করে চলে গেল আর এল না।

হা-অন্নের জন্য গোপালের চোখ শুকিয়ে হাসছিল। বুকে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এখন কি করণীয় সে ভেবে উঠতে পারছে না। ইউনিয়ন অফিস খুললে দু এক কাপ চা পাবে গোপাল, পাণ্ডা গোপালের জন্য ইউনিয়ন থেকে এইটুকু বরাদ্দ। সুতরাং সে ছেঁড়া জামা গায়ে ঝুলিয়ে পথে বের হতে চাইল।

নীহারকণা বলল, দু ঘটি খেজুরের রস আছে। বিক্রি করলে পয়সা হত। সামান্য খেজুরের রস ঢক্-ঢক্ করে সবটুকু গোপাল খেয়ে নিতে পারত। কিন্তু এই দিয়ে নীহারকণার কিছু পয়সা, এবং এই দিয়ে মালিনী কমলার কিঞ্চিৎ আহার। নীহারকণা কিছু কাঁচা পেঁপে সংগ্রহ করেছে, বোধ হয় চেয়ে এনেছে, বোধ হয় পার্শ্ববর্তী কেউ ওরা দিনের পর দিন উপোস দিচ্ছে শুনে দয়া দেখিয়েছে। গোপাল জানত ইউনিয়ন অফিস থেকে ফিরে এলে এই পেঁপে সিদ্ধ ওর থালায় সাজিয়ে দেবে নীহারকণা। একটু নুন দেবে। এক গ্লাস জল রাখবে —কিছু বলবে না তখন, স্বামীর ক্ষুধার্ত মুখ দেখে শুধু চোখের জল ফেলবে।

গোপাল আর দাঁড়াল না। দেরী হলেই বুঝি ঢক্-ঢক্ করে সব রসটা খেয়ে ফেলবে। হন হন করে সে বের হয়ে গেল। যাবার মুখে সে তিনটি পোস্টারই দেয়াল থেকে তুলে ফেলল। আগুনের মধ্যে পোস্টার ফেলে দিয়ে শেষবারের মত উত্তাপ নিল শরীরে।

একসময় এখানে বড় এক আমবাগান ছিল। নবাবী আমলের সেই সব শহিদুল্লা অথবা রানীপছন্দ আমের গাছ সব নিশ্চিহ্ন। পরিবর্তে ছোট বড় কুঁড়ে ঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাট এবং গঞ্জের মত জায়গাটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। ঠিক তারপরে মাঠ, মাঠের ধারে ধারে রেল লাইন এবং কালীবাড়ি

পার হলে রাজামহারাজাদের জন্যে ছোট্ট স্থানীয় স্টেশন। তার পাশে বড় এই মিল, গোপালের মিল, প্রাণের চেয়েও বড় এই মিলে গোপাল তাঁত বুনে খেত। মিলের এক নম্বর তাঁতি গোপাল, শক্ত গোপালকে এখন চেনাই যাচ্ছে না। চোখ কোটরাগত, কিছু দেখতে পাচ্ছে না যেন গোপাল, ওর চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে আসছে। ওর চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল, তোমরা সূর্য বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াও, কার এই সাহস!

ইউনিয়ন অফিসে ঢুকে দেখল ইতস্তত কিছু শ্রমিক চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে ক্রমশ সভ্য সংখ্যার হাজিরা কমে আসছে, গোপালকে দেখে সকলেই একটু নড়ে চড়ে বসল। গোপাল ওদের কিছু খবর দেবে। গোপাল কলকাতার খবর দেবে। কলকাতাগামী এক ট্রেন আছে তার খবর দেবে। সুতরাং সকলেই প্রায় উন্মুখ। গোপাল অন্যান্য দিনের মত শক্ত হয়ে টেবিলের পাশে আজ আর দাঁড়াতে পারল না। পেটের নিচে ধীরাপদর কামড় শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে গোপাল ওদের পাশে প্রায় সমানভাবে বসে গেল। চারিদিকে নৈরাশ্য, সভ্যসংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। সভ্য সংখ্যার গড়হাজিরা গোপালকে বড় ক্লিষ্ট করছে। কিছু খবর পেল গোপাল, একদল কর্মী কলকাতার আশে-পাশে কাজের খোঁজে বের হয়ে গেছে। কিছু কর্মী ভাজাভুজি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে, কারণ ধীরাপদর শক্ত কামড় ওদের প্রায় উন্মাদ করে তুলছে। গোপাল এইসব অভুক্ত মানুষগুলোকে আর আশার আলো দেখাতে পারছে না যেন। শুধু বলল, বুঝলে আমি রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম।

স্বপ্নের কথা কেউ শুনতে চাইল না। সকলে কি গুন গুন ফিস ফিস করে কথা বলতে থাকল।

—বুঝলে হে, কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম।

কে কার কথা শোনে। গোপাল চোখে ফের ঝাপসা দেখছে। সূর্যকে কে বগলদাবা করে নিয়ে যায়? গোপাল ফের চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু কেউ গোপালের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

গোপাল প্রায় মরিয়া হয়ে স্বপ্নের কথাটা জানানোর জন্যে উঠে দাঁড়াল। ইউনিয়ন অফিসে সে অন্যান্য দিন যেমন গরম গরম কথা বলে, টেবিল চাপড়ায় এবং মিল মালিকের জুলুমের খবর দিয়ে সকলকে উত্তেজিত করে তোলে তেমনি আজ স্বপ্নের কথা বলে সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে দেখল, সকলেই প্রায় অফিস থেকে নেমে যাচ্ছে।

সে চিৎকার করে উঠল, কারা যেন আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারছে।

যারা নেমে যাচ্ছিল তারা থামল। তারা গোপালের দিকে পেছন ফিরে তাকাল।

—বিরাট হলঘর। সোনার তাঁত। রুপোর ববিন। আমরা কত যত্ন করে সোনার সুতোয় মুক্তোর নক্ষত্র আঁকছি।

ওরা যেন কি শুনতে পাবে এখন। গোপালের চোখেমুখে আশার ছলনা বিদ্যুতের মত ঝলক দিচ্ছে। সে একটু জল চাইল। জল দিলে জল খেল, তারপর শক্ত মানুষের মত টেবিল চাপড়ে কথা বলার চেষ্টা করল—আমরা কি হেরে গেলাম! আমরা কি ফের সোনার সুতোর পাহাড় পর্বতের ছবি আঁকতে পারি না!

ওরা বুঝল, এবার গোপাল কিছু বলবে। গোপাল সব সময়ই সব কথা নাটক দিয়ে আরম্ভ করে।

—আমরা পাহাড় পর্বতের ছবি আঁকতে পারি, আমরা নক্ষত্র বানাতে পারি।

—আমরা ইচ্ছা করলে রাজার এক রাজ্য বানাতে পারি। গোপাল ওদের কথায় সায় দিল। কিন্তু আমরা বেইমানি করতে পারি না।

—না। ওরা একসঙ্গে হেঁকে উঠল।

গোপাল কে কে বেইমানি করেছে তার একটা লিস্ট দিল। কে কে দালালী করেছে তাদের একটা হিসাব দিল। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পেটে অন্ন নেই। অন্ন ধীরাপদ গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে। গোপাল প্রায় চোখেমুখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। চারিদিকে কেমন সব অন্ধকার নেমে আসছে। অস্পষ্ট সব মুখের ছবি ভেসে উঠছে। সকলের মুখ ওর চোখের উপর মাকড়সার জালের মত হয়ে যাচ্ছে। তখন ঘরের ভিতর শীতের রোদ। যারা চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল তারা দেখল গোপাল টেবিলের উপর কি হাতড়াচ্ছে। টেবিল, দেয়াল এবং চারপাশটায় সে উন্মাদের মত কি সব স্পর্শ করার চেষ্টায় ছুটে যাবার প্রলোভনে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই সকলেই ধরে ফেলল ওকে। অন্নের অভাব হলে মানুষের চোখ অন্ধকার দেখে—গোপাল অন্ধকার দেখছে। সে সকল কিছু এবার হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকল—কে? তোমরা কে বাছা?

—আমি নির্মল।

—আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন নির্মল। সব সহসা বড় অন্ধকার

হয়ে গেল। দিনের বেলাতে সূর্য কে চুরি করে নির্মল ? গোপাল চারিদিকে অন্ধকার দেখতে থাকল। ইউনিয়নের পাণ্ডা গোপাল পাছে অন্য কোনো কাজে হাত দিলে বেইমানি হয়—পাছে লোকে অবিশ্বাস করে, অথবা গোপালের মত মানুষ হয় না, এমন মানুষ তল্লাটে নেই—নির্দোষ, আপন-পর ভেদাভেদশূন্য মানুষ এবং যে মানুষ সকলের জন্য রক্তের নিশান পিঠে বেঁধে রেখেছে সেই মানুষ হা-অন্নের জন্য অন্ধকার দেখতে থাকল। হাত পা শীতল হয়ে আসছে গোপালের, শিথিল হয়ে আসছে। প্রচণ্ড অন্নাভাব, তীক্ষ্ণ শীত এবং চারপাশে মন্বন্তরের ছবি গোপালকে, গোপালের প্রাণকে আর উষ্ণ রাখতে পারে নি। গোপাল, সামান্য গোপাল, যে একদা পাখিয়ালা গোপাল ছিল, মাঠে ময়দানে কখনো পুরানো মাঠ, ভাঙা মঠের মাথা থেকে টিয়াপাখি, বনের ভিতর থেকে ময়না ধরে শহরে গঞ্জে বিক্রি করে আসত—সেই গোপাল কৈশোরের গোপাল দু-হাত উপরে তুলে বলল, নির্মল আমি আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না কেন রে ? তোরা কি শালা উত্তাপের জন্যে সূর্য পকেটে পুরে রেখেছিস, বেইমানি করার জায়গা তোমরা আর পেলে না !

নির্মল বলল, আমরা বেইমানি করি নি দাদা।

—শালা তোমরা সূর্য আকাশে রেখেছ বলছ !

—হ্যাঁ। সূর্য আমরা আকাশে রেখেছি।

—তবে মিল চলবে না কেন ? মিল আমরা চালাব। মিল কি ধীরাপদ চালায়।

—না।

—তবে বসে আছিস কেন ? সকলকে ডাক। চাকাটা ঘুরিয়ে দি। আবার মিলের বাঁশি বেজে উঠুক। আবার গল গল করে চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হোক। আমরা আবার ছুটতে ছুটতে আসি।

গোপাল কিছু দেখতে পাচ্ছে না। নির্মল এবং অন্যান্য সকলে বুঝতে পেরে গোপালকে ধরে এনে বসাল। গোপাল অনেকদিন থেকেই চোখে কম দেখছে। কারণ গোপালের চোখ সূক্ষ্ম কাজে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছিল। আর দীর্ঘদিনের অন্নের অভাব। অভাব গোপালকে এবার পুরোপুরি অন্ধকারের ভিতর ঠেলে দিল। আর ওর মনে হল সামনেই কোন এক মাঠ আছে, মাঠে ধীরাপদ সূর্য বগলে নিয়ে ছুটছে। সকলের আলো চুরি করে চলে যাচ্ছে ধীরাপদ, পেছনে হাজার হাজার মানুষ গোপালের মত। ওরা ধীরাপদকে ধরার জন্য

ছুটছে। কিন্তু চতুর ধীরাপদ হা হা করে হাসছিল আর ছুটছিল। পেছনের মানুষগুলো হা হা করে কাঁদছিল আর ছুটছিল। গোপাল অন্য সময় হলে বুঝি বলত, কারণ গোপাল সব সময় নাটক দিয়ে কথা আরম্ভ করে, বলত, ছোটো ছোটো। যতক্ষণ সূর্যকে কেড়ে নিতে না পারছ ততক্ষণ ছোটো। পাহাড় পর্বত অথবা সমুদ্রে চলে যাও। সূর্যকে তোমাদের নিয়ে আসতেই হবে। কোন মানুষকেই আর আমরা সূর্য বগলে নিয়ে চলে যেতে দেব না। কিন্তু বলতে পারল না। কেবল দেখতে পেল…সুন্দর হলঘর, কাচের দেয়াল। সাদা প্লাষ্টিকের ছাদ। ছাদের নিচে সাদা রঙের আলোর ষ্টিক। সোনার মাকুতে রুপোর ববিন। কাপড়ের জমিনে সব সাদা রঙের মুক্তোর নক্ষত্র ফুটে আছে। গোপাল খুঁটে খুঁটে নক্ষত্রগুলো তুলে নিতে চাইল। টেবিলের উপর ওর নখ বসে যাচ্ছে। সে তার নক্ষত্র, জীবনের মূল্যবান নক্ষত্র আর কোথাও ফেলে যাবে না—কিন্তু হায় গোপাল, সামান্য গোপাল টেবিলটা আঁচড়ে কামড়ে ভেঙে দিতে চাইল, কিন্তু তাও পারল না। সে আর্তনাদ করে এবার ভেঙে পড়ল—আমার সূর্য দেখ ধীরাপদ চুরি করে নিয়ে যায়। কে বিলাপ করতে থাকল।

আমাদের এ-ভাবে ঘরোয়া পরিবেশে প্রথম দেখা হয়েছিল। শীতের রাত। বাইরের জ্যোৎস্না ছিল। কামিনী ফুলের গাছটাতে বোধ হয় কিছু ফুল, ফুলের সৌরভ। আমি আর ও গাছের নিচে সামান্য দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। জাফরিকাটা জ্যোৎস্না ওর লতাপাতা আঁকা শাড়িতে ছড়িয়ে আছে। বললাম, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন!

ও আমাকে কি বলবে বলে যেন খুব ইতস্তত করছিল। কিছুক্ষণ আগে ও গান গেয়েছিল পরিচয় সভাতে, সে এখন কিনা এ-গাছের নিচে এবং আমাকে কিছু বলবে বলে ডেকে পাঠিয়েছে।

ও বলল, পরিচয় সভাতে আপনার গল্পটা বেশ ভাল লেগেছে। আপনি জাহাজে ছিলেন! সে আমাকে কিছু বলার অবসর পর্যন্ত দিল না। ফের সে বলে চলল, যে শহরের ওপর গল্পটা বলে, শেষে শহরের নাম বললেন, সেটা কিন্তু মেলবোর্ণ হবে। ম্যালবোর্ণ হবে না। আপনি, কিন্তু বারবার ম্যালবোর্ণ বলছিলেন।

আমার এ-ব্যাপারে কোন হাত নেই। কারণ নানাভাবে দেখেছি, অনেক যত্নে যখন দেশের টান ভুলতে চেষ্টা করছি তখন কোথায় যেন ভেতর থেকে তারা রক্তের ছায়া হয়ে দেখা দেয়। টানের চোটে আমি এমন ভেসে যাই যে মেলবোর্ণ ম্যালবোর্ণ হয়ে যায়। আমি শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক ঠিক বলে যেতে পারি না।

আমরা ছেলেরা থাকতাম এ-পাশের হোষ্টেলে। ওরা থাকত ও-পাশে। খাবার ঘর ছিল আমাদের কমন। রেডিসেনসিয়েল ট্রেনিং কলেজ। ক্লাশ বসত এক সঙ্গে। দুপুরে খেতে গিয়ে দেখলাম—ও বসে আছে ও-পাশে। খুব গম্ভীর মুখ। আমার দিকে কিছুতেই তাকাচ্ছে না। কেমন মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। উঠে যাবার সময় দেখলাম সে আমার পিছনে বলছে, আবার!

—আবার মানে!

—আবার মানে কি! প্রার্থনা সভা থেকে বের হয়ে 'জুতু' খুঁজছিলেন। জুতু বলে কোন বাংলা শব্দ নেই।

আমি হা হা করে হাসতে গিয়ে কেমন ঢোক গিলে ফেললাম। প্রতি-পক্ষ এত গম্ভীর যে, বোকার মতো আর যাই করা যাক, হা হা করে হাসা যায় না। তারপর ঢোক গিলে যেমন বলতে হয় বলা, হ্যাঁ হ্যাঁ জুতু। যতবার জুতো বলতে যাই ততবার জুতু হয়ে যায়। ভারি মুশকিলে পড়া গেল। থাকতাম কলোনীতে, কাজ করতাম কলোনীর স্কুলে। বন্ধু বান্ধব যা

সব—যদিও এদেশের, তবু তারা আমার ভাঙা বঙ্গজ শব্দ সহ্য করে আসছে, ওরা যদি শুধরে দিত, তবে এতটা নাজেহাল হতে হত না—কি যে করি এখন! যত লঘু করতে চাচ্ছি ব্যাপারটাকে এ-মেয়ে দেখছি তত ক্ষেপে যাচ্ছে, খুব ইতস্তত করে বললাম, কি করি বলুন, কিছুতেই আসে না। খুব সাবধানে বললে তবু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় যে কি ভাবে সব গোলমাল হয়ে যায়!

ওর এমন একটা মজার ঘটনা কোথায় খুব উপভোগ করার কথা ছিল, তা না, সে কেমন কঠিন হয়ে গেল। বলল আমাদের হোস্টেলে এ-নিয়ে ভীষণ হাসি ঠাট্টা হচ্ছে।

—তাই বুঝি।

—লীনা, চন্দনা অর্চনা সবাই বলছে—ওরে, আজ ম্যালবোর্ণ বলছে, জুতু কোথায় গেল! তারা কেউ এখন আর জুতো বলছে না, কেবল জুতু জুতু করছে। এ ওর ঘরে গিয়ে বলছে, চন্দনা আমার জুতু কোথায় গেল রে!

—ওরা বলছে, বলতে দিন। ওরা এটা নিয়ে বেশ আনন্দে যখন আছে তখন দোষের কি। আনন্দটা ওদের উপভোগ করতে দিন না।

কথায় কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না বুঝতে পেরেও কেমন আরও ক্ষেপে গেল। দেখুন আমি এ-দেশের মেয়ে হতে পারি। কিন্তু আমার মা পূর্ববঙ্গের। আমরা ছেলেবেলাতে মামাবাড়ীতে মানুষ। কই, আমাদের তো এমন হয় না।

ওকে বলার ইচ্ছা ছিল, আপনার এত মাথাব্যথা কেন! কিন্তু চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যেন কি আছে ভিতরে, যা সহজে টের পাওয়া যায় না, এক অতীব মায়া অথবা বলা যায় এক অসাধারণ কিছু কে কোথায় কি ভাবে যে আবিষ্কার করে ফেলে তখন অস্পষ্ট এক ফুলের গাছ, তার সৌরভ চারপাশে খেলা করে বেড়ায়। সাদা জ্যোৎস্নায় সে-সবের মানে যেন ঠিক ঠিক ধরা যায় না। কেমন সব গণ্ডগোল পাকিয়ে যায়। বললাম, ঠিক আছে চেষ্টা করব। খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে। দেখছি। বলার ইচ্ছা হল, অন্যমনস্ক হলে এটা হয়। রক্তের ভিতর উদাসীন ছায়ারা তখন লুকোচুরি খেলে। আমি ঠিক ঠিক বলে যেতে পারি না। কিন্তু তারপর যেই না আবেগে কিছু বলা, আর যায় কোথায়। আবার কামিনী গাছের নিচে আবছা মতো মুখ। ও বোধ হয় গানের ক্লাশ করে ফিরে যাবার মুখে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তেমন সাদা জোৎস্না। ও ডাকছে, শুনুন!

—আমাকে?

—তবে আর কাকে!

'অঃ! সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম ও বলল, টানের চোটে একেবারে মউজা বলে ফেললেন! মউজা হবেনা, মজা হবে মশাই। আস্তে আস্তে

কথা বলবেন। তবে টানের চোটে নদী ভেসে যাবে না। সে তারপর কেমন আরও ক্ষেপে গিয়ে বলল, শীতকালে আপনার কি দরকার ছিল ট্রেনিঙে আসার! শীতকালটা পার করে আসতে পারলেন না!

বুঝতে পারলাম—জুতো মোজা নিয়ে তার হোঁচটে প্রাণান্ত হচ্ছে। ও ক্ষেপে যায় বলে হয়ত ওরা আরও মজা পেয়ে গেছে। তারপর যা হয়ে থাকে, আমি মোজা বলি স্বপ্নেও প্রায় দেখি কখনও কখনও মোজা মোজা বলে চিৎকার করছি।

সে এ-ভাবে আমাকে ক্রমে সংস্কার করে যাচ্ছিল। যেমন, সেদিন সে আমাকে সাফাইয়ের ক্লাশ থেকে বের হবার মুখে এক ধমক লাগাল জ্যোতির্ময় বলতে পারেন না। কেবল জুতির্ময় জুতির্ময় করছিলেন।

জ্যোতির্ময় আমার বন্ধু ক্যান্টিনে ওকে খুঁজছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কি করে জ্যোতির্ময় জ্যুতির্ময় হয়ে যায় এবং এ ভাবে সে আমাকে সারাটা বছর পিছনে লেগে লেগে কখন যে বেশ ধোপ দুরস্ত করে ফেলেছে জানিনা, এসকারসানে টের পেলাম আমাদের ভিতর এই করে আশ্চর্য এক মায়া অথবা বলা যায় ভালবাসা অজ্ঞান্তে গড়ে উঠেছে। আর এ-ভাবে বুঝতে পারি সে আমার খুব কাছাকাছি এসে গেছে এবং কোন ট্রেন যাত্রায় অথবা কোন বড় মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে টের পাই—কথা বলতে বলতে ওর কেমন গলা ধরে আসছে। ট্রেনিং শেষ হবার মুখে সে কি করে যেন বুঝে ফেলেছিল এক বছর ধরে যে মানুষকে ধোপ দুরস্ত করা গেল, ছেড়ে দিলে আবার আগের জুতু মউজা হয়ে যাবে।

তারপর যা হয়ে থাকে—এক শীতের রাতে আবার আমরা কোন দূরগামী ট্রেনে চড়ে কোথাও যাচ্ছি। সে আমার শিয়রে বসে ছিল। তার কপালে লাল সিঁদুরের টিপ, পরনে ঢাকাই বেনারসি, হাতে শংখের বালা। সে আমার শিয়রে বসে ছিল। আমার বেশ বড় একটা শীতের মাঠ পার হয়ে নদীর পুলে উঠে গেছি—তারপর দু পাশে আদিগন্ত মাঠ। শীতের মাঠে রাতের ট্রেনে আমরা নানাভাবে দুজনে যখন বেশ সুন্দর সুচারু সব স্বপ্নের ভিতর ডুবে যাচ্ছিলাম তখন আমার শরীরে কী শীত! ওকে বললাম, বেডিং খুলে ল্যাপটা বের করে দাও না?

—আবার ল্যাপ! ও খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

লেপটা ধীরে ধীরে আমার গায়ে ফেলে দিলে ওর দুহাত ধরে ফেললাম, ল্যাপ না বললে মেয়ে তোমাকে যে আমি কোথায় পেতাম!

এবার সে হেসে দিল। তারপর সেই দূরগামী ট্রেনের শব্দ শুনতে থাকলাম। শীতের মাঠ, সাদা জ্যোৎস্নায় কামিনী ফুল এবং তার সৌরভের ভিতর আমরা ফের হারিয়ে যেতে থাকলাম।

বৃষ্টির আগে (অশ্লীল গল্প)

বাড়ীটা মাঠের ভেতর। দেখলেই মনে হয় বড় নিঃসঙ্গ এই বাড়ী—সদর দরজার উপর লতানে গোলাপের ঝাড়। কিছু ফুল এবং ফুলের পাপড়ি নীচে ঝরে আছে আর সামনে সব দুর্লভ পাতাবাহারের গাছ, দামী টবে এই খরার দিনেও নানা রকমের ফুল ফোটানো হয়েছে। বাড়ীর দক্ষিণের জানালাতেও বড় এক বকুল গাছ। খরাতে গাছের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। জানালা খুলে দিলে দক্ষিণের হাওয়া মাঠের উপর দিয়ে কখনও সামনের রেল ষ্টেশনের উপর দিয়ে অথবা যেখানে সিগনালের বাতি জলছে অহরহ রাতে তার পাশে ঘুরে ফিরে উত্তরে চলে যায়।

দেবীবাবুর দশ বছরের মেয়ে করুণার বড় সখ বকুল ফুলের। অথচ গাছটায় এবার ফুল ফুটছে না। খরার জন্য সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। বনমালী নল দিয়ে পুকুরের জল তুলে বার বার ফুল ফোটানোর চেষ্টা করছে। অন্যান্য বছর করুণা দুহাতে তার খোঁপায় বকুলের মালা পরে। এই ঝুল বারান্দায় গ্রীষ্মের দিনে দাঁড়ালে দেবীবাবু যেন বুঝতে পারেন বসন্ত চলে গেছে—গ্রীষ্মের দিনে করুণার মাথার চুলে এবং হাতে বকুল ফুলের মালা—বয়সে প্রবীণ দেবীবাবু বুঝতে পারেন —বসন্ত চলে গেল। করুণা বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের প্রথম দাবদাহের ভিতর বকুলের মালা পরে পাশে অংশু নামক এক সরল বালকের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত—এই সুন্দর ছবি দেখে দেবীবাবুর মনে হত—এটা গ্রীষ্মকাল, শীতের মাঠ এখন শুকনো, দক্ষিণের বকুল গাছটায় অজস্র ফুল ফুটছে এবং দীর্ঘদিন আগে উত্তরের হাওয়া অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায় আর বড় মাঠে বড় মুরগীর প্রতিপালন, খোয়াড়ে গরু ঘোড়া এবং মাঠে মাঠে দেবীবাবুর সোনার ফসল। দেবীবাবু চোখ বুজে মুখের ছবিটা ভেতর থেকে অনুভব করার চেষ্টা করতেন।

অথচ এ-সালে শীত চলে গেল, বসন্ত চলে গেল এবং গ্রীষ্ম চলে যাচ্ছে—এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই এ বছর। কোথাও ফুল ফুটছে না, গাছে গাছে সব মৃত পাখি ঝুলছে অথবা সব পাখ পাখালিরা অন্যত্র উড়ে যাবার জন্য উন্মুখ আর চাষীরা বৃষ্টির জন্য মাঠে হাহাকার করে বেড়াচ্ছিল। দেবীবাবু ঝুল বারান্দায় দেখলেন

করুণা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে এবং চুলে বকুল ফুলের মালা নেই। তিনি বনমালীকে ভর্ৎসনা করলেন। গাছটাতে একটা বকুল ফুল ফোটাতে পারল না বনমালী—মনে হচ্ছিল মা-মরা মেয়েটা বকুল ফুল না পেয়ে অসুখী। তিনি নীচে নেমে এলেন—ভেতরে ভেতরে এই সংসারকে সুখী করার এক প্রাণান্তকর ইচ্ছা—তিনি নীচের দেয়ালে বড় বড় ছবি দেখলেন। তিনি তাঁর এই পায়চারি করার সময় দেখলেন দূরের মাঠে চাষীরা পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং দেওয়ালে বড় বড় জাতীয় পুরুষের ফটো। চাষীদের বড় কষ্ট—খরার জন্য মাঠ ফেটে গেছে। জাতীয় পুরুষদের ফটোগুলো হা হা করে যেন হাসছিল। দেবীবাবুও হা হা করে অকারণ হেসে উঠলেন।

তিনি হেঁটে এলেন সদর পর্যন্ত। বনমালী এই মাত্র নলের সাহায্যে জল তুলে পাতাবাহারের গাছগুলোকে ভিজিয়েছে। সুতরাং এই খরার দিনেও পাতাবাহারের পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ছিল। বনমালী ভোরে উঠে বাগানের গাছে গাছে জল দেবার সময় এই দুর্লভ পাতাবাহার গাছগুলোর মাথায় বৃষ্টির মত করে নলের জল তুলে দেয়—দেবীবাবু এ জন্য বড় খুশী। তিনি গাছের নীচে সামান্য আগাছা দেখতে পেলেন। রাগে দুঃখে ডাকলেন:
—বনমালী, ও বনমালী তোরা কি সব মরে গেছিস?

অন্নদা দোতালার ঝুল বারান্দায় উঁকি দিয়ে বলল, কি হয়েছে! বনমালী মুরগী কাটছে জান না!

—না অন্নদা এ বড় অন্যায়। তুই বনমালী কি করছিস সারাটা দিন! যেন আত্মগতভাবে কথাটা বললেন।—দ্যাখো কত আগাছা গাছগুলোর নীচে। তিনি ফের যেন আত্মগতভাবে ভাবছেন—তুই কি বাছা গাছগুলোকে বাঁচতে দিবি নে! তখন একটা মানুষ বৃষ্টির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল। সকলের প্রতি এক সম্ভাষণ, হ্যাঁ বাছা সংসারে আর বৃষ্টি হবে না! মানুষটা মাথায় রোদ্দুর নিয়ে হাড়ি পাতিলের মত যেন বন বন করে বৃষ্টির জল ফিরি করছে। দেবীবাবু মানুষটাকে রেল লাইন পার হয়ে প্রাচীন এক অশত্থের নীচে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন। আর কোত্থেকে কখন এক বিজ্ঞাপনের মানুষ—পিঠে বড় বিজ্ঞাপনের বস্তা, কাঁধে বড় লম্বা মই—মানুষটা সেই বিজ্ঞাপনের বোঝা নিয়ে চাঁদের বুড়ির মত হাঁটছে এবং সব সরস হিন্দি চিত্রের ছবি ষ্টেশনের দেয়ালে, বড় বড় অশত্থ গাছে, বিদ্যালয়ের মাঠে এবং প্রসূতিসদনের মাথায় লাগাচ্ছে। দেবীবাবু

দেখলেন সেই সরল হিন্দি চিত্রের বিজ্ঞাপন হাওয়ায় এদিকটায়ও একটা উড়ে আসছে। বিজ্ঞাপনের উপর চোখ পড়তেই মনে হল সব ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে—শুধু উপরে করুণার কণ্ঠস্বর, সে হাত পা ছুঁড়ে বকুলফুলের জন্য বায়না করছে। ওর হাতে ফুল চাই, চুলে ফুল চাই। ফুলে ফুল না হলে অন্নদা—যে অন্নদা—বিধবা অন্নদা পর্যন্ত খুশী নয়। দেবীবাবু ফের সেই আত্মগত স্বরে বললেন—মেয়ে তোমার রাজহাঁস চাই, রাজপঙ্খী ঘোড়া চাই, সুন্দরবনের বাঘের মত সদরে লাঠিয়াল চাই আর মাখনের মত রাজপুত্র চাই—মেয়ে এ-সব সহজে হয়না—বড় কৌশল জানা দরকার মেয়ে এবং এ-সময়েই দেবীবাবুর অংশু নামক এক সরল বালকের কথা মনে পড়ে গেল যে এই বাড়ীর ভেতরে কোথাও না কোথাও বসে বিদ্যাসাগর নামক এক প্রাণীর ইতিহাস পড়ছে এখন অথচ চুপি চুপি জানালা খুলে পুবের আকাশে ভোরের পাখি উড়তে দেখে নিজের হাতে তালি বাজাচ্ছে। অথচ হ্যাখো আশ্চর্য সংসারের ছবি একেবারেই সরল হয় না।

মাঠের ভেতর বাড়ী—পাশে বড় এক নদী—হেজে মজে যাচ্ছে এবং পারে পারে আম জাম নারকেলের গাছ, গাছগুলো খরার জন্য মরে যাচ্ছে, সারা গাছের নীচে সব চাষাদের ঘর, মাটির দেয়াল—কঙ্কালসার মানুষের মিছিল ঢিবি মেরামত করতে সকাল থেকে হাজির—ওরা সেখানেও মাটি কাটার সময় বার বার আকাশ দেখছিল—আহা আল্লা ম্যাঘ দ্যা পানী দ্যা, আহা আল্লা দ্যাশটারে ইবারে পানীতে ভাসাইয়া দ্যাও, আমরা দুঃখী মানুষেরা মাটিতে কাদায় মোষের মত শরীর পাইতা বইসা থাকি—আহা আল্লারে দ্যা, সরল ম্যাঘের পালে আমারে ছাইড়া দ্যা—আমি ভাইসা যাই। আহা ম্যাঘরে তুমি কোন অমরাবতীর মত নিরুদ্দেশে গ্যালা!

অংশু জানালা থেকেই সব দেখছিল। বড় মাঠে সব শীর্ণ গরু বাছুর, মাঠে ঘাস নেই, মনে হচ্ছে গরুগুলো ঘাসের বদলে ক্ষুধার জ্বালায় মাটি চেটে খাচ্ছে। আর জলের জন্য দেশটা হাহাকার করছিল। চাষীরা সব কোথায় সরকারের দৌলতে চোরের ঢিবি নির্মাণ হচ্ছে সেখানে চলে গেছে টেষ্ট রিলিফ খাটতে। মধ্যবিত্ত মানুষেরা দাওয়ায় বসে গরমে হাই তুলছে। অভাবে অন্ন ঘরে উঠছে না। চোখে মুখে বিষণ্ণ ছাপ। সূর্য ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। চোরের ঢিবিতে ওরা মাটি ফেলতে পারল না সুতরাং রাগে দুঃখে ওরা দাওয়ায় বসে সরকারের

বাবার শ্রাদ্ধ শান্তি করছে। সূর্য ক্রমশ নীচে নেমে আসছে তেমনি। সড়কে ধুলো উড়ছিল। মাঠে ঘাস নেই বলে অবলা গরুবাছুর মেষ এবং মহিষ নিয়ে অতুলা বাগ্দীর ছোট ছেলে সামনের নদীতে নেমে যাচ্ছে। নদীতে সামান্য জল—কোথাও শুকনো। চরের জমিনে ফুটি, তরমুজ—কিছু উচ্ছে লতার গাছ, পটলের গাছ—বৃষ্টি নেই বলে সব হেজে মজে যাচ্ছে। অংশু অতুলা বাগ্দীর ছোট ছেলেকে সড়কে পড়তেই আর দেখতে পেল না। খুব ধুলোবালি উড়ছে বলে অতুলা বাগ্দীর ছোটছেলে গরু বাছুর সব অদৃশ্য হয়ে আছে।

সামনের মুদি দোকানে জোর বচসা হচ্ছিল তখন। লোকটা বচসা করতে করতে নালিশ দেবার জন্য দেবীবাবুর কাছেই আসছে। সব কিছুর আকাল দেশে—ন্যায্য দামে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না—লোকটা চিৎকার করছিল মাঠের উপর। দেবীবাবু বুঝলেন, পঞ্চানন বচসা করছে। তিনি বনমালীকে ভেতর থেকে একটা ইজিচেয়ার দিতে বললেন। কারণ বৈঠকখানার ভেতর পঞ্চানন ঢুকে পড়ুক মনে মনে তিনি তা চাইছেন না এখন। আর তিনি যেখানে বসেছিলেন ঠিক তার সামনের দেয়ালে বড় ছবি—একবার নেহেরু সাহেব এ অঞ্চলে এসেছিলেন, তখন সারা দেশে বন্যা হচ্ছে। ছবিটা—নেহেরু সাহেব হেলিকোপ্টার থেকে নামছেন—দেবীবাবু অঞ্চলের নামী মানুষ সুতরাং দেবীবাবু বড় যুঁই ফুলের মালা গলায় পরাবার সময় হাসপাতালের ডাক্তার এবং স্থানীয় সংবাদবাহী কাগজের ফটোগ্রাফার কিছু ছবি তুলে রেখেছিল। দেবীবাবু এ সব ব্যাপারে খুব খেয়ালী—স্থানীয় লোকদের অনুরোধেই ছবিটা যেন এখানে তিনি কত বড় এবং মহৎ তা ব্যাখ্যার জন্য ঝুলিয়ে রেখেছেন। সুতরাং পঞ্চাননকে দেখছেন না—দেয়ালে জাতীয় পুরুষদের দেখছেন এমত এক মুখ করে তিনি বসে থাকলেন।

এই পঞ্চানন কি নালিশ দেবে এখন, দেবীবাবু জানেন। এবং তিনি জানতেন সব সত্য—কারণ সরষের ফলন গত বছর কম হয়েছে, চাহিদার তুলনায় তেলের অভাব বাজারে যথেষ্ট। বেশী পয়সা পেলে দোকানী মজুদ থেকে তেল সংগ্রহ করে দিচ্ছে এও সত্য এবং সত্যের সামিল দেবীবাবু এখনও খাঁটি সরষের তেলই খাচ্ছেন। তবে সংসারে সকলের জন্য সব কিছু হয় না—জনসংখ্যা বাড়ছে, সামনের মাঠ পার হলে, বিদ্যালয়ে অফিস পার হলে গ্রাম্য প্রসূতিসদন। জন্মদাতা জন্ম দিচ্ছেন, লণ্ঠন সার ব্যবহার হচ্ছে মাটিতে—

দেবীবাবু লণ্ঠন সারের বিক্রয়কেন্দ্র খুলেছেন এবং তার পাশেই ছোট এক পরিবার পরিকল্পনার অফিস—লুপ ব্যবহার করুন এবং এক সুন্দর পরিবার পরিকল্পনার ছবি—চাষী মানুষের কাঁধে পুত্র সন্তান আর জননীর হাত ধরে হবু জননী। অংশু বিদ্যালয় থেকে ফিরতে লুপের বিজ্ঞাপন দেখে প্রায় বানান করে জোরে জোরে মন্ত্রের মত পড়েছিল এবং পরে ফিরে—হ্যাঁ মামাবাবু লুপ মানে কি ?

দেবীবাবু মুখ গোল করে জবাব দিয়েছিলেন—ব্যাঙ আছে না, ব্যাঙ—ক্লপ ক্লপ শব্দ করে ডাকে—সোনা ব্যাঙ, ওর আল জিভটাকে বলে লুপ।

অংশু সেই থেকে সোনা ব্যাঙ পেলে ঢিল দিয়ে ব্যাঙটাকে মারত। ওর মুখ ফাঁক করে আলজিভটা দেখত। দেবীবাবু একদিন ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করে অন্নদার ভেতরকার দৃশ্য মনে করতে পারছিল। রাগে দুঃখে তিনি অংশুকে বেত্রাঘাত করেছিলেন—নাবালক ভাগনেকে তিনি শাস্ত্রসম্মতভাবে গালাগাল করে বুঝাতে সাহায্য করেছিলেন—লুপ বাছা ব্যাঙের মুখে থাকে না। বড় হলে বুঝতে পারবে।

দেবীবাবুর সব মনে পড়ছিল। তিনি এই সব ভাববার সময়ই দেখলেন পঞ্চানন প্রায় তেড়ে আসার মত বলছে, দেখেছেন বেটার কাণ্ড। বলে কি না তেল নেই। সব তেল লুকিয়ে ফেলেছে।

—তুমি বোস পঞ্চানন, বড় তোমাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

—আপনি এর বিচার করুন।

—পঞ্চানন ওর দোকান বড় ছোট। বড় বড় রাঘব বোয়ালদের ধরতে হয়। ওকে ধরে কি হবে !

—কিন্তু বেশী পয়সা দিলে…।

—তা দেবে পঞ্চানন। ওকেও ত বাঁচতে হবে।

পঞ্চানন এবার পায়ের কাছে বসে ফিস ফিস করে বলল, টাকাটা এনেছি দাদা।

—ভাল করেছ। যার টাকা তাকে দিতে পারলে বাঁচি বাপু। তিনি বনমালীকে উদ্দেশ্য করে ডাকলেন, বনমালী, বনমালী। বনমালী এলে দু কাপ চায়ের কথা বলে বনমালীকে ভেতরে ঢুকে যেতে বললেন।

পঞ্চানন বলল, দাদা আমার কোন অসুবিধা হবে না ত !

—আরে না না। তবে দেবীবাবু থাকল কি করতে। যদি তোমাদের দশজনের উপকারে না আসতে পারি তবে…তবে যেন বলার ইচ্ছা দেবীবাবুর আমাদের পূর্বপুরুষরা এই যে উৎসর্গীকৃত জীবন আমাদের জন্য রেখে গেছেন… আমরা বেঁচেবর্তে থাকব…আমরা আল্লা ম্যাঘদে পানী ছ্যা মুখে বলব, আমরা মনে মনে ভোগের জন্য মুরগীর মাংস খাব—আর কি করতে পারি পঞ্চানন, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্য ফলন কমে যাচ্ছে, চাষে বাসে সুখ নেই, সকলে অজগর সাপ গিলে বসে আছি, অথবা যেন ব্যাঙের মুখে লুপ, লুপ পরে একটা ব্যাঙ যেন ক্লপ ক্লপ করে যথার্থ ই গোলাপ বাগানে ডাকছে পঞ্চানন।

তখন পঞ্চানন বলল, দেখেছেন বকুল গাছটার মাথায় একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাতার মত উড়ে এসে জুড়ে বসল।

দেবীবাবু বললেন, ছ্যা ছ্যা। যা হয়েছে আজকাল! বলে তিনি নীচ থেকে উঁকি মেরে দেখলেন। যেন আর একটু নীচু হলেই যুবতীর খোলা অংশটুকু ভেতর থেকে দেখা যাবে। বড় অশ্লীল ছবি রে পঞ্চানন!

পঞ্চানন বলল, অত স্থুলে কি দেখা যায় দাদা! বলে পঞ্চানন উঠে গেল।

পঞ্চানন উঠে গেলে দেবীবাবু দেখলেন বকুল গাছটায় সরস হিন্দি চিত্রের ছবি—জাতীয় পতাকার মত উড়ছে। বাতাসে কিছু অংশ ছিঁড়ে গেছে। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সময় বুঝলেন—ছবিটার প্রায় অংশই ছিঁড়ে গেছে, শুধু যুবকের গলা থেকে বুক এবং যুবতীর দু হাঁটু মুড়ে জংঘার ভেতরের অংশ প্রকট। আর তিনি দেখলেন সরলমতি বালক অংশু এবং করুণা জানালায় দাঁড়িয়ে রঙ বেরঙের বিজ্ঞাপনটি তুলে আনার চেষ্টা করছে। ওরা হাত দিয়ে নাগাল পাচ্ছিল না বলে একটা পাট কাঠির সাহায্য নিচ্ছে। দেবীবাবু ধমক দিলেন, এই কি হচ্ছে রে! বনমালী, বনমালী!

—হুজুর।

—বনমালী দেখছিস গাছটায় একটা কাগজ উড়ছে।

—হ্যাঁ হুজুর।

—ওটা জলে ফেলে দে। তিনি ডাকলেন, এই করুণা, এই অংশু।

করুণা বলল—যাচ্ছি বাবা।

অংশু বলল—যাই মামাবাবু।

তোমরা কি করছ?

—আমরা এখানে।

—বিকালের খাবার খেয়েছ ?

—খেয়েছি।

আর তখন অন্নদা দোতালার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। দেবীবাবুকে উঠে আসতে দেখে বলল, ওরা খেয়েছে। তোমার বিকালের খাবার নিয়ে বসে আছি। দেবীবাবু এই সময় সামান্য আহার করেন। বিধবা অন্নদা ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আহার্য বস্তু হিসাবে থাকে সামান্য দুধ, সন্দেশ এবং সবরী কলা। সন্দেশ দুধে না ভেজালে ঠিক রসালো হয় না। বিধবা অন্নদা সামনে না থাকলে খেয়ে পেট ভরে না। সুতরাং দেবীবাবু লম্বা এবং সৌখীন মানুষ। হাত এবং পা শরীরের অনুপাতে বেশী লম্বা মনে হয় এবং তিনি খেতে খেতে অন্নদাকে অনেক দূর থেকে যেন স্পর্শ করতে পারেন। অন্নদার চেহারা বড় মিষ্টি, বড় রসালো। দেবীবাবু দুধে সন্দেশ ভেজাবার সময় রহস্যজনকভাবে হাসছিলেন, অন্নদাও রহস্যজনকভাবে হাসছিল। কারণ রাতের সব ঘটনার কথা বোধ হয় উভয়ের মনে পড়ছিল। দেবীবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছে। চুলে তিনি কলপ ব্যবহার করেন। কানে গন্ধদ্রব্য থাকে। এবং মিহি খদ্দর পরেন তিনি। অন্নদার কোমল ছবি দেবীবাবুকে আরও বড় এবং মহৎ হতে সাহায্য করছে।

দেবীবাবু দুধটুকু নিঃশেষ করার সময় বলল, লুপ মানে কি অন্নদা ?

—কি জানি বাপু, তোমার ভারি অসভ্যতা।

—আমি বলছি কি, অংশুটা বলছিল, মামাবাবু লুপ মানে কি !

—তুমি কি বললে ? অন্নদার ভেতর থেকে হাসি উঠে আসছিল।

—বললাম লুপ মানে ব্যাঙের আলজিভ।

—তুমি ভারি অসভ্য দেবীবাবু।

তখন বনমালী নীচ থেকে হাঁকল, হুজুর ইস্কুলের মাষ্টারবাবু এসেছেন।

অন্নদা বলে পাঠাল, উনি খাচ্ছেন, বসতে বল মাষ্টারবাবুকে।

দেবীবাবু কোন তড়িঘড়ি করলেন না। খুব ধীরে ধীরে চেটে পুটে খেলেন। করুণা এবং অংশুকে ডেকে কিছুক্ষণ কথা বললেন, ওদের ভাল হতে বললেন, পড়াশোনা ভাল করে না করলে বড় হওয়া যায় না এ-সব বললেন, করুণা এবং অংশু চলে গেলে বললেন, হ্যাঁরে অন্নদা শোন।

অন্নদা কাছে এলে দেবীবাবু অন্নদার কোমল নাভির কাছে গালের স্পর্শ রেখে বললেন, এত ঠাণ্ডা কেনরে অন্নদা! কিছু খাসনি? না ব্যাঙের আল-জিভটা ভেতরে ভেতরে সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে।

অন্নদা যেন পেট খালি করেই রেখেছে। এই প্রৌঢ় মানুষটির বয়সও যেন আর বাড়ছে না। অন্নদার বয়স আর কত হবে। যুবতী অন্নদা দেবীবাবুর মাথাটা পেটের কাছে রেখে বলল, তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেবীবাবু। এবারে বিশ্রাম নাও।

—বিশ্রাম আর পাব না। দেবীবাবু অন্নদার নাভির চারপাশে হাত বোলাবার সময় কথাটা বললেন। তারপর কেমন অন্যমনস্কভাবে বললেন, এবারেও সময়ে বৃষ্টি হল না, লোকজন পেট ভরে খেতে পাবে না, যারা লড়ছে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের পোয়াবারো। দেবীবাবুর মুখ খুব চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল।

অন্নদা বলল, তোমাদের হাতেই ত সব! ওদের ধরে ধরে ঠেঙাতে পার

দেবীবাবু হাসলেন, তারপর বললেন, তুই এখনও সেই আন্নুই আছিস! তোর বয়স আর বাড়বে না। দেবীবাবু ঠোঁটে সামান্য জল দিয়ে উঠে পড়ার সময় বললেন, পঞ্চানন রাতে হাজার চারেক টাকা দেবে। টাকাটা গুণে রাখবি।

অন্নদা বলল, দেবীবাবু এত টাকায় তোমার কি হবে!

—ও টাকা আমার নয় রে। টাকা সব ফাণ্ডের। ভোটাভুটি করতে আমার টাকা লাগে না! ও টাকা আমাদের আসবে কোত্থেকে।

অন্নদা বলল, পঞ্চাননকে টেষ্ট রিলিফের ভার দিয়ে ভাল করনি। সে চোর শুনেছি।

দেবীবাবু এবারে হা হা করে হেসে উঠলেন।—অন্নদারে, তুই দেখছি সেই আন্নুই আছিস। চুরি না করলে মানুষ খাবে কি, বড় হবে কি করে, সংসারে প্রতিপত্তি বাড়বে কি করে আর আমাদের ফাণ্ডে চার হাজার টাকাই বা আসবে কি করে'! বলে তিনি অন্নদাকে খালি বারান্দায়ই জড়িয়ে ধরলেন।

—এই কি হচ্ছে দেবীবাবু! চাকর বাকর দেখে ফেলবে। বলে দৌড়ে অন্নদা ঘরে ঢুকে গেল।

দেবীবাবু দেখলেন বকুলগাছ থেকে তখন বনমালী সরস হিন্দি চিত্রের ছবিটা নামানোর জন্য গাছে উঠে যাচ্ছে। সব গাছের পাতা পড়ে যাচ্ছিল। বৃষ্টি হচ্ছে না। ভয়ঙ্কর খরা চলছে। মাঠে তিনি লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ দেখতে পেলেন—সোনা ব্যাঙ, কাট ব্যাঙ। সব মাটি ফেটে গেছে—ব্যাঙেরা সব সেই গর্তে লুকিয়ে পড়ছে এবং বড় বড় অজগর সাপ সোনা ব্যাঙের ঠ্যাং চিবুচ্ছে। তিনি সামনের মাঠে, আশে পাশে কোথাও মানুষ দেখতে পেলেন না। মৃতবৎ এই পৃথিবীকে তিনি দু হাতে নিঃশেষ করে দিচ্ছেন যেন। তাঁর স্বর বড় ক্লিষ্ট শোনালো—অন্নদারে বড় দুর্বল বোধ করছি। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

বৃষ্টির পরে

অংশু জানালা থেকে সরে দাঁড়াল। জানালার পাশে বড় বকুল গাছ—বনমালী গাছে উঠে যাচ্ছে। বকুল গাছটায় এখন আর ফুল ফুটছে না, পাতা ঝরে যাচ্ছে। সেই কবে খরা আরম্ভ হয়েছিল, সেই কবে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না, ফসলহীন মাঠ—রুক্ষ, এবং বৃষ্টির জন্য হাহাকার করছিল। অথচ কোত্থেকে সরল এক হিন্দী চিত্রের বিজ্ঞাপনের বড় লম্বা মোটা কাগজ গাছটার মরা ডালে আটকে গেছে। দোতলার জানালা থেকে অংশু এবং করুণা ছবিটা দেখছিল। বনমালী গাছে উঠছে এবং সেই সরল হিন্দি চিত্রের নগ্ন ছবিটাকে মনে মনে গাল দিচ্ছিল। ছেঁড়া সেই ছবিটার ভিতর নায়িকার বুকের সামান্য অংশ এবং পায়ের ভাঁজের অংশ এত উৎকটভাবে নড়ছিল যে বনমালী—সামান্য মালী এবং চাকরের কাজ করেও লজ্জা পাচ্ছিল। সামনের শহরে সরল হিন্দি চিত্র চলছে। শীর্ণ চেহারার এক মানুষ কাঁধে বিজ্ঞাপনের বোঝা ফেলে পিঠে মই নিয়ে গ্রামের বড় বড় অশ্বত্থ গাছে বিজ্ঞাপন মেরে চলে গেছে। নোংরা এবং উৎসাহহীন এই বিজ্ঞাপনের ছবি করুণা ও অংশু জানালা থেকে দেখছিল। ওরা একটা পাট কাঠি দিয়ে বিজ্ঞাপনটার সেই উদ্ভট ভাঁজগুলোতে খোঁচা মারছিল—দেবীবাবু দোতালায় উঠে এ সব দেখে রাগে দুঃখে চিৎকার করে ডাকলেন—'বনমালী! বনমালী। বকুল গাছটার মরা ডালে একটা খারাপ বিজ্ঞাপন ঝুলছে। ওটা জলে ফেলে দে।'

গাছ বেয়ে বনমালীকে উঠতে দেখেই করুণা জানালা থেকে সরে গেল। দেবীবাবুর ভয়ে অংশুও জানালা থেকে সরে গেল। ওদের আর কিছু ভাল লাগছে না। কবে একবার বৃষ্টির আগে ওরা গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার সময় ফসলভরা মাঠ দেখেছিল, কবে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার সময় নদীতে ভরা কোটালের বান দেখেছিল এবং গাছে গাছে অজস্র ফুল, মাঠে মাঠে সবুজ ধানের চারা।

দেবীবাবু সেই কবে একবার কোন উৎসবে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন—দীর্ঘদিন আর কোন ভাষণ দেবার সুযোগ পাচ্ছেন না, সুতরাং

বাড়ি ছেড়ে তিনি কোথাও যাচ্ছেন না আর। আর করুণা আর অংশু এই দুর্গের মত বাড়িতে অন্নদা মাসীর হেফাজতে বড় হচ্ছিল। তারাও একটু ঘুরে ফিরে অথবা বন বাদাড় করতে পারছে না। ওরা কঠিন শাসনের ভিতর এই খরার সময়ে বড় হচ্ছিল। দুর্গের মত এই বাড়ি অতিক্রম করে সামনের মাঠ পার হয়ে, রেল স্টেশন পার হয়ে অতুলার ঘুন্টিঘর—অতুলা ঘুন্টিঘরে ময়না পুষে রেখেছে—অতুলা বলেছিল অংশুকে, খোকাবাবু ঘুন্টিঘরে গেলে তুমি টিয়াপাখি পাবে। হিজলের বন থেকে তোমাকে টিয়াপাখি ধরে দেব। দেবীবাবু খরা আরম্ভ হবার পর থেকে বাঁধ বেঁধে হিজলের বন্যার জল নিরোধ করে ফসল ফলানোর জন্য টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করেছেন। এই খরাতে সব পুড়ে যাচ্ছে—তিনি সামান্য চেষ্টায় মানুষের মহৎ উপকার করে যাচ্ছেন। করুণা বাবাকে বড় বেশী ব্যস্ত দেখছিল। অংশু মামাবাবুকে এই খরার দিনেও রোজ বিকেলে দুটি সন্দেশ ভিজিয়ে খেতে দেখেছে এবং একবার অংশু দেখেছিল মামাবাবু অন্নদা-মাসীর গাল ছুঁয়ে বলছেন, অন্নদা তোর গা এত ঠাণ্ডা কেন ? অংশু সেই থেকে যেন মামাবাবুকে বড় বেশী ভয় করতে শুরু করেছে। আর অংশু সেই থেকে অতুলা বাগ্দীর সেই টিয়াপাখির অপেক্ষাতে বসে আছে, মামাবাবু কোথাও চলে গেলে সে টিয়াপাখির জন্য অতুলার ঘুন্টিঘরে চলে যাবে।

গ্রীষ্মকাল। বিকেলের দিকে গুমোট গরমটা ভয়ঙ্কর উৎকট লাগছিল। বৃষ্টি হচ্ছে না দীর্ঘদিন। এই জানালা থেকে অংশু এবং করুণা সামনের মাঠ দেখতে পাচ্ছে। মাঠ পার হলে স্টেশন। এবং দূরে রেল লাইন চলে গেছে। লাইনের ধারে ধারে হিজলের বন। আর বনের গাছগুলো থেকে সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। মাঠের ঘাস পাতা খরাতে পুড়ে গেছে। কোথাও জল নেই। জলের জন্য হাহাকার গ্রামে। শুধু দেবীবাবুর পুকুরে সামান্য জল আছে এবং তিনি জল ভালভাবে সংরক্ষণ করছেন। জল সাধারণ লোক ব্যবহার করতে পারছে না। বনমালী কিছুক্ষণ আগে নলের সাহায্যে জল তুলে সামনের গোলাপবাগানে ফুল ফোটাবার চেষ্টা করছিল। এখন সেই বনমালী বকুল গাছ থেকে ছেঁড়া সেই ছবিটা নিয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে।

নীচে বৈঠকখানায় কিছু লোক বসেছিল। খরাতে এই প্রথম দেবীবাবু সভাপতি হতে যাচ্ছেন—অংশু এবং করুণা দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে তা টের করতে পারছে। ওরা উভয়ে পরস্পরকে দেখল—বাবা চলে যাচ্ছেন,

মামাবাবু সড়ক ধরে মোষের গাড়িতে করে চলে যাবেন—মামাবাবুর ফিরতে রাত হবে—সুতরাং অংশুর অতুলা বাগ্দীর টিয়াপাখিটার কথা মনে পড়ে গেল।

ষ্টেশনের ও-পাশটায় মরা অশ্বত্থগাছটার নীচে কিছু লোক ঘুরে ফিরে গান গাইছিল। বৃষ্টির জন্য গান গাইছিল। ওরা বৃষ্টির জন্য তুকতাক করছিল। হিজলের বন থেকে পদ্মবনের সামান্য জলটুকু তুলে এনে শুকনো মাটিতে কাদা করে 'দম মাধা পাগলা মাধা'—ঠিক গাজনের অথবা শিব পার্বতীর বিবাহের উৎসবের মত বৃষ্টির জন্য গান গাইছিল।

দেবীবাবু মোষের গাড়িতে বের হয়ে গেলে অংশু আর করুণা চুপি চুপি বকুল গাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। গাছে একটা ফুল নেই, শেষ পাতাটাও আজ ঝরে গেল। দূরে সেই গাড়ির শব্দ এবং দেবীবাবুর খোশামোদপ্রিয় লোকগুলোর হাসির আওয়াজ সব মাঠ বন পার হয়ে চলে যাচ্ছে—গাছে একটা পাতা থাকছে না। দেবীবাবু একটা সমবায় সমিতির উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন এবং অশ্বত্থ গাছের নীচে সেই চাষা মানুষগুলো বৃষ্টির জন্য প্রাণপণ একনাগাড়ে নেচে ঢলে গান গাইছে।

অংশু এবং করুণা কিছুক্ষণ লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটল। ওরা সেই চাষা মানুষদের ঘিরে গিয়ে দাঁড়াল। রোদের উত্তাপ প্রচণ্ড। অংশুর মনে হল সেই গানের ভিতরে কোন এক বনের ছবি আছে—বনের ভিতর সেই পদ্মবনের কথা মনে পড়ে গেল—অতুলা একবার ওর ঘুন্টিঘর থেকে নেমে খোকাবাবুর হাত ধরে সেই পদ্মবনের ভিতর নিয়ে গিয়েছিল। অতুলা উলঙ্গ হয়ে পদ্মফুল তুলে এনেছিল অংশুর জন্য। অংশু অতুলাকে তখন বলেছিল, আমার বাবা কবে ফিরে আসবে অতুলা?

বাবার সম্পর্কে অতুলা কিছু বলত না। মুখে এক রাজ্যবিজয়ের হাসি থাকত। যেন অতুলার জন্য অথবা দুঃখী মানুষদের জন্য বাবা কোথাও এক নতুন রাজ্য সৃষ্টি করছেন। রাজ্য সৃষ্টি হলেই অতুলা অংশুর হাত ধরে পোষা ময়না পাখিটাকে নিয়ে সেখানে চলে যাবে।

দেবীবাবুর গাড়িটা খাল পার হয়ে বড় সড়কে পড়তেই অংশু মানুষের ভিড় থেকে সরে এল। ওর আর কোন ভয়ডর থাকল না। সে করুণার হাত ধরে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে ঢুকে ছুটতে থাকল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া দিচ্ছে বলে ধুলো উড়ছে। ঝরা পাতা উড়ে উড়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

হিজলের মাঠ থেকে বন্যার জলের মত রোদের উত্তাপ ভেসে আসছিল। সূর্য প্রাচীন অশ্বত্থের নীচে নেমে যাচ্ছে ক্রমশ।

গ্রীষ্মের দিন বলে মাটি তেতে আছে। শ্মশানের মত রুক্ষ মাঠ, চারধারের গাছগাছালি সব মৃত মনে হচ্ছিল। নদীর বালি খুঁড়ে বাগদী পাড়ার মেয়েরা জল আনছে মাথায় করে। প্রচণ্ড গরমের জন্য এবং খরার জন্য সূর্যের রঙ ধূসর দেখাচ্ছিল। অংশু হাঁটতে হাঁটতে বলল, ছাখ আমি কত লম্বা, সে তার সামনের ছায়াটাকে নির্দেশ করল।

করুণা বলল, ছাখ আমিও কত লম্বা। বলে দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মাঠের ভেতর নিজের ছায়ার পরিমাপ নিল। ছায়া দুটো মাল গুদামের রকে অথবা টিনের শেডে পড়ে ছোট বড় হয়ে যাচ্ছিল। ওরা এবার ছুটে সেই ছোট বড় ছায়াকে সমান করতে গিয়ে দেখল—খেতে না পেয়ে যে মানুষটা গতকাল এখানে গলা দিয়েছিল রেলের তলায় তার সামান্য রক্ত এখনও ছোট ছোট পাথরে লেগে রয়েছে। অংশু নুয়ে একটা পাথর তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে এখন। মানুষটার মৃত্যুর কথা ভাবতেই ওর বাবার কথা মনে আসছে। সুতরাং অংশু এই প্ল্যাটফরমের শেষ প্রান্তে চারিদিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকল—ঠিক তখন এক পাগল প্ল্যাটফরমে হেঁকে হেঁকে যাচ্ছিল—দি গ্রেট ক্যালকাটা শো…। সে হাতের তালুতে দি গ্রেট ক্যালকাটা শো সকলকে দেখাতে থাকল। হিয়ার ইউ সি—বলে হাতের তালুতে সে কঞ্চি দিয়ে খোঁচা মারল এবং সামান্য রক্ত ঝরল। মানুষ জমে যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্য যারা সামান্য জল কাদা করে গড়াগড়ি দিচ্ছিল তারা পর্যন্ত এখন এখানে উঠে এসেছে। 'গ্রামে শহরে তেল পাওয়া যাচ্ছে না' বলে পাগলটা মুখটাকে ব্যাঙের মত ক্লপ ক্লপ করে ব্যাদন করল। তারপর চোখ উল্টে লণ্ঠন নিবে যাবার মত ডিগবাজি খেল একটা। পাগলের কাণ্ড বলে কিছু লোক সরে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে পড়ছে। পাগলের কাণ্ড ভেবে প্রায় সব লোকই সরে গেল —শুধু অংশু এবং করুণা পাগলের কাণ্ড দেখে নড়ল না। সে লোকটার হাত ধরে ডাকল, এই এই, দেখ ট্রেন আসবে। তুমি ওঠো। বলে লোকটাকে টেনে তুলতে গিয়ে দেখল—সেই পাগল বাদামের খোসা চিবুচ্ছে আর গালভরা হাসি —যেন এই বাদামের খোসা খেয়ে নিত্য দিনের বেঁচে থাকা। সে খিল খিল করে হাসতে থাকল।

পাগলের হাসি দেখে করুণাও হাসছিল।

অংশু হাসছিল না। এবং যেই বুঝতে পারল করুণা—অংশু হাসছে না সেও হাসি থামিয়ে দিল।

অংশু বলল, হেঁটে চল। আমরা সেই ঢিবিটাতে দাঁড়াব।

করুণা নড়ছিল না।

অংশু ওর হাত টেনে বলল, চল। আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।

করুণা অংশুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর কি ভেবে বলল, কেন তোর এখানে ভাল লাগে না?

অংশু বলল, আবার লোক কাটা যাবে এখানে।

হ্যাঁ যাবে! কে বলছে? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলল করুণা।

—অতুলা বাগ্দী বলেছে।

—ঘুন্টিঘরের অতুলা বাগ্দী!

—হ্যাঁ ঘুন্টিঘরের অতুলা বাগ্দী।

—মানুষটা ভাল না। মানুষে মানুষে আবার যুদ্ধ হবে, বড়লোক গরীবলোক কেউ থাকবে না, মানুষটা কেবল তার গল্প করে।

অংশু বলল, মানুষটা খুব ভাল। অতুলা মানুষের দুঃখের কথা ব'লে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

—আমরা বুঝি করি না! বাবা বুঝি করেন না?

—মামাবাবুর কথা আমি জানি না করুণা। অংশু শুকনো গলায় কথাটা বলল।

—তবে তুই কার কথা জানিস?

—আমার কথা, বাবার কথা। বাবাকে কতদিন দেখি না।

—তোর বাবা আর আসবে না। রাগে দুঃখে করুণা কথাটা বলে ফেলল।

—কে বলেছে?

—বাবা বলেছেন।

অংশু আর কোন কথা বলল না। সে চুপচাপ রোদের ভিতর সেই ঢিবির উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল। করুণা পেছনে হাঁটছে। করুণা অংশুর পেছনটা দেখতে পাচ্ছে। হাতির দাঁতের মত রঙ অংশুর। গরমের জন্য পায়ে এবং

গলার কাছে ঘামাচি, লাল রঙের ঘামাচি। চুল ছোট করে ছাঁটা। নিরুদ্দিষ্ট পিতার জন্য অংশুকে বড় উদাস দেখাচ্ছিল। এই অংশুর জন্য করুণার ভেতরে বড় কষ্ট হচ্ছে। সে দৌড়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল। বলল, তুই রাগ করেছিস অংশু ?

অংশু জবাব দিল না। চুপচাপ হেঁটে গেল রেল লাইন ধরে। নীচের সড়ক ধরে গরুর গাড়ি যাচ্ছে, বউ যাচ্ছে এবং শাশুড়ী যাচ্ছে সঙ্গে। পেছনে একটা লোক হাতে লণ্ঠন—যাবার মুখে রাত হবে বলে সঙ্গে লণ্ঠন এনেছে—সে বউকে নিয়ে প্রসূতিসদনে যাচ্ছে।

করুণা বলল, বউটার বাচ্চা হবে অংশু।

অংশু বলল, আমার বাবা আবার আসবে, দেখিস আসবে।

এখন সূর্য অস্ত যাবার সময়। মাঠের জমিতে খরার জন্য বড় বড় ফাটল। মরুভূমির মত হাহাকারের দৃশ্য সর্বত্র। উত্তাপের জন্য মাটিতে পা রাখা যাচ্ছে না। রেল লাইনের নীচে হিজলের জমি এবং বন। দুঃখী মানুষেরা বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে ফিরছে। শরীর ওদের বিবর্ণ শুকনো এবং অন্নাভাব চোখে মুখে। কিছু পটলের জমি, জল হচ্ছে না বলে পটলের পাতা পেকে যাচ্ছে। ঝোপের আড়ালে চাষীবউয়ের মুখ—বাবুদের জমি থেকে পটলের পাতা চুরি করবে—মুখে আতঙ্কের ছাপ। ওরা যেতে যেতে এ-সব দেখল। আর দেখল বড় একটা কাঠের বোর্ড, ছোট একটা মাটির ঘর। জানালার নীচে কাঠের বোর্ডটাতে লেখা: এখানে লণ্ঠন মার্কা সার পাওয়া যায়। ঘরটার দরজা জানালা বন্ধ। কাঠের দরজার উপর খড়িমাটিতে লেখা—জমি না পেলে চাষামানুষদের চাষ হবে না, মাটির ভিতর দিনমান পড়ে না থাকলে, বৃষ্টিতে না ভিজলে, কাদার ভিতর ডুবে না থাকলে, মা বসুন্ধরা খুশী হবে না, আর মাটি যে ভালবাসার সামগ্রী—এমন সোনার অহঙ্কার চাষা মানুষের আর কি আছে। করুণা এবং অংশু লেখাটা বানান করে পড়ল। অংশু বলল, এ-ঘরটায় একটা বুড়ো মানুষ থাকত। মানুষটা মরে গেছে। মানুষটা না খেতে পেয়ে মরে গেছে। যেন এও বলতে পারত, মানুষটা মরে যাবার আগে দরজায় এ-কথা লিখে গেছে।

করুণা বলল, বুড়ো মানুষটাকে কেউ খেতে দিত না অংশু ?

—না।

—সে বাবার কাছে এল না কেন অংশু! করুণা বাবার সম্পর্কে উদার হতে চাইল।

অংশু যেন শুনতে পায় নি। সে বলল, কত কাক দেখেছিস? কত শালিখ দেখেছিস ঘরটার চালে?

করুণা দেখল কত কাক, কত শালিখ অথচ কোন কলরব নেই কাক শালিখের। ওরা যেন সেই বৃদ্ধের পরজন্মের ছবি দেখল। অনেক বৃদ্ধ এবং চাষাভূষা মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে এবং মরে গিয়ে কি কাক-শালিখ হয়ে গেল!

করুণা বলল, রেলে গলা দিলে কি হয় রে অংশু?

অংশু বলল, টিয়াপাখি হয়।

—না খেতে পেয়ে মরলে?

—কাক শালিখ হয়।

—আর যারা খুব খায় সারাদিন।

—ওরা কুকুর হয়।

—বাবা সারাদিন কত খায়। বাবা কুকুর হবে?

—মামাবাবু কি হবে অতুলা বলতে পারবে। বলতেই দেখল সব কাক শালিখ হিজলের বনে উড়ে যাচ্ছে। অংশু সেই পথে, অতুলার ঘুণ্টিঘরে পৌঁছে দেখল—ঘরে তালা দেওয়া। ভেতর থেকে ময়না পাখিটা চেঁচিয়ে বলছে, অতুলা বনে গেছে। হরে রাম কও। অতুলা বনে গেছে—হরে রাম কও।

রেল লাইন পার হলে হিজলের বন। অংশু এবং করুণা অতুলাকে খোঁজার জন্য বনের ভিতর ঢুকে গেল। ওরা কাঠুরেদের হাঁটা পথে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছিল। সূর্য অস্ত যাবে কিছুক্ষণের ভেতর—ওরা গাছ-গাছালির ফাঁকে সূর্য দেখবার চেষ্টা করল। বড় বড় শাল গাছের জঙ্গল। কিছু পিয়াল গাছ অথচ একটা পাতা নেই গাছে।

করুণা বলল, আমায় ভয় করছে অংশু।

অংশু বলল, কিসের ভয়। এই বনটা আমার চেনা।

করুণা ওর খুব কাছে কাছে থাকছিল—গা-টা কেমন ছমছম করছে অংশু।

—তুই কি রে! কত বড় বড় গাছ দেখছিস চুপচাপ সব দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ছাখ ছাখ বলে অংশু উপরের দিকে মুখ তুলে দিল।

করুণা নির্ভয়ে গাছ-গাছালির ফাঁকে উপরের দিকে তাকাল এত বড় বড় সব গাছ এবং ডালপালার ভিতর থেকে ওরা আকাশ দেখতে পাচ্ছে। সূর্যাস্তের আলো মরছে না। লাল রং মনে হচ্ছিল এই মৃত অরণ্যে সূর্যের এই রক্তক্ষরা শেষ আলো এক্ষুণি দাবানল সৃষ্টি করবে। কেবল দুই সরল বালক-বালিকার জন্য মৃত এবং অভিশপ্ত এই অরণ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে না। এবং কোথাও কিছু শ্যামল সবুজ অরণ্য এদের জন্য বিদ্যমান।

রেল লাইন ধরে মালগাড়ি যাচ্ছিল। পাশে ছোট্ট এক শ্যামল সবুজ পদ্ম-দীঘি। ওরা হেঁটে হেঁটে পদ্মবনে পৌছে যাচ্ছে। আর এ-সময়ে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, যেন এই উত্তপ্ত দিনের হাওয়া পদ্মবনের জল থেকে ভিজে উঠে ওদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। করুণাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। অংশু সরলমতি বালক, অংশুকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।—জানিস করুণা, বলে অংশু থামল এবং মাল-গাড়িটা ওদের অতিক্রম করে গেলে বলল, বাবা এই জঙ্গলের ভিতর কোথাও না কোথাও আছে। অতুলা বলেছে।

আর দেবীবাবু তখন গাঁয়ে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছিলেন। একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা। জমি ছোট ছোট আকারে চাষ করে এখন লাভ নেই। প্রতিবেশীদের সব এক হয়ে ফসল ফলাবার চেষ্টা করতে হবে। এক বিন্দু আবাদী জমি আমাদের কোথাও পড়ে থাকবে না। তারপর আবেগ দিয়ে বললেন, লণ্ঠন সার ব্যবহার করুন। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ জানা দরকার।

প্রসূতি-সদনের উপর স্বাধীনতার নিশান উড়ছে—দেবীবাবু বক্তৃতা করার সময় সেটা লক্ষ্য করলেন। তিনি এবার বললেন, লাঙ্গল যার জমি তার। তিনি গলার স্বর বদলে বললেন, স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের এখনও আসেনি। পাকিস্তান এবং চীন আমাদের দুই শত্রু। আমাদের অধিকাংশ আয় সামরিক ব্যয়ে চলে যাচ্ছে। কিছু মামুলী কথা বলে এবার দেবীবাবু তাঁর বক্তৃতা শেষ করার আগে একটু জল খেয়ে বললেন, দুর্ভিক্ষ আমরা কিছুতেই হতে দেব না। জয় হিন্দ।

তখন অতুলার ঘরে ময়নাপাখিটা সাদা গম খাচ্ছিল আর বলছিল শুধু—হরে রাম কও—হরে রাম কও।

তখন অংশু এবং করুণা বনের গভীরে কোন এক দুঃখী মানুষের কান্না যেন শুনতে পাচ্ছিল।

দেবীবাবু কপালের ঘাম মুছে বললেন, কি খরা যাচ্ছে দেখছ। ঈশ্বর, বাপু ঈশ্বর, আমাদের উপুস রাখছেন। বৃষ্টি নেই। বৃষ্টি আর হবে না মনে হচ্ছে। কি যে পাপ আমরা করেছি, ধরণী আমাদের ভার সহ্য করতে পারছে না, কি যে পাপ। কি যে পাপ বলতে বলতে তিনি পোষা বেড়াল অথবা কুকুরের মত লম্বা লাফ মেরে গাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন।

এ সময় কিছু চাষাগোছের মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। জমি বরগা পত্তনের জন্য দেবীবাবুকে ঘিরে ধরেছিল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, হবে হবে। আমার জমি তোর জমিতে তফাত কিরে সব ত তোদেরই। বিঘে পিছু এক মণ ধান পেলে তোদের অনেক হবে।

চাষা মানুষের আর কি কথা আছে, তারা ভাবে মাটির কথা, বর্ষার কথা এবং কখন নদীনালা ভরে যাবে, কখন ধানের জমিতে জোয়ারের জল আসবে, কখন দিনমান রোদে বৃষ্টিতে এই কালো অঙ্গ তীর্থের মত জলে কাদায় গড়াগড়ি দিতে পারবো! হায় মানুষের অঙ্গ!

অংশু আর করুণা সেই দুঃখী মানুষটিকে খুঁজতে আরও গভীর বনে ঢুকে যাবার মুখে দেখল এক পাগল বনের ভেতর থেকে ছুটে আসছে। ওরা ভয়ে বনের ভেতর দিয়ে ছুটতে না পেরে জলে লাফিয়ে পড়ল। সেই স্টেশনের পাগলটা এসে দাঁড়াল। করুণা ভয়ে অংশুকে জড়িয়ে ধরেছে। অংশু উলঙ্গ এই পাগলের গায়ে কিছু হিজি বিজি লেখা দেখতে পেল। পাগলটা ওদের দেখে খিল খিল করে হাসছে? অংশুর কি করে যেন সব ভয় উবে গেল। পাগলের হাসি দেখে ওর ভেতরের সব ভয় মরে গেল। অংশু শক্ত গলায় বলল আমরা অতুলাকে খুঁজতে এসেছি। অতুলাকে তুমি চেন না! অতুলা, ঘুন্টিঘরের অতুলা। মানুষটা একটা ময়না পুষে রেখেছে। তুমি চেননা অতুলাকে।

অতুলার কথা শুনেই পাগলটা স্প্রিঙ দেওয়া পুতুলের মত নাচতে থাকল। করুণার ভয় কমে আসছে। সে খুব সহজ হয়ে আসছিল। পাগলটা ঘুরে ফিরে নাচছে। পাগলটা নাচছিল এবং গান গাইছিল—বৃষ্টি নামার গান। মানুষটা এবার ওদের সামনে এসে, হাত পা পাছা এমনকি বগলের তলায় কি লেখা আছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল। মানুষকে অংশুর ভয় নেই। সুতরাং লেখাগুলো পড়ার জন্য অংশু করুণার হাত ধরে পাড়ে উঠে দেখল বুকের উপর পাগল মানুষটার এক উটের ছবি, নীচে মরুভূমির মত ছবি আঁকা। পিঠের

পাশ থেকে পাছার নীচে এবং আরও নীচে একটা বড় মিছিলের ছবি ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এত বড় একটা মিছিল এবং সামান্য এক উটের ছবি নিয়ে মানুষটা—অংশু মানুষটাকে দেখছিল—মানুষটার হাতে দু মুঠো গম—মানুষটা একটা একটা গম মুখে ফেলে ভীষণভাবে চিবুচ্ছিল। এখন কোন কথা বলছে না! অথচ হাতের গম শেষ হচ্ছিল না, লোকটা গম চিবুচ্ছে, লোকটা উলঙ্গ—দুমুঠো গম হাতে রেখে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিল যেন। বৃষ্টি হলেই বীজ রোপণ করে ফসলের পুণ্য ঘরে তুলবে।

করুণার সাহস বেড়ে গেছে। সে দেখল ওদের পথ আগলে আছে পাগল মানুষটা। সে যাবার পথ করার জন্য পাথর তুলে ঢিল ছুঁড়ল। আর পাগলটা তখন ভয়ে যেন ছুটছে। ওর হাঁক শোনা যাচ্ছে। সেই হাঁক বনের গভীরে দুঃখী মানুষের কান্নার মত শোনাচ্ছিল।

অংশু বলল, যাবি পাগলাটাকে খুঁজতে?

—কতদূর?

—কতদূর আর হবে। আমরা হেঁটে হেঁটে বনের ও-পাশটায় ওর কুঁড়েঘরে চলে যাব।

—তুই জানিস ও কোথায় থাকে?

—বারে জানব না! অতুলা আমাকে সব বলেছে। বন পার হলে, নদী পার হলে চন্দনের গাছ আছে বড়, সেই গাছের নীচে মানুষটার তালপাতার ঘর আছে। সামনে মাঠ। কত ফুল কত পাখি। মাঠে এখন খরা বলে ছোট বড় সাপ আছে।

করুণা এখন অংশুর দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। অংশু এখন বনের ভিতর সেই পাগল মানুষটার মত কথা বলতে চাইছে। সে যেন ওকে ফেলে বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাবে। সে তাড়াতাড়ি অংশুর হাত ধরে ফেলল এবং বলল, তুই যে বললি, অতুলা বাগ্দীর ঘুন্টিঘরে যাবি। সে তোর জন্য পাখি ধরে রাখবে, টিয়াপাখি!

—অতুলা বাগ্দীর ঘুন্টিঘরে যেতে আমাদের রাত হবে করুণা।

—আমরা ছুটে ছুটে যাব।

—তুই পারবি করুণা? আমার সঙ্গে ছুটে যেতে পারবি?

করুণা ঘাড় নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অংশু ছুটতে চাইলে বলল, 'হ্যাঁরে অংশু

আমাদের জামা প্যাণ্ট সব ভেজা। ভেজা জামা প্যাণ্ট দেখলে বাবা বকবে, মাসী বকবে।

সামান্য শুকিয়ে নিতে পারলে ভয় থাকবে না। ওরা জামাটা হাওয়ায় বাদামের মত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল—তখন অতুলা ফিরছে বনের ভিতর থেকে। ওর শরীরে তেমন আবরণ নেই। সে কোন এক গেরস্থ মানুষের পানবাটা চুরি করে গোপনে উলঙ্গ হয়ে এক শ্বাসে দৌড়ে গেছে এবং বনের গভীরে মৃত গাছের ডালে বাটাটা বেঁধে রেখেছে বৃষ্টির জন্য। বাটা রেখে ফের ঘুন্টিঘরে ফেরার সময় দেখল বাবুদের বাড়ির খোকাবাবু, বাবুদের বাড়ির মেয়ে করুণা।

অতুলা বাগ্দীকে দেখে ওরা দুজনই সম্মোহনের মত হাঁটছিল। অতুলার কাঁধে লম্বা বাঁশ। বাঁশের মাথায় এক টিয়াপাখি। সে ফেরার পথে বন থেকে টিয়াপাখি ধরে ফিরেছে।

এখন অংশু করুণা আর অতুলা হাঁটছে। অতুলা আজ ওদের দেখে এতটুকু সম্মান মোতাবেক কথা বলল না। যেন অংশু এবং করুণা বনের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল—সে তাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আর দেবীবাবু যেতে যেতে লক্ষ্য করলেন—এত বড় গ্রাম, এত ঘর এবং সংসার অথচ কোথাও সন্ধ্যার পর আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে গ্রাম মাঠ বড় বেশী ডুবে আছে। বিন্দু বিন্দু আলোর আশা করছিলেন তিনি। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পথ অন্ধকার। গাড়ির নীচে লণ্ঠনটা দুলছে। এবং গাড়ির ভিতর তিনি টেস্ট রিলিফের টাকা গুনছিলেন এক দুই করে। অন্ধকারে বসে টাকা গোনার অভ্যাস তাঁর যেন কতকালের। চুরি থেকে প্রাপ্য টাকা নিজের জন্য কিছু এবং ফাণ্ডের জন্য। তিনি সন্তর্পণে টাকাটা অন্ধকারেই বনমালীর হাতে তুলে দিলেন।

বনমালী বলল, এ-টাকা কোন হিসাবের ?

দেবীবাবু বললেন, এ-টাকাটা ৮নং হিসাবের। টাকাটা গাড়িতে ওঠার সময় পঞ্চানন দিল।

বনমালী বলল, ও কিন্তু বাবু একজন মজুরের চারটা টিপ নেয়।

দেবীবাবু বললেন, ওর উন্নতি সহজে হবে বনমালী। এ সময়ে ওরা কোথাও যেন তরুণ যুবকদের হল্লা শুনতে পেল। এদিকের গ্রামগুলোতে পুলিশের টহল। দেবীবাবু ভাবলেন এই দুঃসময়ে এতদূর আসা উচিত হয়নি।

শুধু অন্ধকার চারিদিকে। কেবল মনে হচ্ছিল এক ভয়ঙ্কর 'আক্রোশে ক্রমশ সাধারণ মানুষ ফেঁপে ফুলে আছে। যে কোন মুহূর্তে মাঠময় তাদের হাতে মশাল দেখা যাবে। দেবীবাবু ভয়ে ক্রমশ গুটিয়ে আসতে থাকলেন। টাকাটা বেহাত হবার ভয়ে তিনি বনমালীকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, আমার কাছেই থাকুক। বলে অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে দিলেন।

অংশু এক সময় বলল, অতুলা, রাত হয়ে গেল। বাড়ি না ফিরলে মামাবাবু যে বকবে।

করুণা বলল, হ্যাঁ অতুলা, বাবা হয়ত এতক্ষণে ফিরে এসেছেন।

অতুলা ওদের কথা শুনে ডান কাঁধ থেকে সরু বাঁশটা বাঁ কাঁধে নিয়ে বলল, বাবু গরীব লোক খেতে না পেয়ে সব মরে যাচ্ছে, বলে সে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে থাকল।

অংশু বলল, কি দেখছ অতুলা ?

অতুলা বলল, বৃষ্টির জন্য আকাশ দেখছি। গাছে একটা পাতা নেই। খোকাবাবু মেঘ দেখা গেছে আকাশে আর একটু সবুর করুন।

ওরা তিনজন বৃষ্টির জন্য হাঁটছিল। অতুলা এবার টিয়াপাখিটাকে আকাশে উড়িয়ে দিল। পাখিটা আকাশে উড়ে যাবার সময় ওরা তিনজন দেখল— আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে। ঘন বর্ষণ হতে দেরি নেই। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। এবং এক সময় মাঠ ঘাট ভাসিয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

অতুলা, অংশু, করুণা আর সেই পাগল মানুষটা কোত্থেকে হাজির হয়ে— বনের ভিতর দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাঁটতে লাগল। ওদের শরীরের সব লেখা ধুয়ে মুছে গেছে। টিয়াপাখিটা বৃষ্টির জন্য আকাশে উড়ে গিয়েছিল—বৃষ্টি হওয়ায় সে ফের ফিরে এসেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল এবং সে আলোয় তারা সহসা দেখতে পেল এক প্রাচীন অশ্বত্থের নীচে একটা বড় মোষের গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বজ্রপাতে মোষ দুটো এবং মানুষ দুটো মারা গেছে। মোষ দুটো মানুষ দুটো যেন এক হয়ে গেছে। দূরের কিছু লোক লণ্ঠন হাতে ফিরছিল—ওরা ভয়ে ছুটে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। ওরা চিৎকার করছিল— দেবীবাবু বজ্রপাতে মারা গেছেন।

পাগল ওর লাঠি দিয়ে দেবীবাবুকে উল্টে দিতেই দেখল, দেবীবাবু দুহাতে কি যেন বজ্রপাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন—পারেন নি, সব পুড়ে গেছে।

ঘন বর্ষণে মাঠ ঘাট ভেসে যাচ্ছিল। কোথাও একটা মোরগ ডাকছিল। করুণা কাঁদছিল। বাপের জন্য কার না কষ্ট হয়। আর পাগল বলছিল, মোষে মানুষে এক হয়ে যাচ্ছে।

নরকে আগমন

যে গ্লানিটুকু এই জমির ভিটেমাটির স্পর্শে করুণ হয়েছিল, যা কিছু খড়-কুটোর চিহ্ন বর্তমান ছিল, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা এবং ঘূর্ণি হাওয়া সকল গ্লানিকে, সকল চিহ্নকে নিঃশেষে মুছে দিল। এই জমির পাশে সরু কাঁচা পথ—অন্য এক বস্তি। এক বালক জানালাতে প্রত্যাশিত চিত্রের মত। সে ভোর থেকে সকল ঘটনার সাক্ষী ছিল। সুতরাং যখন সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেছে, যখন রুগ্ন পাকুড় গাছে শহরের পাখিরা এসে আশ্রয় করছে তখন সে ক্লান্ত গলায় ডাকল, মা, মাগো!

একফালি ঘর। এই প্রথম একফালি বিকেলের রোদ এসে ঘরময় যেন পায়চারি করছে। সে জানালায় বসে বসে প্রত্যক্ষ করছিল সরু কাঁচা পথ অতিক্রম করে সূর্যের আলো ওর ঘরে প্রবেশ করেছে। বৃষ্টির তাজা গন্ধ রোদের রঙে। সে হাত তুলে যেন রোদের রঙকে স্পর্শ করতে চাইল। পাশে হোগলার বেড়া দেওয়া নিকৃষ্ট অবয়বের বস্তি, কিছু পূর্ববঙ্গের মানুষ। ওরা এখন নেই। সরকারের গাড়ি এসে, পুলিস এসে সকল ঘর ভেঙেছে, দানবের মত যন্ত্রটা সারাদিন গর্জন করছিল। কিছু কান্না এবং অস্পষ্ট কোলাহল ভোরের দিকে ছিল, দুপুর পর্যন্ত পথচারীদের একটা সাধারণ রকমের ভিড়—তারপর বৃষ্টি আর বৃষ্টি, ঝড়। উদ্বাস্তু মানুষের স্মৃতিকে লালন করার ইচ্ছায় বৃষ্টি, ঝড় যেন সবুজের ঘর তৈরি করছে মাঠে।

দুপুরের পর পুলিস, গাড়ি এবং পথচারীদের ভিড়টা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। সে দেখল—ঝড় বৃষ্টি থামলে অথবা সময় অতিবাহিত হলে একফালি রোদ ওর জানালায় এসে পড়েছে। যে অপার বেদনা ভোর থেকে মনে আশ্রয় করে গুমরে মরছিল, এই উজ্জ্বল আলোকে সে সকল বেদনা নিঃশেষ হয়ে গেল। জীবনের প্রথম এই উত্তাপ নির্মলকে চঞ্চল করে তুলছে। সে রোদের উজ্জ্বল রঙ দর্শনে হাঁটবার স্পৃহাতে পায়ে হাত রেখে কিছু উচ্চারণ করেছিল। যেন সে বলতে চাইছিল, ঈশ্বর আমি ওদের (উদ্বাস্তু) মত এই পথ ধরে অন্য কোথাও হেঁটে যেতে পারি না। ওদের মত নিরুদ্দিষ্ট হতে পারি না। সে তার

দেহকে এই রোদের রঙে নিমজ্জিত করার জন্য দেয়াল ধরে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের মেঝেতে পড়ে গেল—মা, ও মা!

চারুবালা অন্য ঘরে প্রসাধনে ব্যস্ত। সুতরাং আয়নায় প্রতিবিম্ব রেখে একমাত্র সন্তানের কণ্ঠস্বর শুনল। এই স্বরে সে যেন নিদারুণ বিরক্ত। সে বলল, 'নিমু, তুমি এই অবেলাতে কাতরাচ্ছ কেন?'

তুমি এস। আমি নীচে পড়ে গেছি।

চারুবালা প্রসাধনের কৌটা ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে এবং মুখে হতাশার চিহ্ন এঁকে দৌড় দিল। ঘরে ঢুকে বলল, 'কেন, কেন তুমি ফের দাঁড়াবার চেষ্টা করলে?' চারুবালা তাড়াতাড়ি নির্মলকে কোলে তুলে নিল। বড় ভার এই শরীরের। সে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্মলকে তক্তপোশে তুলে দিয়ে বলল, 'জানালায় বসে থাক। দাঁড়াবার চেষ্টা করো না। ভগবান একদিন চোখ তুলে তাকাবেন।'

এ-সময় অন্যান্য ঘরে, অথবা গলির মোড়ে এবং অন্য অনেক অন্ধকারে সকল বালার দল প্রসাধনে ব্যস্ত। ওরা চুরি করে কেউ ঘরে, কেউ শহরের আলোয় আলোয় সঙ্গী খুঁজে খুঁজে অভাবে অনটনে ইচ্ছার পরমায়ুকে বাড়াবে। যখন চারুবালার একান্ত ত্বরান্বিত হওয়ার কথা তখনই কিনা এইসব বিরক্তিকর ঘটনা। অথচ জানালায় রোদ, চারুবালার খুশী হওয়ার কথা—দীর্ঘ পনের বছর ধরে ঘর-সংলগ্ন জীর্ণ দেয়ালগুলি এই ঘরে সূর্যের উত্তাপ প্রবেশ করতে দেয়নি।

চারুবালা বলল, 'নিমু এই ঘরে এত রোদ।'

নির্মল চারুবালার বুকের কাছে মুখ রেখে বলল, 'মা, আমরা কবে যাব? কখন তুমি আমাকে জলছত্র করে দেবে?'

চারুবালা কোন জবাব না দিয়ে উঠে গেল। নির্মল তেমনি জানালাতে বসে থাকল। বৃদ্ধ নসু বারান্দায় কাক তাড়াবার মত শব্দ করছে। পাশের ঘরে প্রতিদিনের মত তেমনি খুটখুট শব্দ তারপর দূরে দূরে যুবতীর কণ্ঠস্বর, ইতস্তত ফিসফিস কথাবার্তা, বড় রাস্তায় মোটর, বাস, ট্রামের শব্দ এবং রেল-পুলে একটা এনজিন চলতে চলতে থেমে গেল। মা এ-সময় নসুকে বললেন, 'নসু আমি যাচ্ছি। কৌটোয় সন্দেশ আছে। ওকে দিও।' নির্মল দেখল, তখন দূরে পার্কের বিচিত্র সব গাছগুলোতে সূর্যের শেষ রঙ। আকাশে কিছু

পাখি উড়ছে। এতবড় আকাশ তার জীবনে এই প্রথম। এতবড় আকাশ দেখে মায়ের বর্ণিত সেই সবুজ প্রান্তরের কথা মনে হল, তরমুজ খেতের কথা মনে হল। বড় রাস্তার ধারে ছোট্ট নীল রঙের বাড়ি। কয়েতবেল অথবা কামরাঙা গাছের ছায়া, নির্জন প্রান্তরে ছোট নদী ফটিক জল—দূর থেকে আগত সব তীর্থযাত্রী, নির্মল জলছত্র খুলে তৃষ্ণার জল দিচ্ছে সকলকে। এতবড় আকাশ দেখে ওর ফের হাঁটতে ইচ্ছা হল। মাগো, আমাকে তোমার সেই ফেলে আসা দেশে নিয়ে চল।

নির্মল ওর পঙ্গু পা দুটোতে ভালবাসার হাত রাখল। মা চলে গেছেন। বড় রাস্তার বাস ধরে মা কোথায় চলে যান। কারখানার ঘড়িতে সাতটা বাজে, আটটা বাজে, দশটা বাজে—নির্মল ঘুমোতে পারে না। মার জন্য কষ্ট হয়। মা আসবেন। দরজায় শব্দ হবে। মা খুব আস্তে কড়া নাড়বেন। নির্মল জানালাতে বসে থেকে বড় রাস্তার সব গাড়ির শব্দ শুনে কখনও উৎকর্ণ, কখনও উদ্বিগ্ন। নর্দমার পচা গন্ধ এই ঘরে এবং সর্বত্র—জানালায় বসে বিকেলের গাঢ় রঙ দেখে নির্মল এইসব ভাবল। ঘর-সংলগ্ন উদ্বাস্তু পল্লীর কোন চিহ্ন নেই। সামনে একটা মাঠের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জন্য মাঠ, ঘাস এবং পথ ভিজা।

এই মাঠে নির্মল সোনাপোকা উড়তে দেখল। তখন বড় রাস্তায় একটা বাস ভয়ানকভাবে ফুঁসে উঠল। রাস্তায় কোলাহল। লোকজন ছুটছে। বস্তির সকল নারীপুরুষ রাস্তার মোড়ে এসে ভীড় সৃষ্টি করছে। এবং কোন দুর্ঘটনার কথা সকলের মুখে মুখে। নির্মলও যতটা পারল জানালা দিয়ে গলাটা বের করে বড় রাস্তাটা দেখতে চাইল। অংশত দৃশ্যমান রাস্তার উপর ইট পাটকেল ছুঁড়ছে, যেন কারা। বাস ড্রাইভার ছুটে পালাচ্ছে। পুলিশের গাড়ি ছোঁ মেরে লাশটা নিয়ে পথটাকে নির্জন করে উধাও। আবার ট্রাক বাসের শব্দ। লোক চলাচল করছে। নির্মল পা দুটোতে ভালবাসার হাত রেখে বলল, নসু আমার এই ঘর ভাল লাগছে না। আমি কোথাও চলে যাব নসু। যেন আরও বলার ইচ্ছা: আমার এই পঙ্গু পা নিয়ে নির্জন কোন প্রান্তরে লাল নীল কাঠের ঘরে দূর থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য জলছত্র খুলব। নসু তুমি শুধু মাটির বড় বড় জালাতে জল ভরে রাখবে।

কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবে গেছে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের আলো। বড় রাস্তায় লাইটপোস্টের আলো নর্দমা অতিক্রম করে কোন কোন ঘরের দাওয়ায়

হাওয়ায় এসে পড়েছে। পচা গন্ধটা অনবরত এই বস্তি-অঞ্চলকে আবিলতায় ঢেকে রুক্ষ এবং রুগ্ন করে রাখছে। অথচ চায়ের দোকানে ভাঙ্গা টেবিলে সংবাদপত্র এবং বুভুক্ষু লোক সব এই সংবাদপত্র পাঠে জঠরে মন্দাগ্নি সৃষ্টিতে সচেষ্ট। সন্ধ্যার পর বস্তির সদানন্দ শ্রমিক খড়ম পায়ে খট খট করে নির্মলের জানালা অতিক্রম করবে। চায়ের দোকানে বসে উচ্চস্বরে পত্রিকা পাঠ করবে। নির্মল স্বল্প আলোতে বসে বসে এই সংবাদপত্র পাঠে উত্তেজিতদের, বিঘ্নসৃষ্টি-কারীদের, কথাবার্তা কিছু শুনতে পারে। পৃথিবীতে এত সব হচ্ছে অথচ আমার পা দুটো ভাল হচ্ছে না কেন? মা রোজ এত রাত করে আসে কেন? মানুষের পরমায়ু বাড়ছে (সদানন্দের পত্রিকা পাঠ থেকে সে ধরণীর সকল খবর রাখছে) অথচ আত্মহত্যা, অকালমৃত্যু কমছে না, আমরা সকলে খেতে পাচ্ছি না, নসুটা একবেলা খেতে না পেলে কাঁদে। মার বিষণ্ন চোখ তখন ভয়ানক, ভয়ানক ইতর। সদুকা তুমি চেঁচিয়ে পত্রিকা পাঠ করো না। এ-সময় মার সম্বন্ধে ওর একটা ভয়ানক অসুস্থ চিন্তা মনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলে নির্মল বড় রকমের একটা হাই তুলল। বৃদ্ধ নসু বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। কোথাও কোন অন্ধকারের গহ্বরে যুবতীর কণ্ঠ যেন স্তিমিত এবং ইচ্ছার পরিপাকে সকলকে ভোগাচ্ছে। নির্মল শুয়ে এই সব শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কারখানাতে কোন শব্দ উঠছে না। রেললাইনে এখন কোন গাড়ি চলছে না—বড় রাস্তায় বাস-ট্রাকের যাতায়াত কমে আস। আজ বিকেলে ওর জানালায় রোদ এসেছিল—সে কাল থেকে রোদে পা রেখে বসে থাকবে, তারপর পায়ে শক্তি সঞ্চয় হলে সে একদা হেঁটে হেঁটে এই ধরণীর সব সুখ দুঃখকে অতিক্রম করে লাল নীল কাঠের ঘরে চলে যাবে।

রাত যত ঘন হয়, ভিন্ন ভিন্ন দুঃখবোধ নির্মলকে তত গ্রাস করতে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই সব দুঃখবোধ বাড়ছে। এই তিনজনের সংসারে মা সব এবং সকল কামনার প্রতীক। নসু সম্পর্কে কি হয়! কালো কুঞ্চিত মুখে নসুর বীভৎস গহ্বর, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে অশিষ্ট দুর্গন্ধ নসুকে মা কতদিন ধরে মারধোর করে—এই সব নির্মলের ভাল লাগে না। মার এই রাত করে ফেরা সম্বন্ধে নসুকে কিছু প্রশ্ন করতে ভয় পায়। সুতরাং এ-সময় সে কেমন বিপন্ন মানুষের মত ডেকে উঠল ফের, 'মা!' পনের বছর ধরে এই এক আবদ্ধ ঘর একফালি জানালা, দুটো ক্যালেণ্ডার একটা তাকে কিছু

রকমারী ওষুধ,, কিছু নতুন-পুরানো বই—যা সে এত পড়েছে, কণ্ঠস্থ স্তবকের মত—সে এখন ইচ্ছা করলে সকল পাঠ উগলে দিতে পারে।

নির্মল বালিশে মুখ ঢেকে পড়ে থাকল। নসু ওকে দুটো রুটি, একটা কাঁচা পেঁয়াজ, একটু আলু-পটলের ডালনা খেতে অনুরোধ করেছিল—কিন্তু নির্মল অরুচিতে ভুগছে এমন মুখ নিয়ে বলেছিল—নসু, আমি মার সঙ্গে খাব। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। নসু শোবার আগে একটু তেল মালিশ করে দিল নির্মলের পায়ে। কবিরাজী তেলটার গন্ধ এখন এই ঘরে। মা এখনও ফিরছেন না। নির্মল বালিশে তেলের গন্ধ নিতে নিতে যখন ঘুম আসবে না ভাবল, যখন দেখল অন্যান্য দিনের চেয়ে আকাশে অনেক বেশী নক্ষত্র এবং সাদা আকাশ, তখন জানালায় বসে কয়েকটি কণ্ঠস্থ স্তবক আবৃত্তি করতে থাকল : "মুনি বলে শোন রাজা পাণ্ডব চরিত্র। যাহার শ্রবণে হয় জগত পবিত্র।' এ-সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সে সচকিত হল। মা ঘরে ঢুকলে বলল, 'আমি মহাভারত আবৃত্তি করছিলাম।'

চারুবালা বিপর্যস্ত শরীরটা ভয়ানক কষ্টে এ-ঘর পর্যন্ত টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। সে নির্মলকে আদর করবে ভেবে বিছানায় উঠেও বসেছিল—কিন্তু কোন যুবকের প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন এই শরীরের সকল স্থান বহন করছে। সে আর বসে থাকতে পারছে না। কিছুক্ষণের জন্য নির্মলের পায়ের কাছে পড়ে থাকল। নির্মলের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারল না অথবা বলতে পারল না—কাল বিকেলে আমাকে মহাভারত আবৃত্তি করে শোনাবে, আমি কোথাও যাব না। আমি তোমার পায়ের কাছে বসে মহাভারত শুনব।

নির্মল মাকে এ-ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে মাথায় হাত রাখল এবং ডাকল, 'মা, মাগো!'

কোত্থেকে কতক পায়রা উড়ে এসে বসল মাঠটাতে। ফাঁকা মাঠ পেয়ে অহেতুক বকম বকম করছে। এক পাশে পচা হোগলার স্তূপ। বস্তির কিছু বেওয়ারিশ কুকুর এবং বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু ঘাসের চারা উঁকি দিচ্ছে এখন। বেড়াল দেখে অথবা কুকুর দেখে পায়রা উড়ছিল, পাশের রুগ্ন পাকুড়গাছে বসেছিল। বুড়ো লোকটা এসে প্রতিদিনের মত নিজের বাসস্থানের মাটিটুকুতে হাত রাখল, উত্তাপ নিল মাটির। নির্মল দিন দিন এই মাঠে নতুন সব আগন্তুকদের দেখে খুশী হচ্ছে। এই মাঠই যেন তার

সেই নির্জন সবুজ প্রান্তর অথবা লাল নীল কাঠের ঘর। ছোট্ট নদী অথবা ফটিক জল। সে বুড়োকে ডেকে বলল, 'দাদু মাটিতে ঘাস গজাচ্ছে তোমার ভাল লাগছে না!'

তারপর একদিন নির্মল জানালা থেকে দেখল বস্তির সব উলঙ্গ শিশুরাও এই সবুজ মাঠকে আবিষ্কার করে নিজেদের মত করে নতুন এক রাজ্য সৃষ্টি করছে। বস্তির কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের মত করে একটু জায়গা চেয়ে নিল যেন। অথচ বুড়োলোকটা নিজের জায়গাটুকু ছাড়ছে না। এই মাঠ, ঘাস এবং বস্তির এই খুশির সংসার দেখে একদা নির্মল নিজের প্রিয় জলছত্রের কথাও ভুলে গেল। কারণ ফ্রক-পরা টগর এসে বলেছিল: তুমি আমাদের রাজা গো। তোমাকে ছুঁয়ে আমরা বুড়ি ধরব।

শ্যামলা রঙের মেয়ে টগর। কানে দুল ছিল পিতলের মাথায় ঘন চুল ছিল, চোখ ছোট অথচ নাকের গড়ন যেন 'তালপাতার এক বাঁশি'। সূর্যের রঙ তেমনি বিকেলের মত। নর্দমার পচা গন্ধ বৃষ্টির জলে ভিজে আরও স্যাঁতসেঁতে। টগর ছোট চোখ বড় করে বলেছিল, কি গো কিছু যে বলছ না?

নির্মল অন্য কথা বলল, 'একদিন আমাকে এই মাঠে নিয়ে বসাবে? বড় রাস্তাটা কোথায় গেছে দেখব।'

টগর বলল, 'রাস্তাটা বারাসত গেছে। তারপর নদী।'

—টগর, মা বলেছেন আমি ভাল হলে নদী পাহাড় সমুদ্র দেখব। মা আমাকে তীর্থে তীর্থে নিয়ে যাবেন। আমি ঠিক ভাল হয়ে উঠব।

টগর জানালার উপর থুতনিটা চেপে বলল, সকলে যে বলছে তুমি আর কখনও ভাল হবে না!

নির্মল টগরের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মা বলেছে আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠব। ডাক্তার বলেছেন, আমাকে খুব ভাল খেতে দিতে হবে। মা তার জন্য প্রাণপাত করছেন।

—সকলে যে বলছে তুমি ভাল হবে না। টগর কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

—কেন ভাল হব না! জানালা ছেড়ে সরে দাঁড়াও, ঘরে আলো ঢুকতে দাও।

টগর জানালা থেকে সরে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ভাল হ
আমি খুব খুশী হব।'

সবুজ ঘাস এখন এই মাঠে। কিশোর-কিশোরীরা নাচছে অথবা ছুটছে। টগর ওদের ভিতর রাণীর মত। শহরের এই ঘন বস্তি-অঞ্চলে ছোট একখণ্ড জমি আবিষ্কারে ওরা চঞ্চল। একটি রুগ্ন পাকুড়গাছ এবং রাজ্যের বিচিত্র পাখির আশ্রয়—এই অঞ্চলকে স্বার্থপর দৈত্যের হাত থেকে কোন এক ঈশ্বর যেন নিয়ত রক্ষা করছেন। নির্মলের ইচ্ছা হল জানালা অতিক্রম করে ঘাসের নরম আশ্রয়ে অথবা কলের শব্দ শোনার জন্য দু পায়ে ভর দিয়ে কিংবা রুগ্ন পাকুড়গাছটার নীচে বসে সকল পাখির ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। নির্মল জানালাতে হাত রাখল। সকল কিশোর-কিশোরীরা ওর হাত স্পর্শ করে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরছে ঘোড়ার মত ছোট ছোট পায়ে, কদম দিচ্ছে। রোদ তক্তপোশ থেকে দেওয়ালে উঠে যাচ্ছে। পা দুটোকে সে শুইয়ে রাখল রোদে। সূর্যের উত্তাপে প্রাণ সঞ্চারের আশায় সে বসে থাকল। যখন ওরা ছুটছে, যখন ওরা বুড়ি স্পর্শ করার জন্য প্রাণপণ ছুটছে তখন নির্মল উত্তেজিত হতে থাকে। আহা ওদের দু পায়ে ঘোড়ার পায়ের মত সামর্থ্য। ওরা যত ছুটছে নির্মল তত এক প্রগাঢ় অনুভূতির উত্তাপে কাঁপতে থাকল। আকাশ এত নীল, পথ এত শব্দময়, কারখানার পাশে এক পাগল চিত্রকর। এই জানালায় নির্মলের—মুখ তারপর বড় রাস্তা ধরে বাস, ট্রাক, ট্রামগাড়ি ছুটছে।

—এই বিকেলে গগনভেরী পাখিদের ডাক কোথাও শোনা যাচ্ছে না গো। নন্থ বারান্দায় বসে কাঁদবার ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল।

টগর জানালায় এসে বলল, 'রাজা, সন্ধ্যা হয়েছে, এবার আমরা যাব।'

সন্ধ্যা হল বলে সকলেই চলে গেল। সেই বুড়ো মানুষটা শুধু বসে আছে। এটা ভাদ্র মাসই হবে, কারণ গরম মাঝে মাঝে কম মনে হচ্ছিল। আকাশ মাঝে মাঝে নীল অথবা একান্ত স্বচ্ছ। আর আশ্বিনের মাঝামাঝিতেই নির্মল একদিন দেখল টগর মাঠে নেই। সকলে এল অথচ টগর এল না। ভেবেছিল টগরকে আজ সহসা সুখবর দিয়ে খুশী করবে। টগর আমি ভাল হয়ে উঠছি, পায়ে যেন শক্তি হচ্ছে। নির্মল কোথাও ঢাকের শব্দ শুনল। কোথাও ঢোল বাজছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি—অনেক দূরে সানাই বাজছে।

প্রতিমা বোধনের বাজনা বাজছে অথচ টগর নেই। এই ক'মাস প্রতি বিকেলে নির্মল টগরের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকত—কখন বিকেল হবে, কখন সূর্যের রঙ ফ্যাকাশে হবে, কখন সকল পাখ-পাখালীরা রুগ্ন পাকুড় গাছটায় এসে আশ্রয় নেবে এবং সকল ছেলেমেয়ের দল হইহই করতে করতে ছুটবে, নাচবে, খেলার ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ প্রকাশ করে এই মাঠের নির্জনতাকে ভেঙ্গে দেবে। নির্মল সহসা ভাবল, কবে যেন টগর বলেছিল, বিদ্যাসাগরের জন্ম মেদিনীপুরে বীরসিংহগ্রামে।

তখন ছোট একটি ছেলে এসে নির্মলের জানালায় দাঁড়াল। বলল, 'টগর বাঁচবে না। ওর কলেরা হয়েছে।' সেই বিকেলে কিছু শ্রমিক এল কাঁটাতার নিয়ে। কিছু থাম গেঁথে দিল মাঠের চারপাশটাতে। ওরা বুড়ো লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে চায়ের দোকানের সামনে রেখে গেল। তারপর কাঁটাতার দিয়ে মাঠটাকে ঘিরে ফেলল। বস্তির উলঙ্গ শিশুরা, কিশোর-কিশোরীরা বিষণ্ণ চোখে এই সব ঘটনা দেখছে—কোন প্রতিবাদ করতে পারছে না। প্রিয় মাঠের এই দুঃসহ বন্ধনে ওরা কেমন এক দুঃখবোধে পীড়িত হতে থাকল। ওরা একটু হেঁটে এসে নির্মলের জানালায় ভিড় করল। বলল, তুমি কিছু বলছ না। ওরা যে কাঁটাতার দিয়ে মাঠকে ঘিরে দিল।

নির্মল কোন জবাব দিল না, সে সকলের মুখ দেখছে শুধু। এ দুঃখ তার নিজেরও। সকলের মুখ দেখে সে বিহ্বল হতে থাকল। টগর নেই। টগরের কলেরা হয়েছে। সোনাপোকা উড়ছে না মাঠে। বৃদ্ধ লোকটি চায়ের দোকানে বসে অশ্লীল কথাবার্তা বলছে। সদুকা আসছেন খড়ম পায়ে। এখন তিনি উচ্চস্বরে পত্রিকা পাঠ শুরু করবেন। বড় রাস্তার মোড়ে গাড়ি পার্ক করার শব্দ। একজন রাজাবাহাদুরের মত ব্যক্তি, গাড়ি থেকে নেমে চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দু' আঙুলে তুড়ি মারছেন। হাতে হীরের আংটি। মুখ শরীর কোলা ব্যাঙের মত করে রেখেছেন।

ওরা জানালায় ফের মুখ তুলে বলল, 'দেখেছ, দৈত্যের মত লোকটা কেমন বড় বড় হাই তুলছে!' বলে ওরা হাসতে থাকল। দৈত্য ব্যক্তিটি পঙ্গপাল আসছে ভেবে বিরক্ত। হাতের তুড়ি থামিয়ে কিঞ্চিত সাহস সঞ্চয় করছেন। এবং পঙ্গপাল অতিক্রম করে যেতেই চায়ের দোকানের আবছা অন্ধকার

থেকে বৃদ্ধ লোকটি খ্যাক করে উঠল। ব্যাঙের মত মুখবাদান করে তাড়াতাড়ি গাড়ির ভিতর ঢুকে কোঁচা ঝাড়তে থাকলেন তিনি।

চায়ের দোকানী বলল, 'আমাদের বুড়োকর্তা পাগল হয়ে গেল গো!'

তখন ঢাকের শব্দ, ঢোলের শব্দ বাজছিল। অনেক দূরে সানাই বাজছে। প্রতিমা বোধনের বাজনা। ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি—বড় রাস্তার তু-পাশে জনতার ভিড়, জানালায় নির্মলের মুখ, স্বার্থপর দৈত্যের গাড়ি বড় রাস্তা ধরে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে—এই শুভদিনে জমিতে কাঁটাতারের বেড়া। আকাশ নীল স্বচ্ছ অথচ এইসব মানুষের গতানুগতিক জীবনের মধ্যেও টগর হাসপাতালে শুয়ে বাঁচবার স্বপ্ন দেখছে। এখন কেমন আছে টগর! সে কি ঢাকের শব্দ ঢোলের শব্দ আমাদের মত শুনতে পাচ্ছে! অদূরে সানাই যদি কখনও বাজে—অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী টগরের যদি কখনও বিয়ে হয়। নির্মল নিজের পায়ে হাত রাখল।

জানালা থেকে এক সময় সব দৃশ্য মুছে গেল। নসু এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে লণ্ঠন জেলে দিল, নির্মল সেসব লক্ষ্য করছে না। টগর হাসপাতালে, ভগবান, টগর যেন বাঁচে। দৈত্যের মত লোকটাকে ঈশ্বর সুমতি দিক, ফের সোনাপোকা উড়ুক মাঠে, মাঠের ঘাসে ঘাসে সবুজ গন্ধ থাকুক—নির্মল এইসব ভেবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সে দেয়ালে এক হাত রেখে একটা বালিশে হাঁটু গুঁজে দিল তারপর অন্য পা সামনে রেখে তীরন্দাজের মত বসল। কিন্তু কিছুতেই দাঁড়াতে পারল না। সে কাঁপতে কাঁপতে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

নির্মল মাকে বলল, মা আমাকে বিদ্যাসাগরের জীবনী কিনে দিও।

নির্মল জানালায় বসে আছে। সরু কাঁচাপথ অতিক্রম করে কাঁটাতারের বেড়া মাঠ, রুগ্ন পাকুড়গাছ—পাখিরা গাছ থেকে পালিয়েছে। একটা যন্ত্র মাঠটাকে কতদিন থেকে চষে বেড়াচ্ছে। যন্ত্রটা মাটির অতলে পাথর ঠুকে উপরে উঠে আসছে। তুপুর পর্যন্ত ট্রাকে ইঁট এসেছিল, পাথর চুন এসেছিল। এই মাঠে সারাদিন সারামাস ধরে একটি অদ্ভুত রকমের বিরক্তিকর আওয়াজ। জানালাতে এখন রোদ। নির্মল অন্যান্য দিনের মত পা রাখল রোদে। টগর বেঁচে নেই। টগরের স্মৃতি ওর জানালাতে রঙিন; ওর বাঁশির মত নাকে মুখে স্পষ্ট প্রতিবাদ—বড় অট্টালিকার চাপে আমরা ছোট মানুষেরা হারিয়ে যাচ্ছি গো। নির্মল জানালাতে হাত রেখে রোদের

ভালবাসাটুকু নিল। এই রোদে যেন টগরকে প্রত্যক্ষ করছে, এই রোদ টগরের প্রতিবিম্ব যেন। জানালার কাঠে হাত বুলাল এবং একসময় করুণ কণ্ঠে জানাল—তোমরা আমার এই রোদটুকু কেড়ে নিও না গো।

আর তখন চারুবালা বাসের এক কোণে বসে প্রতিদিনের মত আজও দেখল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে জনতার ভিড়—বাসটা ট্রামগাড়ি অতিক্রম করে বিডন স্ট্রীট পার হলে পার্কে বিদ্যাসাগর পাখিরা, ঈশ্বরচন্দ্রের মাথায় ময়লা ফেলে নীচে ভদ্রলোকদের ছড়ানো ছিটানো চানা খাচ্ছে। সে এতদিন এই পথে রোজ যাচ্ছে অথচ আজ প্রথম দেখল বিদ্যাসাগরের চোখে পিচুটি মুখে দাড়ি। সহসা মনে হল—বিদ্যাসাগর সারাদিন সারামাস বসে বসে নির্মলের মতই পঙ্গু। এবং আজ কেন জানি চারুবালার ঈশ্বরচন্দ্রের মা হওয়ার শখ জাগল। ভাবল প্রতিরাতে ফিরবার সময় একবার করে পাখিদের মলমূত্রে তৈরি ওঁর চোখের পিচুটি এবং মুখের আবর্জনা সাফ করে দিয়ে যাবে।

চারুবালা বাস থেকে নেমে পড়ল এবং হনহন করে ইংরেজী সিনেমা পার হয়ে একটা বড় গলিতে ঢুকে গেল। পরিচিত পানের দোকান থেকে মিষ্টি পান খেল একটা। দোকানীর সঙ্গে কিছু হাসি বিনিময় হল। তারপর নির্ধারিত ঘরে ঢোকার আগে জনতার ভিড়ে একটু দাঁড়াল। চারুবালার চুল সুন্দর করে জড়ানো, ঘাড় মসৃণ এবং নরম। তেলের গন্ধ শরীরে। একটি মির্জাপুরী পুরানো সিল্ক চারুবালার শরীরের প্রতিটি ভাঁজকে তীব্র তীক্ষ্ণ করছে। চারুবালার চোখে কাজল। বৃহৎ অট্টালিকার ফাঁক দিয়েও আকাশ স্পষ্ট অথচ নীচে দুটো নগ্ন বালক বালিকা ভাঙ্গা টিনের থালা থেকে বাসি রুটির টুকরো, পায়েস, কিছু মটরের ডাল তুলে খাচ্ছে। জনতার শরীরে বিলাসী দ্রব্য, কাচ মোড়া দোকানে কত উপকরণ জীবন ধারণের, ট্রাম বাস নিয়ন আলো, মাঠে অশ্বারোহী দল কদম দিচ্ছে তারপর দূরে দূরে জনতার ভিড়। এবং চারুবালা এ-সময়ে কি ভেবে দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিল টিনের থালাতে তারপর ভিড় থেকে সরে পড়ল।

ফিরতি পথে কিন্তু চারুবালার নিজের কথাই মনে থাকল না। কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে—কোন্ ইচ্ছার অস্তিত্বে সে এভাবে ছুটছে? অথচ একই পথ। নির্জনতা শুধু এখন পথের সর্বত্র। ইতস্তত ট্যাক্সি এবং শেষ বাস

শহরে চলে যাচ্ছে। পার্কে বিদ্যাসাগর তেমনি পঙ্গু। জনতার ভিড় ব্যতীত সব দৃশ্য সকল একই ভাবে দৃশ্যমান। বিদ্যাসাগরের পায়ের কাছে নগ্ন দুই শিশু ঘুমিয়ে আছে। চারুবালা জননী হবার ইচ্ছার কথা আদৌ স্মরণ করতে পারছে না। অন্যান্য দিনের মত সে দৃশ্য সকল দেখতে দেখতে অথবা চোখ বুজে পড়ে থেকে ট্যাক্সিতে গীর্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি অতিক্রম করছে কেবল।

ঘরে ফিরে দরজায় মৃদু আঘাত করল চারুবালা। নসু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। উঠোন পার হয়ে বারান্দায় উঠে দরজা দিয়ে দেখল চারুবালা নির্মল ঘুমিয়ে আছে। চারুবালা আজ ভাল করে স্নান করল। নসুকে বলল, আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে নারে নসু। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। চারুবালা নীচে বিছানা করল না আজ। নির্মলের পাশে একটু জায়গা করে শুয়ে পড়ল এবং নির্মলের শরীর থেকে ঘ্রাণ নিতে গিয়ে কাতর আবেগে বলে উঠল, ভগবান আমি যে আর পারছি না।

পরদিন নির্মল বলল মা চল আমরা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই।

চারুবালা চা খেতে খেতে হাসল। কেন ভাল লাগছে না?

—না মা, আমার ভাল লাগছে না। মাঠে কত বড় বাড়ি হচ্ছে, বাড়িটার জন্যে আমার জানালায় রোদ আসবে না আর।

চারুবালা এবারেও হাসল। 'তুমি ভাল হয়ে ওঠ তারপর আমরা চলে যাব।'

—আমরা সেই কাঠের ঘরে চলে যাব না সব?

চারুবালা জবাব না দিয়ে লক্ষ্মীর পটের দিকে তাকাচ্ছে।

—সেখানে ছোট নদী থাকবে, তরমুজ খেত থাকবে না মা? আমি জলছত্র দেব না মা?

দরজার বাইরে বৃদ্ধ নসু বলছে, গগনভেরী পাখি থাকবে সেখানে চারু?

চারুবালা বলতে চাইল যেন সবই থাকবে, শুধু আমি বুঝি থাকব না।

তারপর নির্মল নিজের চোখের উপর দেখল ইঁট কাঠ পাথরের বিরাট প্রাসাদ এই সবুজ ঘাসের উপর তৈরি হচ্ছে। এই প্রাসাদের মত বাড়িটা ওর জানালার এতটুকু রোদকে নিঃশেষে মুছে দিল। শ্রমিকেরা ছাদ পিটাচ্ছে এবং অশ্লীল গান গাইছে। নির্মল চারুবালাকে বলে চার চাকার একটা কাঠের গাড়ি তৈরি করাল। নসুকে গাড়িটা ঠেলে দিতে বলল রাস্তায়। তারপর বড়

রাস্তায় উঠে বৃষ্টিতে ভিজে সকল শ্রমিকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেবার স্পৃহাতে চোখ তুলতেই দেখল স্বার্থপর দৈত্য গাড়ি থেকে নামছে, দূরে তার মা। চায়ের দোকানে সাত পাঁচ রকমের লোক এবং ওদের মুখে ভিন্ন ভিন্ন কথা। নির্মল মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখল. বস্তির সকল উলঙ্গ শিশুরা ওকে ঘিরে হইচই করছে। ওরা লাফাল, নাচল। সে কাঠের বাক্সটার মধ্যে বসে আছে। সকলে মিলে টানছে গাড়িটাকে। গাড়িতে বসে নির্মলের মনে হল, গাছ ফুল পাখি অথবা এই পথ অথবা নির্জন নিঃসঙ্গ প্রান্তর, করমচা গাছে হলুদ রঙের ফুল এবং এই উলঙ্গ শিশুদের ঘিরে নতুন এক সংসার পত্তন করলে কেমন হয়!

রাতে নির্মল জানালাতে বসে দেখল প্রাসাদের সকল কক্ষে আলো। সদর দরজাতে জনসমাগমের ভিড়, হরেক রকমের বাজী পুড়ছে। দেয়ালে দেয়ালে নকশী কাঁথার মত আলোর ফুলকি। বিদেশী সঙ্গীতের মদিরতা বস্তি অঞ্চলের সকল ইচ্ছাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। নির্মল মার জন্য প্রতীক্ষা করছে জানালায় ভাল লাগছে না বলে বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ছে। রাত বাড়ছে, ঘন হচ্ছে এবং গভীর হচ্ছে। মা তখনও ফিরছেন না। বড় রাস্তা ধরে শেষ বাস কখন চলে গেছে। হোটেলের আলোতে নির্মল পড়ল ভগবতী দেবী বীরসিংহ গ্রাম। নির্মল বালিসে মুখ ঢেকে আজ কাঁদল।

সে রাতে চারুবালা আর ফিরল না। এক অদৃশ্য শক্তির চাপে চারুবালা আর ফিরতে পারল না।

এতক্ষণে সে নিশ্চিত হল। ঘাম দিয়ে ওর জ্বর সেরে গেল।

কিছুক্ষণ আগেও সে থর থর করে কেঁপেছে। এখন কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম। যারা ওকে তাড়া করেছিল সে তাদের অনেক পিছনে ফেলে চলে এসেছে। সে বার বার পেছন ফিরে তাকিয়েছে—কপালে তার চোখ উঠে গেছে, ওরা ছুটে আসছে। ওরা ওকে ঘিরে ফেলবে। রাস্তার এই জনতা ওর গাড়ি ঘিরে ফেললে, গাড়িটা এবং সে মরে যাবে। অথবা সে এবং গাড়িটা পুড়ে যাবে। পুড়ে গেলে সে আকাশ দেখতে পাবে না, ফসলের মাঠ দেখতে পাবে না। খিস্তি খেউড়, জীবন যে মহান—সে চলার সময় আর কোনদিন তা টের পাবে না।

ওর কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম এখন শুকিয়ে যাচ্ছে। লক-আপের বড় তালাটা ঝুলিয়ে গোঁফে চাড়া দিচ্ছিল দফাদার। এত ভাল লাগল যে সে পয়সা থাকলে দু আনার তেলেভাজা অথবা আলুকাবলি কিনে দিত, শক্ত তালা দিয়ে দফাদার তাকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করে গেল। এত বড় তালা, লোহার গরাদ এবং শক্ত দেয়াল ভেদ করে ওদের সড়কি অথবা আগুনের উত্তাপ তার গায়ে লাগবে না। ওর কেমন কষ্ট হচ্ছিল ভিতরে। দফাদার চলে যেতেই মনে হল ওর জল তেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকনো, মুখে থুথু পর্যন্ত উঠছে না। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে সে জলতেষ্টা নিবারণের চেষ্টা করল। কেউ কাছে নেই দেখে সে দুহাতে গরাদ ধরে ঝাঁকি দিল—কতটা শক্ত, কতটা মানুষের ঠেলাঠেলি সহ্য করতে পারবে দেখার সময় মনে হল, চারপাশে তার অন্ধকার নামছে। পেছনের দিকে যে জানালাটা আছে সেখানে এখনই একটা কি দুটো নক্ষত্র উঁকি মারবে। আকাশে নক্ষত্র উঠে এলেই সে পাশের বেঞ্চে শুয়ে ঘুম দেবার চেষ্টা করবে। যেন সে কতকাল না ঘুমিয়ে আছে। মনে হয় মাস কাল বৎসর কেটে গেছে সে না ঘুমিয়ে আছে। আহা জীবন কি সুস্বাদু। সে কিছুক্ষণ আগেও ভেবেছিল মরে যাবে—সকলে তাকে পিটিয়ে কিংবা পুড়িয়ে মেরে ফেলবে।

ঘটনাটা ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিৎকারে তার হুঁস ফিরে এসেছিল। চাকার নিচে সেই মুখ—করুণ মুখখানি। দু হাত রাস্তার উপর দেবীর মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। চাকাটা পেটের উপর উঠে গেছে। শালা আমি এক নম্বরের হারামি। সে নিজেকে গাল দিল। টের পেলাম না, চাকার নিচে তিনটা বাচ্চার হামাগুড়ি দিয়ে নদী পারাপারের খেলা চলেছে।

সে লক-আপের ও-পাশে নিবু নিবু আলোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। দেখল হাতে নাগাল পাওয়া যায় কিনা লম্ফটা। সে ফুঁ দিয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করল। ওরা যদি এতক্ষণে এতদূর পর্যন্ত ছুটে আসে, শালা কুত্তার বাচ্চা থানায় গ্যাখো কেমন চুপচাপ লক-আপে বসে আছে, দে, ছুঁড়ে দে, লম্ফটা ভিতরে, কুত্তার বাচ্চা আগুনে পুড়ে মরুক—লম্ফটা নিবিয়ে দেবার জন্য সে প্রাণপণ গরাদের ফাঁকে মুখ রেখে ফুঁ দিতে থাকল। লম্ফটা ছুঁড়ে দিলে ভিতরে তেলের সঙ্গে আগুন মিশে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। লম্ফটা নাগাল পেলে সে যে করে হোক নিবিয়ে দিতে পারত—যা কিছুর ভিতর মৃত্যু-ভয় লুকিয়ে আছে সে দু হাতে দূরে সরিয়ে দিতে পারলে যেন বাঁচে এখন।

সে বেঞ্চটা টেনে অন্য দিকের দেয়ালে নিয়ে গেল। যেন গরাদের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে অথবা বর্শা মেরে কেউ খোঁচা না দিতে পারে। সে যতটা পারল বেঞ্চটাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিল। কারণ সে যতটা দ্রুত তার গাড়িটা নিয়ে থানার ভিতর ঢুকে পড়েছে তত দ্রুত রাস্তার জনতা এখানে ঢুকে যেতে পারবে না। ওকে ধরার জন্য চারজন লোক সাইকেল চালিয়ে আসছিল। ওরা গাড়ির পেছনে বেগে ধেয়ে আসছে। সে কিছুতেই ধরা পড়বে না। ওরা যদি লাফ দিয়ে বাসটার ভিতর ঢুকে যায় তবু না। কারণ সে তার সবরকমের কৌশল খাটিয়ে, মা জননীরা, মাসিরা, আপনারা নামুন গাড়ি থেকে, গাড়ির চাকার নিচে তাজা প্রাণ, এবার আমাকে একটু স্থান করে দিতে হবে এত মানুষজনের যখন ভিড়, যখন আমাকে আপনারা সকলে পুড়িয়ে মারবেন স্থির করেছেন, তখন সবটা শুনুন, গাড়িটাকে সাইড করতে দিন, এই সাইড করার নাম করে সে খালি গাড়ি নিয়ে একেবারে সোজা থানায়—কারণ সে কিছুতেই জনতার হাতে ধরা পড়বে না, ওরা লাফ দিয়ে যদি ভিতরে ঢুকে যায় তবু না। সে কেবল তার সামনের আয়নাটা দেখছিল। চারটা মানুষ যেন সাইকেলে আসছে না, পাখি হয়ে বাতাসে উড়ছে। আয়নার ভিতর ওরা উড়ে উড়ে

কেমন বড় মাঠে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল ওরা ওর কাছে হেরে গেছে। সে এবার বেঁচে যাচ্ছে, সে বেঁচে যাচ্ছে। সে স্টিয়ারিঙে শক্ত হয়ে বসেছিল। হাওয়ার আগে গাড়ি ছুটিয়ে সে লোকগুলোকে বেমালুম বোকা বানিয়ে দিয়েছে। রাস্তা শেষ হলেই থানা। সে থানায় গেলে আজ হোক কাল হোক ওরা ওকে শহরে পৌঁছে দেবে।

আহা সে বেঁচে যাচ্ছে। সামনে থানার কাঁটাতারের বেড়া। ভিতরে বড় চাতালে দুর্বাঘাস। দুটো একটা প্রজাপতি উড়ছে লতায় পাতায়। এখন শীতের আকাশ নয়। বসন্তের আকাশ। রাস্তায় শুকনো পাতা উড়ছে। সে বেঁচে যাচ্ছে—কি সুস্বাদু জীবন। সে জিভ চেটে চেটে জীবন কত সুস্বাদু তার আস্বাদন নিতে নিতে দেখল, দফাদার মানুষটি লক-আপের তালা খুলছে।

সে বলতে চাইল, আহা এটা কি করছেন? ওদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন না? ওরা এলেই সোজা ঢুকে যাবে থানায়। বলবে কুত্তার বাচ্চাকে বের করে করে দিন। ওকে পুড়িয়ে মারব। একটা কাঁচা প্রাণকে এইমাত্র চেপ্টে দিয়ে এসেছে। বড় হারামি আছে।

দফাদার মানুষটি এক ঘটি জল রেখে দিল ভিতরে। তার জলতেষ্টা পেয়েছে, সে ঢক ঢক করে জল খেল। সে মনে মনে হাত জোড় করে বলল, দয়া করে এই গরাদ আর টানবেন না। তালা খুলবেন না। আজ রাতটা কাটাতে দিন। কাল সকালে আমার মালিক এলে পুলিস পাহারায় শহরে চলে যাব। আমি আবার নদীর পারে হেঁটে যাব। গাছের নিচে বসে থাকব। দরকার হলে খিস্তি খেউড় এবং সুবি নামে মেয়েটার সঙ্গে র‍্যালা দেব।

দফাদার চলে গেলে সে নিজেই ফের লক-আপ টেনে টেনে দেখল। না খুব কঠিন জায়গা। ভেঙ্গে কেউ ভিতরে ঢুকে যেতে পারবে না। এ-সময় দারোগাবাবুর রসিকতা শোনা যাচ্ছিল। পুলিসের বুটের শব্দ কানে আসছে। এবং ব্যারাক বাড়িতে দুজন সিপাই ঢোল বাজাচ্ছে। সে শুনতে পেল কোথাও গুম গুম আওয়াজ উঠছে। সে কি ভয়ে তা হলে মরে যাচ্ছে! চার পাশে অনবরত বিশ্রী শব্দ, ওর বুকটা মাঝে মাঝে ধড়ফড় করে উঠছে—সে কেন জানি স্থির থাকতে পারছে না। সে সারারাত চেষ্টা করেও বুঝি একটু নিদ্রা যেতে পারবে না। কারণ ওরা এলে ওকে কুত্তার বাচ্চা, হারামির বাচ্চা এই সব বলে গাল পাড়তে পারে। সে এই গাল পাড়তে পারে ভেবে যেন সটান

হয়ে শুলো না। পাশ ফিরে শুয়ে একটা কান খাড়া করে রাখল, কুত্তার বাচ্চা শব্দটা শুনলেই সে জোড় হাত করে ক্ষমার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমার অপরাধ নেবেন না বাবুসকল। আমি না জেনে ওকে হত্যা করেছি। আমার বিশ বছরের ড্রাইভারি জীবনে এমন কোনদিন হয়নি। আমি ভাল ষ্টিয়ারিঙ ধরতে জানি। হালে সহসা পানি না পেলে মানুষের এমন হয়। কিন্তু আমার হালে পানি না পাওয়ার কিছু ছিল না। কারণ আমি আমার অধীনে ছিলাম। গাড়ি আমার থেমে ছিল। আদৌ দেখিইনি ওরা দুজন কি তিনজন হবে উবু হয়ে গাড়ির চাকা দেখছে, চাকাটা ঘুরছে কি করে, কোন যাদুবলে এত বড় অতিকায় দানবটা মাঠ পার হয়ে নদী পার চলে যায়—। সব সময় ওদের ভিতর এই গঞ্জের মতো জায়গায় এত বড় গাড়িটার এক রহস্য ছিল। আমার গাড়ি, আমি এবং কোন কোনদিন আমার কথাবার্তা শুনে ওরা হাসত। হাসতে হাসতে বলত, ড্রাইভার সাব আমাগ তুমি পদ্মার পারে নিয়া যাইবা ?

—যামু। কবে রওনা দিবা কও। সে ওদের মতো করে কথার জবাব দিত।

—তুমি ড্রাইভার সাব কবে যাইবা। গাড়িতে চইড়া পদ্মাপারে যাইতে বড় শখ যায়।

—দিমুনে একবার একটা পাড়ি দিয়া।

ড্রাইভার সাহেব মানিকলালের তখন মনে হত শোভার কথা। সে'ও বলেছিল, এভাবে বুঝি ছ্যাশ কয়। আছিল একখানা ছ্যাশ আমার পদ্মার পারে। তুমিত যাও নাই। গ্যালে তোমারে ছ্যাখাইতে পারতাম ছ্যাশ একখান কারে কয় !

আমি শোভা তোমার দেশে যেতে পারিনি। আমি এখন এই লক-আপে আছি। শুধু এখন এটুকু মনে করতে পারি তুমি আমাকে কোনদিন ভাল-বাসোনি। মানিকলাল কেমন ঢোক গিলে স্থর ধরে ধরে বলতে থাকল—তোমার মনে ছিল কত আশা আমি তোমারে ঘর দিমু, চান্দের মত মুখখানাতে চুমা দিমু, কিন্তু পারি নাই। সে কেন জানি জায়গায় জায়গায় আজ শোভার মত ভাবনা চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিল। চুমা দিমু যখন কই, তখন ছ্যাখি তুমি মুখটারে ঘুরাইয়া রাখছ।

—মুখে তোমার মানিক অযুধের গন্ধ ক্যান ?

—অষুধ না খাইলে শোভা গাড়ি চালান যায় না।

—মিছা কথা।

—হাচা কথাই কই।

—কয়ডা লোক হাচা কথা হয় কও ?

—ক্যান কয়না ?

—তোমার মত মাইনসে স্থাশটা ছাইয়া গ্যাছে মানিক। একবার লইয়া যাইতে পারতাম পদ্মাপারে, নদীর জল, ইলিশ মাছ দেখাইতে পারতাম তবে স্থাখতাম তোমার রোগডা থাকে কোনখানে ?

মানিকলাল বলত, তোমার স্থাশে বুঝি কোন রোগ নাই ?

—থাকব না ক্যান! তোমার রোগে মানুষ ভোগে না মানিক; মাঠে ঘাটে বেড়াইলে, নদী নালা স্থাখলে, পদ্মার জলে মাছ ধরলে এই রোগডা মইরা যায়! নদীর জলে ডুইবা গেলে মনটা তোমার ভইরা যায়। অষুধ খাওনের আর কাম লাগে না।

লম্ফটা নিয়ে কেউ চলে গেল। আবার অন্ধকারে ডুবে গেল মানিকলাল। চারপাশের ঘন অন্ধকারে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বাইরের চাতালে অনেকগুলো মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি—ওরা বুঝি এসে গেছে। সে অন্ধকারের ভিতর ঘাপটি মেরে বসে আছে। কেউ টের পাবে না এখন মানিক-লাল কোথায়। আর তখনই মনে হল পেছন থেকে ওর মাথায় কে টর্চের আলো ফেলছে। পিছনে দেয়াল, কে আলোটা ফেলছে—সে ভয়ে ছুটবে ভাবল। ওরা ওকে নিতে আসছে বোধ হয়। আজকাল যা দিন পড়েছে ওকে ফিরিয়ে না দিলে থানা-পুলিস উড়িয়ে দিতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে পিছনের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল, উঁচু জানালা থেকে জ্যোৎস্নার আলো এসে এই ঘরে পড়েছে। কোথাও চাঁদ উঠেছে। মাঠ আছে হয়ত পিছনে। সাদা মাঠ, তারপর কোন অশ্বত্থ গাছ। গাছের মাথায় চাঁদটা মরা মানুষের চোখের মত ঝুলছে। সে এবার আশ্বস্ত হল। আর সেই মুহূর্তে সেই অন্ধকার গলি পথটায়, ওর লক-আপের সামনে কারা দল বেঁধে আসছে। একটা আলো ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। সে টের পেল ওটা একটা বড় টর্চের আলো। স্টীমারের আলোর মত ওর চারপাশটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। সাদা

কাপড়ে মোড়া রক্তাক্ত একটা জীবকে ধরাধরি করে কারা এদিকটায় নিয়ে আসছে। ওরা ওর লক-আপের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আহত বাঘের মত ওরা ড্রাইভারকে দেখছে। টর্চের আলোটা নিবে গেল সহসা। অন্ধকার চারপাশে, শুধু সেই এক ফালি জ্যোৎস্না, মরা মেয়েটাকে রাখার জন্য দারোগাবাবু আবার হয়ত লম্ফটা এদিকে ঝুলিয়ে দেবার অনুমতি দিয়েছেন—সেই লম্ফের আলো—ফলে অস্পষ্ট অন্ধকারে মানিকলালের চোখ দপদপ করে জ্বলছিল। এবং দূরে কোথাও মাংসের গন্ধ, দারোগাবাবু বিকালে নদীর চর থেকে তিতির মেরে এনেছেন—তিতিরের মাংস রান্না হচ্ছে। লোকগুলো পাশের লক-আপে সেই সাদা চাদরে মোড়া বনবাসী দেবীর মত ছোট্ট এক বালিকাকে রেখে গেল। লম্ফটা নিয়ে চলে গেলে, শুধু থাকল অন্ধকার, মরা চাঁদের আলো আর বনবাসী দেবী চিৎপাত হয়ে পুঁটুলির ভিতর শুয়ে আছে।

কি বড় রাস্তা! দু পাশে ফসলের মাঠ। সে বাস-ড্রাইভার। তার বউয়ের নাম শোভা। শোভা তার ঘর ছেড়ে চলে গেছে সেই কবে। কেবল কথায় কথায় সে বলত, তুমি দ্যাখছনি, পদ্মার পার, নদীর জল, ইলিশ মাছ! শোভার কিছু ভাল লাগত না। মানিকলাল নেশা করে ঘরে ফিরত এবং সুবি নামে মেয়েটার সঙ্গে র‍্যালা দিত। আর ঘরে তার বউ, উদ্বাস্তু যুবতী নদীর পারে স্বামী এখনও ফিরছে না বলে নেমে যেত, হিজলের ফুল, শালুক পাতা এবং জোয়ারের জল অন্বেষণ করত, উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে বাসটা বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে কিনা উঁকি দিয়ে দেখত। বাসটা দাঁড়িয়ে আছে, অথচ মানুষটা এখনও ফিরছে না। বাস থেকে নেমে সে যে কোথায় যায়! তখন ড্রাইভার-সাহেব নেশার ঘোরে বউকে নদীর পাড়ে দেখলে, বলত। তুই কি ঢুঁড়ে বেড়াস আমি সব জানি।

—আমি কি ঢুঁড়ে মরি।

—তুই নদীর জল, ইলিশ মাছ, পদ্মার পাড় ঢুঁড়ে মরিস। আমি তোর সব বুঝি। তুই আমাকে ভালবাসিস না।

শোভা কিছু বলত না। ড্রাইভার সাব বড় রাস্তায় নেমে গেলে সে একটা কদম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকত। এবং যতক্ষণ না বাসটা চোখের উপর থেকে সরে যেত ততক্ষণ সে নড়ত না।

শোভার কথা মনে এলেই এ সব কথা মনে হয়। পদ্মার পাড়, নদীর জল,

ইলিশ মাছ, সূর্যের আলো এ সব ছবি মনের ভিতর উঁকি মারতে থাকে। এখন দারোগা সাবের বউ পানের পিক ফেলে মাংসের গন্ধ শুঁকছে। লম্বা ব্যারেক বাড়ির শেষ মাথায় দারোগাসাবের কোয়ার্টার। ড্রাইভার মানিকলাল অন্ধকারে তা টের পাচ্ছে। বুটের শব্দ আসছে এখনও। কেউ বন্দুকের নলে পৃথিবী পাহারা দিচ্ছে। এবং মানিকলালকে দেখলে টের পাওয়া যাবে, ওর চুল খাড়া, চোখ লাল এবং শরীরে ঘামের গন্ধ। ওর গলা শুকনো। থেঁতলানো একটা মাংসের জীব পাশের ঘরে শুয়ে আছে। চোখ নাক মুখ সমতল। ওরা স্থান কাল পাত্র পরিবর্তন করে গাজীর গীদের চাঁদ পাতার মত চ্যাপ্টা। সে নাক টানল। রক্ত মাংসের আঁশটে গন্ধটা ও পাশের লক-আপ থেকে আসছে কিনা দেখার সময় মনে হল দারোগা সাবের বউ তিতিরের মাংস চেটে চেটে মাংসের স্বাদ নিচ্ছে। এবার ওর গলা থেকে একটা ওক উঠে এল। রান্না করা মাংসের গন্ধ তাজা মাংসের গন্ধকে সুরুয়ার মত গিলে ফেলছে।

আলোটা জ্বালা হোক এবার। লম্ফটা না জেলে দিলে ভয়টা বাড়বে। চার পাশটা নিঝুম। বড় মাঠের ভিতর এইখানে জানালায় জ্যোৎস্না দেখে মনে হয় এই পৃথিবীর একাংশে সে এবং আট নয় বছরের ফসলের মাঠ থেকে উঠে আসা বনদেবী চুপচাপ বসে রাত কাটাবার আশায় আছে। সকাল হলে সে যাবে শহরে। মেয়েটা যাবে স্বর্গে। এখন এমন অন্ধকারে গোটা লক-আপটা প্রায় মানিকলালের কাছে স্বর্গের মত। যেন এবার ফসলের মাঠ থেকে উঠে-আসা বনদেবী ওকে ভয় দেখাতে শুরু করবে। সে ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ডাকল, ও মেয়ে আরতি, তুমি জেগে আছ নাকি! তারপর যেন সে কেমন কাতর গলায় বলল, আহা তুমি যুবতী হলে না, যুবতী হলে তোমার শরীরে কত রকমের ইচ্ছা খেলা করে বেড়াত। ও মেয়ে জেগে আছ নাকি? আমি মানিকলাল, বউ আমার পলাতক। পদ্মার পাড়, নদীর জল, ইলিশ মাছ সে খুব ভালবাসত। আমি ড্রাইভার মানুষ—ওর মন খারাপ হলেই বুঝতে পারতাম সে কোথাও যেতে চায়।

বস্তুত মানিকলালের ভয়ে ধরেছে। চোখের উপর দৃশ্যটা ভাসছে। চোখ মুখ নাক গলে গিয়ে সমতল, পেট ফেটে হা করে আছে। সে ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে কবিতার মত করে নাকি সুরে কথা বলছে।

একাকী নির্জন রাতে ভয়ে ধরলে মানিকলাল উচ্চ স্বরে গান গাইত। এখন সে ভয়ে কবিতার মত করে কথা বলছে—অ মেয়ে, সে বড় ভালবাসে বৃষ্টিতে ভিজতে, নদীর পাড়ে হাঁটতে, জ্যোৎস্না রাতে বালির চরে চুপচাপ বসে থাকতে। আমাকে নিয়ে শোভা এ সব করতে চাইত। আমি মানিকলাল সারাদিন নেশার ভিতর ডুবে থাকি, একবার গাড়ি নিয়ে বের হলে ফেরার নাম করি না। সে কেন আমার আশায় এতদিন বসে থাকবে বল।

মানিকলাল এবার বলল, বারে বা আমি কার সঙ্গে কথা বলছি! আমাকে ভূতে পেয়েছে! ওর লোমকূপে শক্ত দানাদার সব হিজিবিজি দাগ কাটা, কে যেন সারা শরীরে হাজার হাজার দাগ কেটে চলেছে। ওর ভিতরটা ভয়ে ফুলে উঠছে। এবং শরীরের সব রোমকূপ শক্ত হয়ে উঠছে। আর তখনই মনে হল কেউ যেন ডাকছে তাকে। অনেক দূরের ফসলের মাঠ থেকে কে ডাকতে ডাকতে উঠে আসছে। বেশ মজা দারোগা সাবের। লম্ফ নিবিয়ে দিয়ে তেল বাঁচাচ্ছেন। সে যে অন্ধকারে ভয়ে মরছে এবং এ ভয়টা যে আরও ভয়াবহ এটা কেউ টের পাচ্ছে না। সে নিজেও বুঝতে পারেনি মাটির ঢেলার মাংস-পিণ্ডটা ওকে এমন ভয় দেখাতে পারে। সে যেন এতদূর অনর্থক বাঁচার জন্য ছুটে এসেছে। পাশে মৃতদেহ বালিকার—সে যাবে শহরে মেয়েটা যাবে স্বর্গে—মেয়ের চোখ দুটো ডাগর ছিল, একটা নীল রঙের ডুরে শাড়ি কোমরে প্যাঁচ দিয়ে পরত। হাত পা শীর্ণ। নরম মুখ। সে গঞ্জের কাছে বাস থামালেই তার জানালায় লাফিয়ে উঠে আসত মেয়েটি, কার মেয়ে, কোথাকার মেয়ে—এই গ্রামে গঞ্জে কে তার খবর রাখে। দুটো পয়সা দেবা ড্রাইভার সাব? মুরকি খাব।

ছোট থাকতে তার পালিয়ে যাওয়া বউটার মুখ হয়ত এমন ছিল। এ অঞ্চলে ধান হয়, যব গম হয়। ফসলের খেতে নানারকমের পাখি উড়ে আসে। মেয়েটার বুঝি কাজ ছিল ফসলের খেতে বসে ঢং ঢং করে টিন বাজানো। পাখিরা উড়ে এসে বসলেই সে টিন বাজাত। বসন্তে অথবা গ্রীষ্মেও ওদের কোন কাজ থাকে না। তখন রাস্তায় এসে দুটো পয়সা ভিক্ষা। গঞ্জের মতো জায়গাটায় হরেক রকমের চাষবাস, মনিহারি দোকান, পাটের আড়ত এবং চাল, ডাল, মুসুরির গুদাম নিয়ে বেশ আর্থিক স্বচ্ছলতা। এখান থেকে পদ্মার পার বেশি দূর নয়। দু ক্রোশ পথ হেঁটে গেলেই নদী, বালির চর,

ইলিশের ঝাঁক এবং নানাবিধ গাছপালা যা বাংলাদেশের সীমানা মানে না। মনে সন্দেহ ছিল মানিকলালের, বাঁজা বউ শোভারানী নদী পার হবার জন্য পালিয়ে এ অঞ্চলে চলে এসেছিল। সে এবার ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য বলল, ও মেয়ে আমি যে আমার পালানো বউয়ের খোঁজে এই রুটে শেষে কাজ নিয়ে চলে এলাম। এসব কথা তোকে আমি কতবার বলেছি।

মনে হল এই অন্ধকারে কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে। সে কান খাড়া করে রাখল। দেয়ালের পিছনে কী কোন গাছ আছে, এই ফুলটুলের গাছ। গাছে পাখির বাসা। পাখিরা নড়ছে। সে খচখচ শব্দ শুনে দেয়ালে কান পেতে রাখল। কেউ যেন বলছে নদীর চর, বালি হাঁস, কুমিরের চোখ ড্রাইভার সাব এনে দিতে পার? মা আমার বালি হাঁসের ডিম কুড়াতে যাচ্ছে বলে বনের ভিতর ঢুকে যেত। আর ফিরতে চাইত না। সেই বন পার হলে বাংলা দেশের সীমানা। মা সেখানে গিয়ে বসে থাকত, মা কেন যে এত কাঁদত ড্রাইভার সাব।

—তোমার মা কোথায়?

—জানি না। বালিহাঁসের ডিম আনবে বলে সেই যে বনে ঢুকে গেল একবার আর এল না।

অনেকদিন ওর বলার ইচ্ছা হয়েছে—তোর মায়ের মুখ কি আমার বউয়ের মত দেখতে ছিল।

মেয়েটা যেন বলতে চাইত, সংসারে কি এক রকমের মুখ থাকতে নেই।

সে তখন চুপচাপ কি ভাবত। বাসে প্যাসেঞ্জার উঠবে এই প্রতীক্ষায় সে বাস থামিয়ে গঞ্জের মত জায়গাটায় বসে থাকত। ওদের সঙ্গে সে গল্পে মেতে উঠত—তা তোরা পথে ঘাটে থাকিস, রাতে রাতে বড় হয়ে যাবি। আমি যেমন শোভাকে ট্রাকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম, তোদেরও কেউ না কেউ তুলে নিয়ে যাবে।

—হ্যাঁ বয়ে গেছে মানুষের।

মানিকলাল স্পষ্ট এমন কথা শুনল। ও পাশের লক-আপে মেয়েটা যেন নাকে নথ পরে ঘোমটা টেনে বসে আছে। পাল্কি এলেই উঠে পড়বে। সে বসে বসে মানিকলালের সঙ্গে মসকরা করছে।

—আমার সঙ্গে যাবি তুই।

—ড্রাইভার সাব কি যে বলে!

—তোকে বালিহাঁস, কুমিরের চোখে এনে দেব। তুই পাখি ওড়াতে গিয়ে একদিন দেখবি বড় হয়ে গেছিস। তোর তখন নদী সাঁতরে ওপারে যেতে ইচ্ছে হবে।

—ওমাঃ ওকিরে! তোর পছন্দ নয় আমাকে। আমার দুটো একটা চুল দাড়ি পেকে গেছে। তুই বড় হলে আরও পাকবে। তাতে কি আছে। কঠিন হাতে নরম মাছ বেছে খাব। একটু থেমে ঢোক গিলে মানিকলাল এমন বলল।

কোন জবাব পাচ্ছে না ও পাশের লক-আপ থেকে। মেয়েটা আবার মাংসের পিণ্ড হয়ে গেছে বুঝি! সে বলল, (কথা শুনলে যদি আবার জেগে গিয়ে বউ সেজে নাকে নোলক পরে বসে থাকে) জরুর নেবে। দেখবি ফসলের খেতে বড় হতে হতে তোরা একদিন নদীর পারে হারিয়ে যাবি।

সহসা মনে হল মেয়েটা হা হা করে হাসছে। ওর কথা শুনে হাসছে। তারপর বিকট একটা শব্দ। বাসের চাকাটা পেটে উঠে গেছে। পেটটা ফেটে গেল। অথবা বাসের চাকা মাথায় উঠে গেছে—ফট করে শব্দ। কি যে শব্দ হয়েছিল, চাকাটা পেটে মাথায় উঠে গেলে মানিকলাল ধরতে পারেনি। সে আন্দাজে শব্দের তারতম্য ধরার চেষ্টা করছে।

ভয়ে মানিকলাল আবোল তাবোল বকছিল। অথবা অদ্ভুত সরল দৃশ্য ভেসে উঠতে দেখল অন্ধকারে। রাত গভীর হচ্ছে টের পাওয়া যাচ্ছে। থালা বাসনের শব্দ আসছিল। কেউ হয়ত খেয়ে বাসন মাজছে। সে নানাভাবে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতে গিয়ে পারছে না ক্রমে ও পাশের লক-আপে দুটো হাত লম্বা হচ্ছে। লম্বা হতে হতে সাপের মত দুলে দুলে দেয়াল বেয়ে উঠে আসছে ওকে ধরার জন্য। এখন হাত দুটো মাথার উপর নুয়ে পড়েছে। সাপের ফণার মতো দুলছে। ওকে সুড়সুড়ি দেবে বলে আঙ্গুলগুলো ফাঁক করছে। আঙ্গুলে সে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সে ভয়ে চোখ বুজে আছে। অন্ধকারে চোখ খুললেই যেন দেখতে পাবে সেই সরু হাত, ছোট ছোট আঙ্গুল ভীষণ লম্বা হয়ে ওর সামনে কৃমির মতো কিলবিল করছে। হাতটা কঙ্কালসদৃশ। এবং কাঁচের চুড়িগুলি, নীলরঙের কাচের চুড়ি ঝুমঝুম করে কানের কাছে বাজছে। সে ভয় থেকে পালাবার জন্য গরাদের

শিক ফাঁক করতে গিয়ে দেখল, একটা আলো। ষ্টিমারের বাতির মতো আলোটা সরু লম্বা হয়ে এদিকে নেমে আসছে। সেই বড় টর্চ জ্বালিয়ে কেউ হয়ত আসছে এদিকে।

মানিকলাল গেটের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ সামান্য আলো এসে পড়েছে গেটের মুখে। সেই আলোই এখন ওর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বরাভয় হয়ে আছে। সে এবার চিৎকার করে উঠল কে ? কে ?

একজন সিপাই, অন্য জন বামুন ঠাকুর। দারোগা সাহেব কৃপাপরবশে খাবার পাঠিয়েছে। সে দেখল এক থালা খাবার এবং তিতিরের মাংস। লম্ফটা জ্বেলে দিল সিপাই। সে নেড়েচেড়ে তিতিরের মাংস এবং ভাত দেখল। ও পাশের একটা অবলা জীবের মাংসপিণ্ড থেকে তাজা মাংসের গন্ধ উঠে আসছে। সে চুপচাপ বসে থাকল সামনে খাবারের থালা নিয়ে। খেতে পারছে না। ভাত, মাংস এবং জলের ঘটি—এনামেলের থালা বাসন, ও পাশে রক্তের চাপ চাপ মাংস, কাঁচা এবং ফেসে গেছে—সে ভাত নাড়তে নাড়তে ওক দিচ্ছিল।
—কি হল !

মানিকলাল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। পুলিসের লোকগুলি দেখল, একেবারে মৃত চোখ কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই। ঝড়ে মরে-পড়ে-থাকা পাখির মত চোখ। বাসি, বাদামি রঙের। চোখে যেন দুটো আস্ত পিঁপড়া হাঁটছে ! ওরা বলল, বমি পাচ্ছে কেন ? জল খাও। গলা শুকনো থাকলে বমি পায়।

চোখে যার পিঁপড়া হাঁটছে সে খাবে কি ! ওরা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। ওরা যেতে যেতে লম্ফটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।

মানিকলাল শুনতে পেল ঝুমঝুম করে কি যেন বাজছে ও-পাশের লক-আপে। কাচের চুড়ি নীল রঙের। মেয়েটার হাত এখন সাপের মতো চার দেওয়ালের অন্ধকারে যেন ঘোরাফেরা করছে। ইচ্ছা করলেই হাতটা মাথার ছাদ ফুটো করে উপরে উঠে যেতে পারে এবং যা কিছু সুন্দর এই পৃথিবীর অথবা সৌরলোকের, তাবৎ সংসার, এই যেমন গ্রহ নক্ষত্র সব বিনষ্ট করে দিতে পারে। হাত দুটো লম্বা হতে হতে অনেক যোজন দূরে উঠে যেতে পারে এবং ফুল ফল তোলার মত গ্রহ নক্ষত্র তুলে আনতে পারে। অন্ধকারে নীল রঙের চুড়ি আর তাতে জলতরঙ্গ শব্দ। মানিকলাল এসেছিল নিজের প্রাণরক্ষার্থে কিন্তু এই

অন্ধকার, পাশে মৃতদেহ এবং তার থেকে নানারকমের ভয় ওকে পাগলপ্রায় বানিয়ে রেখেছে। সে যেন নিজের এই ভয়কে জয় করার জন্য এই রাস্তায় কবে কখন প্রথম মেয়েটাকে দেখেছিল মনে করার চেষ্টায় আছে।

—তা তোর নাম ?

—আমার নাম আরতি।

—তোর মার নাম।

আরতি হাসত তখন। কিছুতেই সে মায়ের নাম বলত না। মায়ের নাম নিতে নেই। নিলে পাপ হয়। সে অন্য কথা বলত, দে ড্রাইভার সাব দুটো পয়সা দে।

—কি করবি পয়সা দিয়ে !

—মুরকি খাব।

আরতি দু রকমের ভাষায়ই কথা বলত।

সে যখন আর ড্রাইভার সাবের মন গলাতে পারত না, তখন বলত, আমারে নিয়া যাইবা পদ্মার পারে। ঠিক মানিকলালের শোভার কথা মনে হত। সে স্থির থাকতে পারত না। দুটো পয়সা দিয়ে বলত, মুরকি কিনে সবাই মিলে খাবি।

আরতির সঙ্গে আরও তিন চারটি রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানো, বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো বাচ্চা ঘুরে বেড়াত। মানিকলাল না বললেও সে কোনদিন একা কিছু কিনে খায় না। চেয়ে চিন্তে যা পায় সকলে মিলে গাছের নিচে বসে মাঠের ফসল দেখতে দেখতে ওরা আহার করে।

ড্রাইভার সাব কথাটা শুনলেই মানিকলাল ভিতরে ভিতরে গর্ব অনুভব করত। সে তখন বলত, তোর মুখে আমার বউ-এর ছাপ আছে। মানিকলাল মনে মনে এই মেয়েকে তা দিয়ে বড় করার তালে ছিল।

আরতি এই ন' দশ বছরে বউ কথাটার মানে ধরে ফেলেছে।

মানিকলাল হাসতে হাসতে বলত কোনদিন, তুই আমার বউ হবি। আমার বাড়ি নিয়ে যাব তোকে।

আরতি কৃত্রিম রাগে ওর চুল টেনে ধরত।

—তবে আর পয়সা পাবি না।

রঙ্গ-রসিকতা এমন হত অনেক দিন। কেবল সে মেয়েটার কাছে মায়ের

নাম জানতে পারেনি। বাপের নাম বলতে পারে না। জারজ-সন্তান, বাপের নাম জানলে পাপ নেই।

মানিকলাল বলত, বড় হলে তুই যা হবি না মাইরি!

আরতি লজ্জায় মুখ নিচু করে রাখত। তারপর ফিক করে হেসে দিত। —তুমি যে কি বল ড্রাইভার সাব!!

আরতি এবং আরও দু'তিনজন বালক-বালিকা এ গঞ্জে এভাবে ভিক্ষা করে। কখনও জমিতে গরু বাছুর তাড়িয়ে বেড়ায়, কখনও গৃহস্থের ফসল পাহারা দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। আর মানিকলালের বাসটা দূর থেকে দেখলেই মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে। এই গঞ্জে যতক্ষণ মানিকলাল থাকবে ততক্ষণ নানারকম হাসি মসকরাতে, অথবা দু পয়সা চার পয়সার মুড়ি মুরকিতে সময়টা কেটে যায় তাদের। গাড়ির জানালায় বসে থাকে কোন কোন দিন। গাড়িটা যেন মানিকলালের নয়া গাড়িটা আরতি এবং এই তিন বালক-বালিকার। ওরা এই গাড়ির উপরে নিচে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। মানিকলাল গতকাল বলেছিল, এই তোরা সরে গেছিস ত যা যা। সে গাড়ির হর্ন বাজাল। তারপর চালাতে গিয়ে দেখল চাকাটা আরতির পেটে মাথায়। শালা এতদিন ওর দিকে তাকাবার কেউ ছিল না। পেটে চাকা উঠে যেতেই গঞ্জের সব লোকদের হুঁস এসেছে—এক মহাপ্রাণ, এই বয়স আর কত, ন' দশ, কি তার চেয়ে এক দুই এদিক ওদিক।

সে টপকে ও-পাশের ঘরটাতে যাবার জন্য ছটফট করতে থাকল। সে তো মৃত। হাঁত দিলে টের পাবে না। মেয়েটার মুখ দেখতে ওর পালিয়ে-যাওয়া বউয়ের মত। সে বলত এই আরতি তোর মা আর সত্যি ফিরে এল না।

—না ড্রাইভার সাব।

আরতি তারপর গল্প করত। কারণ বাসটা সেখানে থামতো বিশ মিনিটের মত। মানিকলালের কথা বলার লোকের অভাব। সে চা খেতে একটা চালাঘরে—বিস্কুট কিনে দিত এবং এই করে সময়টা পার হয়ে যেত এবং একদিন সে বলেছিল, তোর মাকে আর বনের ভিতর খুঁজতে গেলি না?

আরতির চোখ মুখ বড় বিষণ্ণ দেখাত তখন। সে যেন কিছুই বলতে চায় না, বললে এমন শোনায়, সেই ফসলের মাঠ পার হয়ে গেলে বন, বনে কত

রকমের লতাপাতা, ফুল ফল পাখি এবং গাছপালা। বনের ভিতর সে একবার মায়ের সঙ্গে ঢুকে গিয়েছিল। মা বলত সে তাদের নিয়ে যাবে পদ্মার পারে। সেখানে ওরা পেট ভরে খেতে পাবে। বনটা পার হলেই পুলিশের ক্যাম্প তারপর সীমানা চলে গেছে। মা তাদের নিয়ে সীমানার কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে বসে থাকত। কতদিন কত বিকেলে ওরা বসে বসে দেখত, ও-পার থেকে কত পাখি এ-পারে এসে গেছে। কত লাল নীল রঙের পাখি ও-পারে চলে যাচ্ছে। মাকে দেখলেই মনে হত, মা যেন ও-পারে কি ফেলে চলে এসেছে।

মানিকলালের মনে হল, ও-পাশে মেয়েটা এখন প্রাণ পেয়ে গেছে। প্রাণ পেয়ে পাখি পুবে যা পশ্চিবে যা বলে ঘুরে ফিরে নাচছে। এবং কাচের চুড়িতে সেই ঝুমঝুম আওয়াজ। চোখ ভারি ভারি। যৌবনের ঢল নামছে। আরতি একেবারে শোভার মত হয়ে গেছে। পদ্মার পারে ঘর। দেশের মা-বাবা এদেশের আত্মীয়-স্বজনের কাছে শোভাকে রেখে গেল। আইবুড়া মেয়েকে ক্যাম্পের জীবনে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শোভা তার ধূর্ত আত্মীয়ের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এল। আর তখনই সে যেন দেখল ফুসফাস মেয়েটা মশা হয়ে ওর ঘরে উড়ে চলে এসেছে। তারপর সাদা কাপড়ে নিজেকে মুড়ে মর্গের মত মমি হয়ে আছে পায়ের কাছে।

মানিকলাল দ্রুত পালাতে চাইল। সে গরাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সাদা কাপড়ে মোড়া মাংসের ঢেলাটা থপ থপ করে হেঁটে গেল ওর পাশে। সে ছুটে গিয়ে দক্ষিণের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। আবার আরতি থপ থপ করে হেঁটে আসছে। যেন আরতির মাথামুণ্ডু কিছু নেই, একটা বালির বস্তা হয়ে গেছে। মানিকলাল ভয়ে চিৎকার করে উঠবে এমন সময় মনে হল ওটা আবার মাছি হয়ে উড়ে ও-পাশে চলে গেছে।

মানিকলাল ভয়ে ক্রমে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। তাকে খুব কাতর দেখাচ্ছিল। ওর ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে অন্ধকারে ঘটিটা হাতড়াতে থাকল। জল নেই। ছুটোছুটিতে জলের ঘটিটা উলটে গেছে। সে ভাবল জলের জন্য চিৎকার করবে, কিন্তু মনে হল ওর স্বর বসে গেছে। সে কেমন বোবার মত অন্ধকারে একটা অবলা বাছুর হয়ে গেল।

সুতরাং মানিকলালের কি যে এখন করণীয়—সে তার কিছুই বুঝতে পারছে

না। সে ঘেমে গেছে ভীষণ। ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এই অন্ধকারে মেয়েটা অযথা ভয় দেখাতে শুরু করল। এখানে পালিয়ে এসেও নিস্তার নেই। সে আবার কথা আরম্ভ করে দিল।—তুই আরতি মরে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস কেন। সকালটা হতে দে। আমার মালিক রাতে রাতে খবর পেয়ে যাবে। মালিক এলে তুই আমি এক সঙ্গে কা'ল সকালে শহরে চলে যাব।

কোন জবাব পেল না বলে বলল, তুই ত বলেছিলি একজন পুলিসের বাবু আসত তোর মায়ের কাছে। বর্ডার পার করে দেবে বলত। শোভা তুই ত বর্ডার পার হবি বলে পালিয়ে এলি! তোর বাঁজা পেটে কোন নদীতে ডুব দিলি।

এমন বীভৎস অবস্থায়ও ওর মুখ থেকে সব খিস্তি শব্দ বের হয়ে যাচ্ছে। সে নিজের উপর রাগ করে বসে থাকল। এখন আর যেন মেয়েটা জ্বালাচ্ছে না। বেশ চুপচাপ আছে। সুতরাং আবার সেই অনর্থক ছবি চোখের উপর। সেদিন মানিকলাল কি কারণে অসময়ে বাড়ি ফিরেছিল। ঘরে শোভা নেই। নদীর পারে শোভা চুপচাপ বসে আছে। মনে হচ্ছিল দূরে কে যেন বালির চরে হেঁটে যাচ্ছে। এবং ও-পারের ইস্টিশানে বাজনা বাজছে! সে বলল, ও তুই এখানে!

—আমি ঘরে যামু না।

—তোর এমন হয় কেন। মাঝে মাঝে তুই নদীর পারে এসে বসে থাকিস কেন?

শোভার চোখে জল পড়ত। বাবা মা তাকে বনবাসে রেখে চলে গেছে। সুন্দর এক যুবক, বয়স তখন তার বিশ বাইশ হবে—কলেজে পড়ত আলম, খুব ধীরে ধীরে কথা বলত, বড় বড় চোখে কলেজে যাবার পথে ওদের আমলকী গাছটার নিচে এলেই খুঁজত শোভাকে, শোভা আতা-বেড়ার পাশ থেকে বলত, আলম আমি আমলকী গাছের নিচে নাই। ঘরে আছি। জানালায় বইসা আছি। ওর মুখ মনে হলেই শোভা বড় আকুল হত। আলমের সঙ্গে একটা ভালবাসার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—ভয়ে মা-বাবা শোভাকে এ-পারে এসে রেখে গেল। আত্মীয় মানুষটির মজা লুটে খাবার লোভ বড় বেশি। তাকে লুটে খেতে এলেই সে তার বাবা মাকে চিঠি দিত। কিন্তু চিঠির কোন জবাব আসত না। সেদিন শোভার কি যে হয়েছিল—সে জীবনের সব কথা চিৎকার করে

বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল—আর শালা সে ত ড্রাইভার, কোথায় সে শোভাকে ভালবাসায় জয় করবে, তা না, সে পাছায় লাথি মেরে চিৎকার করে উঠল, মাগি তুই এত বজ্জাত। রাস্তায় পড়ে থাকতিস। ঘরে নিয়ে এলাম। একটা বাচ্চা বিয়োতে পারলি না।

সেই রাতেই শোভা পালিয়েছিল। বর্ডার পার হলেই পদ্মার পার, নদীর জল, ইলিস মাছ, শালুক ফুল। সুখ সুখ, অন্তহীন সুখ। তার বউটা বাংলা-দেশের সীমানা পার হবার জন্য পাগলের মত নিরুদ্দেশে চলে গেল।

মানিকলালের কিছুই ভাল লাগছিল না। সে দেয়ালে চেয়ে কেন জানি উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। কোথায় যেন মানিকলাল টের পেয়েছে বেঁচে থাকার মানে নেই। নাকি মানিকলালের কাছে এই ভয়াবহ রাতের চেয়ে মৃত্যু বেশি কাম্য! সে ক্রমে দেয়াল ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সে যেন তার এই লক-আপে পালানো বউকে খুঁজছে এখন!

আরতির মুখে এখন দুটো মশা বসেছে। থেতলানো মুখ থেকে রক্ত শুষে খাবে বলে হুল ফোটাচ্ছে। সাদা কাপড়ে বাঁধা। তবু দুবার পাছা উঁচু করে ঠোঁট থেকে রস চুষতে গিয়ে দেখল—একেবারে ঠাণ্ডা। শক্ত। মশা দুটো উড়ে মাঠে নেমে গেল। সাদা জ্যোৎস্না মাঠে। মশা দুটো সাদা জ্যোৎস্নায় উড়ে বেড়াতে থাকল।

আরতি তার রক্ত মাংসের ভিতরই পড়ে আছে। দেখলে মনে হয় সাদা কাপড়ের একটা পুঁটুলি। সকাল হলে মানিকলালের সঙ্গে মর্গে যাবে। কারণ মানিকলাল রাতের আঁধারের নানারকমের ভয়ঙ্কর সব ছবি ফুটে উঠতে দেখেছিল, চারপাশের নানা রকমের কিম্ভূত কিমাকার আলোর মায়াজালি, মনে হয়েছিল তার সবই অলৌকিক, জীবনযাপনে কোন আর মানে খুঁজে পাওয়া যায় না—ঠিক শালা হিন্দী ছবির মত, মাথামুণ্ডু যার কিছু ঠিক নেই; প্রেম ভালবাসা, রাহাজানি, খুনের দৃশ্য, মোটর রেস এবং নীল পতাকা নিয়ে ঘোরা যাচ্ছে। একজন সুন্দর মত মেয়ে পাশে পাশে গান গেয়ে চলেছে। মানিকলাল কখনও ঘোড়সোয়ার পুরুষ, আবার কখনও ঘোড়ার পায়ে ওর ঠ্যাঙ রজ্জুতে বাঁধা। ঘোড়াটা মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে। অথবা যুবতীরা ওর চারপাশে নাচছিল—কত হাজার লক্ষ যুবতী, যাদের কোন স্পষ্ট মুখ নেই, অবয়ব নেই—গাজির গীদের চাঁদপাতার মত চ্যাপ্টা নাক, চোখ মুখ সমতল, হাত পা শরীর

কাগজের মত ফিনফিনে পাতলা—তারা ওর চারপাশে নাচছিল—যেন তারা প্রত্যেকেই এক একজন শোভা। আর কেন জানি মনে হল তার ফসলের খেতে তখন পাখি উড়ছে। বর্ডার পার হবে বলে শোভা বসে আছে। কারা নিয়ে এল সেই যুবতীকে বর্ডার পার করে দেবে বলে। অথচ ফুসলে ফাসলে তাকে এ পারেই রেখে দিল—কোথায় আর যাবি ? বর্ডার পার হলে পদ্মার পার, ইলিশের ঝাঁক আর খুঁজে পাবি না। এইত আছিস বেশ। ক্যাম্পের ভাত রেঁধে দিবি, মুরকি খাবি। মাঝে মাঝে ঠ্যাঙ তুলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকবি। আমরা পুলিসের বাবুরা তোকে পদ্মার পার, ইলিশের ঝাঁক, নদীর জল সময় হলেই দেখিয়ে আনব।

মানিকলাল এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে কেমন পাগল হয়ে গেছে। সারাক্ষণ গারদের ভিতর সে পাগলের মত অন্ধকারে ছুটোছুটি করেছে। বনবাসী দেবী তাকে হাত ধরে একসময় কোথায় যেন তুলে নিয়ে এল। একটা ডালে সজীব নীলরঙের লতা—সেই লতার পোশাক তাকে পরতে বলল। এবার তুই নীচে ঝাঁপ দিবি। দেখবি সাধের জীবন হরেক রকম বাঁশি বাজায়।

বনবাসী দেবীর কথামত মানিকলাল নীল রঙের লতার পোশাক পরে বড় প্ল্যাটফরমে শেষ ট্রেন ছেড়ে দেবার বাঁশি বাজাল।

পরিবর্তে একটা টাকা দিয়ে ফেলেছেন এই সন্দেহে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রায় দৌড় দেওয়ার মত করে তিনি ফিরে আসছেন। তিনি ডাকছিলেন আলী, আলী— কিন্তু কাছে এসে দেখলেন আলী পূর্বের মতই হ্যাণ্ডেলে ঝুলে আছে। তিনি এবার যথার্থই লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন এবং যখন দেখলেন, লোকটা শীতে জমে গেছে তখন কর্তব্যনিষ্ঠ অর্থবিদদের মত সব পয়সা কটা তুলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্ধকারে মিশে গেলেন। এবং তিনিও যেন আজ শুনতে পেলেন একদল ঘোড়সোয়ার সৈনিক এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেইমানি করে এই পথ ধরেই ফিরে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দে আলীর দেহটা কাঁপছে।

শাদা অ্যাম্বুলেন্স

প্রথম ফুস্‌কুরিটা সে গোপনে দেখল। জানালা খুলে, হাতটা সূর্যের আলোতে রেখে দেখল। মনে হয় শ্বেতচন্দন দিয়ে কে ফোঁটা দিয়েছে। গায়ে জ্বর। সে জ্বর নিয়ে সারা বাড়ির কাজ করেছে। মেঝে মুছে রেখেছে। ড্রইং রুমের সোফা-সেট, বাতিদানের আধার এবং আলমারির কাচ ও জানলার শার্সি ঝেড়েমুছে তকতকে করতে গিয়ে তার মনে হয়েছে শরীরে ব্যথা, ভয়ঙ্কর রকমের ব্যথা, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কপাল টান ধরে আছে এবং কেমন একটা বমি-বমি ভাব। সে ঠিক করেছে এখন মাদুর পেতে এই ছোট্ট ঘরটিতে—(সে ঘরটাতে একাই থাকে)—গ্যারেজের উপর এই ছ-ফুট বাই আট-ফুট ঘরে শুয়ে পড়বে। ফুস্‌কুরিটা দেখেই ওর জল তেষ্টা পাচ্ছিল তীব্র। এখনই হয়ত ছোট দিদিমণি চিৎকার করবে, ওর কুকুরটা নিচে নেমে গেছে, কথা শুনছে না, ধরে আনতে হবে কুকুরটাকে। নীল রঙের কুকুর, লম্বা জিভ এবং বকলস পরালে বাঘের মতো—কুকুরটা তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। তাকে দেখলেই ওটা বেশি ছুটোছুটি শুরু ক'রে দেয়। সে এখন এ-সব পারে না। বয়স হয়েছে। সেই কর্তাবাবার আমলে সে এক কাপড়ে এখানে এসে উঠেছিল। এখন কর্তাবাবা নেই। ছোটবাবু আছেন। তাঁর দুই মেয়ে। মিলি আর লিলি। লিলি দিদিমণি ঘুম থেকে বড্ড দেরি ক'রে ওঠে। ওর ঘরের জানলা খুলে দিলে সে দিদিমণির লম্বা শরীর কতদিন প্রায় উলঙ্গ দেখেছে। লিলিদিদি ওকে আর মানুষের মতো মান্য করতে চায় না কুকুরটা শুয়ে থাকে খাটের নিচে। উপরে লিলিদিদি। সিল্কের গাউন এবং চুলের ফিতে শাদা রঙের। আশ্চর্য রক্ত লিলিদির শরীরে। কুকুরটার যেমন ঢুকে যাবার নেই মানা, ওরও তেমনি মানা নেই। সে যেন কিছু দেখে না, ঘর সাফসোফ ক'রে দেয়, ঘরের বইপত্র সাজিয়ে রাখে, ফুলদানিতে ফুল দিয়ে যায় ভোরে এবং অলস সূর্য জানলায় নেমে এলে সে শুধু ডাকে—লিলিদি তোমার কফি। সকালে কফি না খেলে লিলিদির ঘুম ভাঙে না। বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারে না।

সুতরাং এক্ষুনি ডাকবে তাকে। লিলিদি ডাকলে আর নিস্তার নেই। সে যে

জ্বরে ভুগছে, একথা এখন বলতে পারছে না। সে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিল। ছোটাবাবুর যা কিছু পুরনো ছেঁড়া পাঞ্জাবি, কাপড়, যা আর গায়ে দেওয়া যায় না—তার দুটো একটা তাকে দিয়ে দেন। সে সেই পাঞ্জাবি শরীরে গলিয়ে নিয়েছে। হাতটা ঢেকে রেখেছে। কারণ সকাল থেকেই সে লক্ষ করছে দুটো-একটা ফুস্কুরি দেখা দিচ্ছে। জল নিয়ে বেশ টস্‌টসে। সে সবই ঢেকেঢুকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন লিলি দিদিমণি ডাকলেই ভয়। বাইরে বোগেনভেলিয়ার ডালপালাগুলি বাতাসে নড়ছে। কুকুরটা সেই ডালপালায় কি যেন শিকার খুঁজছে। সে ভাবল, দিদিমণি ডাকলে সাড়া দেবে না। বরং শরীরের যা অবস্থা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লে ভাল। কিন্তু ভয়—সে যেন শুয়ে পড়লেই ধরা পড়ে যাবে। তোমার কি হয়েছে সুবল দাদা। তুমি শুয়ে আছ কেন! ডলি (কুকুরের নাম) কি দুষ্টুমি করছে দ্যাখো। একেবারে সারাটা দিন লিলি দিদিমণি কচি খুকির মতো থাকে। যেন শরীরে কিছুই গজায় নি। কিছু বোঝে না জানে না মতো। অথচ সাজেপোষাকে শরীরের সব উঁচু ক'রে রাখার বাসনা। এ সব ভাবতেই সে কেমন জিভে কামড় দিল। সে কর্তাবাবার আমল থেকে আছে, বিশ্বাসী মানুষ। ওরা যখন সবাই উটি চলে যায় হাওয়া বদলাতে তখন সে বাড়িতে একা থাকে। কুটোগাছটি পর্যন্ত কেউ সরাতে পারে না। সুতরাং, বিরক্ত মুখে সে লিলি দিদিমণির অথবা মিলি দিদিমণির সম্পর্কে কিছু অশ্লীল চিন্তা ক'রে ফেলে নিজেই জিভে কামড় দিলে, শুনল, ডাকছে লিলি দিদিমণি, না কি ছোট মা ডাকছে, গলার স্বরটা সে কেন জানি বুঝতে পারল না, জ্বরের জন্য হয়ত হবে, কারণ তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, চোখমুখ লাল, সে সকাল থেকেই দূরে দূরে থেকেছে। তার কোনোদিন কোনো অসুখ হয় নি, হলে সে নিজেকে বড় ছোট ভাবত, অসুখ হওয়াটা ওর পক্ষে কৃতিত্বের ব্যাপার নয় সে জানে। আজ এই যে এত বছর পর শরীরে জ্বর এসে গেল—এবং দু একটা ফুস্কুরি ভেসে উঠছে শরীরে, কোমর, হাত পা ভীষণ কামড়াচ্ছে, সে দাঁড়াতে পারছে না ভালমতো, এখন যে সে কি করে! ছোটমা না লিলি দিদিমণি ডাকছে তা পর্যন্ত সে বুঝতে পারছে না। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তার কি করা কর্তব্য এখন, বাতাসে ফুঁ দেবে না দূর থেকে সব কথা শুনে চলে আসবে! সে যাই হোক কিছু ভাববার আগেই ছোটমা কেমন সিঁড়ির মুখে তড়তড় ক'রে নেমে এল, এই সুবল তোমাকে যে ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না?

—হ্যাঁ মা শুনতে পাচ্ছি, বললেই শুনতে পাব।

—বাজার থেকে এক কিলো মুরগির মাংস নিয়ে আয়।

—আর কি লাগবে ?

ছোট মা বললেন, দাঁড়া। বলে উপরে উঠে গেলেন, ফ্রিজ খুলে কি দেখলেন, তারপর বললেন, না আর কিছু লাগবে না।

সুবল মার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে উপরে গেল, টাকা নিল এবং নেবার সময় দেখল মুখের দিকে তিনি হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন। হ্যাঁরে সুবল, তোর অসুখ করেছে !

—না মা অসুখ করে নি।

—চোখ মুখ এত লাল !

—রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

—কুকুরটা বুঝি জ্বালিয়েছে ?

—না মা কুকুরের দোষ কি। সে আমার ঘরে শোবে না লিলি দিদিমণির ঘরে শোবে ঠিক করতে পারে না। দিদিমণি দরজা খুলে শোয়, আমার শুতে ভয় করে।

ছোটমা হেসে দিলেন। সুবল হাবাগোবা লোক। বয়স হয়েছে। প্রৌঢ় বলা চলে। মিলি-লিলির সে জন্ম দেখেছে। সে ওদের কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে। তবু যে কেন সুবল ভয় পায় !

ছোটমা বললেন, তোর তো কোন অসুখ করে না জানি।

—হ্যাঁ মা, আমার অসুখ করে না। মনে পড়ে না—

—অসুখ হয় না তোর কি যে হিংসে হয় না তোকে !

—তা মা আমার এইটা আছে হিংসা করার মতো। কোন অসুখ হয় না।

—আর আমায় ছাখ—এই বলে ছোট মা আর কিছু দেখালেন না। কথা অর্ধেক পথে বন্ধ ক'রে দিলেন। এত বেশি কথা তিনি কখনও সুবলের সঙ্গে বলেন না। বলে ফেলে তিনি নিজেই কেমন তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন।...তাড়াতাড়ি ফিরবি।

—ফিরব মা।

—তোর এ একটা অসুখ আছে। বাড়ির বাইরে গেলে আর ফিরে আসতে চাস না !

তা মা আমার এই একটা অসুখ কি ক'রে যে হয়ে গেল !

সত্যি ওর এই একটি মাত্র অসুখ। বাইরে বের হলে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয় না। কতলোকের সঙ্গে তার পরিচয়। সকলের সঙ্গে সে একটা যেন

সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে। রাস্তার মোড়ে নন্দী মশাইয়ের কাপড়ের দোকান, পরে পালবাবুর চায়ের দোকান, এবং বড় পথ ধরে গেলে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে একটা মানুষ বসে থাকে, চুল দাড়ি কামায়—তার সঙ্গে দেখা হলেই—এই যে দা, মুরগির মাংস আনতে যাচ্ছ।—কেবল ওদের খোঁটা দেবার স্বভাব—এত মুরগি খায় কি ক'রে? দুবেলা মুরগি-তাজা মুরগি—আহা ওরা যেন সুবলের মুখ দেখলে বড় বাড়িটা যে সুন্দর সুন্দর মুরগির কলিজা সিদ্ধ ক'রে খায় তা টের পায়। পরে বের হলেই সুবলকে এ ও ডাকবে, কথা বলবে, মেয়ে দুটোর খবর নিতে চাইলে সে জিভে কামড় দেবে—ওদের কিছু বেলেল্লাপনা, অথবা চটুল চালচলন এইসব মানুষের চোখে লাগে—ওরা যেন সুবলকে কাছে পেলে—সব রাগদুঃখ উজাড় ক'রে দিতে চায়। সে সেজন্য যতটা পারে ওদের কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে অথবা কোনো কোনোদিন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বসে থকেলে তার কেন জানি একটা আবাসের কথা মনে হয়, সে তার পুত্র সন্তানটিকে যে কোথায় কার কাছে গচ্ছিত রেখে চলে এসেছিল এখন যেন সব মনে করতে পারে না। বৌটা পালিয়ে গেলে সে উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিল—সে এ-দেশে এসে অভাবের সঙ্গে লড়তে পারে নি। বৌটা তার স্বজন ফেলে একা বাউণ্ডুলে মানুষের সঙ্গে ভেগে গেল। সুতরাং সে মুরগির মাংসের জন্য অথবা অন্য কোনো কাজে বের হলে চুপচাপ হাঁটে—হাঁটতে হাঁটতে সে তার স্মৃতিতে ফিরে যায়। এবং কি ক'রে যেন দশটা পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর দেরি হয়ে যায়—সে টের পায় না কত আগে বের হয়েছে। বাড়ি ফিরে গেলেই ছোটমা একেবারে রণমূর্তি। মায়ের আঁচল পর্যন্ত তখন ঠিক থাকে না। কুকুরটা শুয়ে কুঁই কুঁই করতে থাকে। সুবল একেবারে নির্বিকার। যেন এই চিৎকার চেঁচামেচি সে আদৌ শুনছে না। সে তার কাজ ক'রে যাচ্ছে। কারণ এ-বাড়িতে ছোটবাবু তার আপনার জন। একমাত্র তিনিই তার দুঃখটা ধরতে পারেন। বের হবার সময় সে মুরগির মাংস কিনে তাড়াতাড়ি ফিরবে এমন ভাবল।

কিন্তু পথে বের হতেই ওর ভেতরে একটা ভয় লেগে গেল। সে এতক্ষণ ঘরের ভিতর ছিল। ছায়া ছায়া অন্ধকারে বোঝা যায় নি, ওর মুখে মুসুরির মতো দুটো-একটা গোটা দেখা দিচ্ছে। সে যে এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে চাদর গায়ে দিলে পারত। এবং অর্ধেকটা মুখ তবে ঢেকে রাখা যেত। এই গরমে চাদর গায়ে দিলেই অবিশ্বাস বাড়বে। আরে তুমি কি পাগল, চাদর গায়ে, এই সকালের রোদে বের হয়েছ! না কি তোমার জ্বরটর

আছে শরীরে! অসুখ হয়েছে তোমার! সে সুতরাং চাদর গায়ে দিতে পারে না। সে প্রায় হনহন ক'রে হাঁটতে থাকল। যদি বলে কেউ, অ সুবল, তোমার মুখে ও-সব কি উঠেছে!

সে বলবে, আর কবেন না কর্তা মুখে আমার ব্রনো উঠেছে।

—এই বয়সে ব্রনো, তুমি কি বাবা রাত জেগে ছোট দিদিমণির হালকা শরীর স্বপ্নে ত্যাখো না কি?

—ছি ছিঃ, কি যে বলেন! ওদের আমি কাঁধেপিঠে মানুষ করেছি। ওরা আমার…

—ওরা তোমার কি?

সে আর যেন মনে মনে কোনো উত্তর পায় না। সে শুধু হনহন ক'রে হাঁটে। ওকে তাড়াতাড়ি মাংস নিয়ে ফিরতে হবে। মুরগিকে সাধু ভাষায় কি বলে, কুক্কুট। কুক্কুটের মাংস!

সে বাজারে ঢুকলেই লোকগুলি ওর দিকে বেশি ক'রে তাকাতে থাকল। শরীরে কি যে কষ্ট! চোখমুখ ফেটে যাচ্ছে মতো। মনে হয় শরীরটা তার ফুলে যাচ্ছে, এত বিষ ব্যথা। সে আহা-উহু করতে পারলে কিছুটা আসান পেত। কিন্তু যেভাবে লোকগুলি ওকে দেখতে আরম্ভ করেছে, তাতে তাকে নির্বোধের মতো দেখাচ্ছে। নির্বোধ না হলে এমন মুখ নিয়ে কেউ বাজারে আসে।

সে মুহূর্ত দেরি করল না। যতটা তাড়াতাড়ি পারল, যেন এখন সে বাজার থেকে চুরি ক'রে পালাচ্ছে, হাতে কুক্কুটের মাংস, গায়ে বসন্ত ফুটে ফুটে বের হচ্ছে। এবং মুখে চার-পাঁচটা মাত্র গোটা, একটু বেলা হলেই ওগুলো বেড়ে যাবে সংখ্যায়—সে তাড়াতাড়ি একটা নিমগাছের নিচে এসে দাঁড়াল। কিছু নিমের পাতা পকেটে পুরে হাতে কুক্কুটের মাংস নিয়ে হাঁটতে থাকল। তখন সে দেখল একদল মেয়ে-পুরুষ, হাতে তাদের লাঠি সড়কি, এবং লাল নিশান—ওরা বিপ্লবের ধ্বনি দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছা হল কুক্কুটের মাংস হাতে নিয়ে সেও সেখানে ভিড়ে যায়। গনগনে রদ্দুরে ওর শরীরে মুখে যা সব বের হচ্ছে তা বিষের মতো সারা শরীরে গলে পড়ুক। হাফ-ডেড হয়ে বেঁচে থাকতে আর ওর ভাল লাগছে না। সে দিদিমণিদের মতো ইংরেজি উচ্চারণ করল।

বাড়ির ভিতর ঢুকেই সে সদর বন্ধ ক'রে দিল। দুপাশে নানারকমের মৌসুমি ফুলের চাষ। টবে সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুটে আছে। ব্যালকনিতে হাল্কা পোষাকে লিলি দিদিমণি চুলে ক্রিম মাখাচ্ছে। অথবা এই যে বাগানে এতসব

ফুল ফুটে আছে, বড় রাস্তায় বাসট্রাম যাচ্ছে এবং নির্বোধের মতো মুখ নিয়ে সুবলদা ফিরছে কুক্কুটের মাংস নিয়ে– তার কাছে এসব অর্থহীন। শরীরে কোমল নীল রঙের এক মৌমাছি কেবল হুল ফোটায়। বড় আকাশ মাথার উপর থাকলেই লিলি দিদিমণির অন্যমনস্ক হতে ভালো লাগে।

সুবল সিঁড়ি ধরে দোতালায় উঠে যাচ্ছে। সিঁড়িতে কি সুন্দর কার্পেট! দুপাশে পেতলের ভাসে সব নানা বর্ণের মানি প্ল্যান্ট এবং পরিচ্ছন্ন সংসার, সুবল হাতে ক'রে মানুষ করছে। সে যেতে যেতে দেখল দুটো পাতা শুকনো মানি প্ল্যান্টের, পাতা দুটো ছিঁড়ে ফেলল। সুবলের জন্য এই বাড়িতে কোথাও কুটোগাছটি পড়ে থাকবার জো নেই। সে ঝেড়েপুঁছে সব তকতকে ঝকঝকে ক'রে রাখে। বরাবরের এটা অভ্যাস সুবলের, বাবু অথবা ছোটমা বাড়ি থাকুক আর না থাকুক, সে বাড়ির এইসব মানি প্ল্যান্টের মতো চুপচাপ এখানে, দীর্ঘকাল পড়ে আছে। ওর কোনো নালিশ ছিল না। কোনো অসুখ ছিল না, কি যে বিড়ম্বনা হয়ে গেল—এই অসুখ নিয়ে সে এখন কি করবে—তার এত কাজ, শুয়ে থাকলে চলবে কেন, আর সে পরম বিশ্বাসী মানুষ, অসুখ নেই বলে সংসার তাকে নানারকম সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকে—সে দুপুরের পর একটু ঘুমোতে পায়। কেউ তখন ওকে জ্বালাতন করে না। কুকুরটা পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে ভয় পায়।

দোতালার বারান্দায় ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। সে একটু ঘুরে গেল, যেন ওদিকটায় সে ছোটমার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে—কুক্কুটের মাংস, দাম এবং পয়সা এসব সম্পর্কে সামান্য কথাবার্তার জন্যে। সে মুখটা ঘুরিয়ে হেঁটে হেঁটে ছোটবাবুকে পার হয়ে গেল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে মনে হল, ছোটবাবু তাকে তখনও দেখছে। সে একেবারে ছুটে এবার বাথরুমের পাশে যে ঘরটায় এখন লিলি দিদিমণি কাপড় ছাড়বেন তার পাশে গিয়ে ব্যাগটা রেখে দিল। সে আর এই ঘুপচিমতো জায়গা থেকে নড়ল না। দিদিমণির হয়ে গেলে সে একেবারে সায়া ব্লাউজ কাপড় সব ধুয়ে নিচে নেমে গিয়ে শুয়ে পড়বে। নতুবা মাথা ঘুরে পড়ে গেলে সে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।

ছোটবাবু ব্যালকনির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন– তাঁর মনে হল সুবল কেমন তাঁকে আজ এড়িয়ে চলেছে। মুখটা ভার-ভার, লালচে মতো। যেন কিছু হয়েছে। তিনি আজ ছুটির দিন বলে কোর্টে বের হন নি। বিচারক মানুষ। মনটা সহজেই খুঁতখুঁত করতে থাকল। সে কি কোনো অপরাধ ক'রে ফেলেছে —যা আজকালকার দিন, কিছুই বিশ্বাস নেই, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে, ডাকলে

কাছে আসছে না, দূর থেকে জবাব দিচ্ছে—চোখ মুখ ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে—কি যে করবেন এখন, কি করলে বিচারকের মতো দৃঢ়তা দেখানো হয়—ভেবে তিনি ডাকলেন, সুবল, সুবল আছিস !

—আজ্ঞে যাই, ছোট হুজুর। বলেই সে এক দৌড়ে দরজার পাশে নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। যেন ছোটবাবু ওর ভাসুর ঠাকুর। সে গ্রাম্য বিধবা বৌয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে শরীর ঢেকেঢুকে একপাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবলের সহসা এ সংকোচবোধ দেখে ছোটবাবু না হেসে পারলেন না। তিনি বললেন, কিরে তুই ওখানে দাঁড়ালি কেন ?

—আজ্ঞে।

—কাছে আয়।

সুবল নড়ল না।

—তোর মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন রে ?

—কেমন দেখাচ্ছে ছোট হুজুর !

—কাছে আয় বলছি।

সে আর পারল না। সে হুজুরের পায়ের কাছে একেবারে ভেঙে পড়ল—হুজুর আমার শরীরে গোটা উঠেছে।

কেমন আঁৎকে উঠলেন তিনি ! বলিস কি ! টিকে নিস নি ?

—নিয়েছি হুজুর।

—দেখি মুখটা। বলে ভাল ক'রে আলোতে নিয়ে দেখলেন।—তুই এই নিয়ে বাজারে গেলি ! হাওয়া লাগাচ্ছিস শরীরে !

—হুজুর আস্তে। ছোটমা জানলে কুরুক্ষেত্র করবে।

রাখ তোর কুরুক্ষেত্র ! চুপচাপ গিয়ে শুয়ে থাক। মশারি টানাবি। একদম বের হবি না।

—কে একদম বের হবে না ! ছোট মা শুনে একেবারে ছুটে এলেন।

—তোমাদের সুবল।

—কেন কি হয়েছে ?

—পক্স হয়েছে।

—মানে !

—মানে পক্স। পক্স বোঝ না ! মুখে দ্যাখো না—এই সুবল একটু ঘুরে দাঁড়া।

—অমা····তবে কি হবে !

মিলি মায়ের চিৎকার শুনে ছুটে এল। ছোটমা দুহাতে মিলিকে ঘরে ঢুকতে বাধা দিলেন। সর্বনাশ ! এখন কি হবে !

মিলি বলল, কি হয়েছে মা ?

চোখ লাল ক'রে ছোটমা বললেন, তুমি যাও। যা করছিলে করগে।

মিলি এখন কাপড় ছেড়ে এসেছে। সে স্নান করেছে। শরীরের সর্বত্র ঠাণ্ডা ভাব। চন্দনের গন্ধ শরীরে। চোখেমুখে কমনীয় ভাব। এবার গিয়ে মিলি আয়নায় বসবে। মুখে পাউডার দিয়ে থুয়ে বের হলে সে দেখতে পাবে, তার মুখেও গুটি উঠে গেছে ! সে শুনেছে, শুনে ফেলেছে, শুনে ছুটে গেছে লিলির ঘরে, ওঠ দিদি, এখনও তুই গল্পের বই পড়ছিস—কি হযেছে জানিস না ! সুবলদার পক্স হয়েছে।

এই এক ব্যাপার—যেন প্রায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে—ছুটোছুটি, এমন সুন্দর সুন্দর সব মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—আয়নার পাশে দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে গুটি উঠে এমন সুন্দর ভালোবাসার জন্য উদাস মুখ এবং এমন চোখের নিচে কাজল সব নষ্ট ক'রে দেবে—এই তিন যুবতী, ছোটমা এই বয়সেও নিজেকে যুবতী ক'রে রেখেছেন—যেন বয়স বাড়ে না তাঁর, মুখে রেখা পড়ে না, কেবল খুকি খুকি, ওলো সখি ভাব—সে যে এখন কি করবে, সুবল ছোট-মার দিকে তাকাতে পারছে না—চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এতদিনের বিশ্বাসী মানুষটা এই বাড়িতে সে এতদিন আছে—কোনোদিন কোন অবিশ্বাসের কাজ সে করে নি, আজ সে যে এটা কি ক'রে বসল ! ছোটমার জোরে জোরে পা ছড়িয়ে প্রথম কাঁদতে ইচ্ছে হল। না এখন কাঁদার সময় নয়, একটা বিহিত করতে হবে—কুকুরটা এদিকে নেই—যা লোভ এই কুকুরের, সব মুরগির মাংস না আবার খাবলা খাবলা খেয়ে নেয়—কুকুরটা কোথায় রে ?

লিলি বলল, সুবলদার ঘরে।

—ওটাকে ওর ঘর থেকে নিয়ে আয়।

—যাচ্ছি। দূর থেকে জবাব দিল লিলি।

—মাংস ফ্রিজে তুলে রাখ।

—রান্না হবে না মা ? লিলি বই ভাঁজ ক'রে চিৎকার ক'রে জানতে চাইল।

—রাখ তোর মাংস। এখন তোমাদের বাঁচাতে পারলে হয়।

—কি আরম্ভ করলে তুমি ! ছোটবাবু ধমক না দিয়ে পারলেন না।

—এত বড় সর্বনাশ ! আর তুমি বলছ আমি কি করেছি !

—মানুষের তাই বলে অসুখ বিসুখ করবে না!

—তাই বলে এই অসুখ! যার কোনো ওষুধ নেই। যা এত সংক্রামক, বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। সে আর অন্য অসুখ খুঁজে পেল না। পষ্ট পষ্ট ক'রে বলেছি বাইরে বেশি সময় কাটাবি না!

—তুমি সর। ওকে যেতে দাও। ওর ঘরে চলে যাক্। বেচারা দাঁড়াতে পারছে না। কাল থেকেই দেখেছি কেমন সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে।

—কাল থেকেই হয়েছে! তবে ত সোনায় সোহাগা! সব জড়িয়ে এখন তিনি আমায় উদ্ধার করতে যাচ্ছেন।

—তুমি সর বলছি!

—আমি সরছি। কিন্তু সুবল ঘরে থাকবে না।

—তার মানে!

—মানে সোজা। কে ওর পচা গলা শরীর দেখাশোনা করবে!

—কেন তুমি!

—আমি পারব না।

—লিলি মিলি!

—ওদের বিয়ে দিতে হবে না!

—ঠিক আছে আমিই করব।

—এত বুঝি সোজা!

—ছোটবাবু সামান্য হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলেন। ছোটবৌয়ের চোখের দিকে তিনি তাকাতে পারছেন না। ভয়, ভীতি এবং বিস্ময়ে চোখ দুটো কেমন ছোট হয়ে গেছে। তিনি যে দৃঢ়তাটুকু দেখাবেন স্থির করেছিলেন, স্ত্রীর এমন ভয়াবহ চোখ দেখে তা আর দেখাতে পারলেন না। তিনি শুধু ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক আছে, এখন তুই সুবল গিয়ে শুয়ে থাক। দেখি কি করতে পারি।

সুবল বলল, ও ঠিক আছে বাবু। আমার খাবারটা জলটা বাইরের ঘরে রেখে যাবেন—আমি সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাব। এই বলে সুবল নেমে যাচ্ছে এমন সময় ছোটবৌ ডাকল, সুবল তুমি ও-ঘরে ঢুকবে না।

—আমি কোথায় যাব তবে মা।

—কটা ত দিন। কোথাও গিয়ে থাক। তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই?

—সে তো সবই জানেন।

—তার জন্যে অসময়ে কোন আত্মীয়স্বজন থাকবে না সে কি ক'রে হয়! তুমি বরং সুবল, তোমার বিছানা নিয়ে কিছুদিন আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে এস।

সুবল বুঝতে পারল, ছোটমা সাহস পাচ্ছেন না। সে বলল, ঠিক আছে মা। আমি রাস্তায় গিয়ে নিমগাছটার নিচে শুয়ে থাকব।

—সেই ভাল।

—সেই ভাল মানে! ছোটবাবু আর নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারলেন না। কিন্তু সুবল জানে ছোটবাবু ভীতু গোছের মানুষ। যখন ছোটমা কোন রকমে পারবেন না—তখন কেমন একটা অসুখের ভান ক'রে বিছানায় সারাদিন শুয়ে থাকেন, চোখমুখ বসে যায়—অদ্ভুত রহস্যজনক এক অসুখ ছোটমা ভিতরে তখন পুষে রাখেন। ছোটবাবুর আর তখন চিন্তার শেষ থায়ক না—তিনি আর ছোটমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান না। তখন শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ভালোবাসার কথা বলেন, পৃথিবীতে এই ছোটবৌ বাদে তাঁর আর কে আছে—একেবারে মলিন মুখ তখন সহসা নির্মল হয়ে যায়। ছোটবৌয়ের ঠোঁটে সামান্য হাসি ভেসে উঠলে তিনি নিশ্চিন্ত। সুতরাং সুবল বুঝতে পারল শেষ পর্যন্ত ছোটমা-ই জয়ী হবেন—সে আর দাঁড়াল না—মাদুর বগলে ক'রে রাস্তায় নেমে একটা বড় গাছের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল।

সুবল হাঁটতে থাকল। বগলে মাদুর, হাতে একটা পেতলের ঘটি আর ছেঁড়া বালিশ। সে হাঁটছে। খর রোদে ট্রামবাস পার হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার লোকগুলি ওর মুখ দেখে আঁৎকে উঠছে—অথচ কিছু বলছে না—যে যার মতো বাড়ি ফেরার তালে আছে—অথবা অফিসে কাছারিতে গিয়ে গল্প করবে, শালা কলকাতায় আর বসবাস করা যাবে না, রাস্তায় এখন লোকজন মুখে শরীরে পক্স নিয়ে চলাফেরা করছে। মানুষজন যা হয়ে যাচ্ছে—ফুটপাথে বাচ্চা দিচ্ছে, এসব যে দিনে দিনে কি হচ্ছে, কি হচ্ছে শালা—বলে ওরা হয়ত গপ্‌প ক'রে পান খাবে এবং বাড়ি গিয়ে বিবি নিয়ে শুয়ে থাকবে।

সুবল একটা ছায়ামতো জায়গা খুঁজছে। তার আত্মীয়স্বজন বলতে ছায়ামতো জায়গাটা এবং নিচে সে শুয়ে থাকলে গাছের পাতা মুখের উপর ঝরে পড়তে পারে—নিমগাছ হলে ভাল হয়, মারিমড়কের দেবী নিমগাছের হাওয়া সহ্য করতে পারে না। বাড়ির কাছে একটা নিমগাছ আছে, কিন্তু সেখানে শুয়ে থাকলে পাড়ার লোকেরা চিনে ফেলবে এবং ছোটবাবুর ওপর গিয়ে হামলা করতে পারে—যে সেজন্য রেলিং দেওয়া পুকুর পার হয়ে এল, বড় বড়

দালান কোঠা পার হয়ে এল, বাগানে নানারকমের ফুল ফুটে আছে, গ্রীষ্মের দিনেও নানারকম ফুল ফোটে—ও জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে হাঁটতে হাঁটতে কম দূর চলে আসে নি! যারাই দেখছে সরে যাচ্ছে। রাস্তায় লাল নিশান হাতে নিয়ে জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য এক দল মানুষ চেল্লাচিল্লি করছে। সুবল এখন রাস্তা পার হতে পারছে না। ওরা পার হয়ে গেলে, সে ঐ দূরের গাছটা, মনে হচ্ছে গাছটা নিমগাছই হবে, সে গুটি গুটি পা পা ক'রে হেঁটে হেঁটে সেখানে এবার চলে যাবে। আর সব সুন্দর, কাছেই একটা টিপকল আছে, ডানদিকে চায়ের দোকান, মানুষজনের ভিড় তেমন নেই—নিরিবিলি জায়গাটার জন্যে ওর লোভ বেড়ে গেল। সে জনগণতান্ত্রিকের দলটা পার হয়ে গেলেই সেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। না কি সে ওদের সঙ্গে মিলে গিয়ে এবার নেমে পড়বে! আমি এক হা-অন্নের মানুষ, অসুখ করলে পাপ, ছোট দিদিমণি হালকা পোষাক পরে এখন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর রেকর্ড-প্লেয়ারে রেকর্ড বাজাচ্ছে এবং ডেটল দিয়ে সারা বাড়ি ছোটমা কর্পোরেশনের মেথর ডেকে ধুয়ে দিচ্ছেন। একটা অশ্লীল কথা জিভে এল! সুবল নিজের জিভে গপ্ ক'রে কামড় দিল।

বস্তুত যুদ্ধ আর কোথাও হচ্ছে না। রক্তের জন্য, সংগ্রামের জন্য এবং বেঁচে থাকার জন্য ক্রমান্বয় যুদ্ধ চাই। সে তাকাল উপরের দিকে। গরমকাল বলে দরজা জানালা বন্ধ। ভিতরে ঠাণ্ডায় সব বৌ-বিবিরা এখন শরীর ঠাণ্ডা করছে। বাবুরা অফিস কাছারি থেকে ফিরে এলেই আবার ধকল যাবে শরীরে এখন শুয়ে বসে লম্বা হয়ে শরীর ঠিকঠাক ক'রে নেয়া—সুতরাং দরজা জানলা বন্ধ, সে সেইসব দরজা জানলার নিচে একটা বড় মতো নিমগাছের ছায়ায় মাদুর বিছাল। হাত-পা ঝাঁ ঝাঁ করছে, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কতক্ষণে গড়িয়ে পড়বে। এক ঘটি জল নিয়ে এলসে। মনে হল ওপাশে একটা খুপরি মতো ঘরে দুটো রাস্তার ছেলে ওকে দেখছে। সে জল এনে শুয়ে পড়লেই গুটি গুটি সেই দুই রাস্তার বালক পাশে এসে দাঁড়াল। বেশ কৌতূহল নিয়ে ওরা সুবলকে দেখছে। মুখে বড় বড় গোটা, জল নিয়ে একেবারে বেথুন ফলের মতো টসটসে হয়ে আছে। সুবল চোখ বুজে ছিল, টের পায় নি, দুজন নাবালক ওর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের নিশ্বাসের শব্দ সে যেন টের পেল এবং চোখ তুলে তাকালে দেখল—ওরা ওকে দেখে ফিক্ ক'রে হাসছে।

—তোরা কে রে?

—আমরা? ওরা এইটুকু বলেই চুপ ক'রে থাকল। ওরা যে কে ওরা ঠিক

জানে না। সুবলও যেন টের পেল ওরা যে কি ওরা যেন জানে না। সে এতদিন কিন্তু এমন অনেক নাবালক ফুটপাথে পড়ে থাকতে দেখেছে। তারা কে কেন এই ফুটপাথে—এমন কথা ওর একবারও মনে হয় নি! মনে হলেও সে এমন ভাবত কৃতকর্মের জন্য তুমি পাপ ভোগ করছ। কৃতকর্ম! শালা জীবনে কোনো কর্মই করলি না, তোর আবার কৃতকর্ম! সে এবার মুখ বিকৃত ক'রে ফেলল। কথা বলতে ভাল লাগছে না। কেবল চুপচাপ পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে এবং আঃ-উঃ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। পরক্ষণেই সে দেখল, ওরা একজন মাথার কাছে অন্য জন শিয়রে—শালারা কি যমের দূত! সে বলল, এই তোরা কোথায় থাকিস!

ছোট বাচ্চাটি আঙুল কামড়াচ্ছিল। কোথাও না, ওরা কোথাও থাকে না যখন যেখানে থাকে তখন সেই অঞ্চলটা নিজের বলে ভেবে নেয়। এখন এখানে আছে, সুতরাং বলল, আমরা এখন এখানে আছি।

—জলটল লাগলে এনে দিতে পারবি? তারপরই সুবলের মনে হল, ওর শরীরে সংক্রামক ব্যাধি। মা দয়া করেছে ওকে। সে বলল, এখানে আসবি না। এলে তোদের অসুখ করবে। মারিমড়কের দেবী শালা তোমাদের প্রেমে পড়ে যাবে।

ওরা যেভাবে মাথার কাছে পায়ের কাছে ছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। ওদের কেন জানি এই মানুষটাকে নিজের লোক বলে মনে হয়। ভাঙা একটা টালির ঘরে, আগে কাঠ চেরাই হতো, এখন কিছু হয় না, ঘরটায় ওরা এই ভরদুপুরে শুয়ে থাকে, রাতে এই নিমগাছটার নিচে। এখন একটা লোক এসে জায়গাটার দখল নিয়ে নিয়েছে। ওদের আশেপাশে কোথাও একটা জায়গা ক'রে নিতে হবে।

—তোরা সরে যা। দাঁড়িয়ে থাকলে আমার মতো তোদেরও হবে।

—তোমার জলটল আনতে হবে বলেছিলে!

—না কিছু লাগবে না, আমাকে ঘুমোতে দে।

—ওরা দুপুরে এবার ছুটে বেড়াতে থাকল। কোথাও কিছু নেই, অথচ কি আনন্দে যে ছুটছে এই ভরদুপুরে—মুক্ত পুরুষ,-শুধু দুটো অন্নসংস্থান, তা এ-পাড়ায় এসে ওদের এখন চিন্তা করতে হয় না—কারণ সকাল সকাল নানারকমের বাসি খাবার দোতলা-তিনতলা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, দিনমান ঐ খেয়ে বেশ সুখে দিব্যি চলে যাচ্ছে, স্নান ক'রে আসলে হয়, কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন ভাবটা ভাল নয়, তবে ওদের দেখলেই বলবে বাবুরা, এই যাবি, কাজ

করবি—তাই নোংরা, যতটা পারা যায় শরীর, চোখমুখ, চুল নোংরা ক'রে পড়ে থাকা—তারপর নির্বিবাদী হয়ে দিনমান সম্মুখ সমরে—এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে—যা মুখে মনে আসে আওড়ায়, কারণ বড় বড় পোস্টারগুলোর লেখা ওরা দুজন কোনো কোনোদিন বাজি ধরে পড়তে বের হয়। কে কতটা পোস্টার পড়েছে তার একটা প্রতিযোগিতা ওদের ভেতর।

ছোট নাবালকটি বড় বড় চোখে একটা পোষ্টার পড়তে গিয়ে থমকে গেল। বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে। যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও।

সে বড় ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গেল—একটা ভাঙা পাঁচিলে কে এঁটে দিয়ে গেছে পোস্টারটি। ওরা দুজনই কোনো অর্থ ধরতে পারল না। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ওরা সেই নিমগাছটার নিচেতে এসে দেখল, বুড়ো মানুষটি নেই। অ্যাম্বুলেন্স এসে এইমাত্র নিয়ে গেছে। ওরা ভেবেছিল, বুড়ো মানুষটাকে অর্থ জিজ্ঞাসা করবে—কি মানে? এই যে লেখা—বড় বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে, যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও—এসব কথার কি মানে—কারা লিখছে! কেন লিখছে! দেয়ালে দেয়ালে সব নানারকমের আশার কথা লেখা হচ্ছে—কবে থেকে হবে এটা! ওদের মনে হয়েছিল বুড়ো মানুষটাই একমাত্র এর জবাব দিতে পারে। কিন্তু এসে যখন দেখল নিমগাছের ছায়ায় কেউ নেই, কেবল মাদুর পড়ে আছে, তখন ওরা মনমরা হয়ে মাদুরটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল। এবং সারাদিন ঘুরে আর কিছু করতে ভাল লাগল না। গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

বোধহয় কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠেছে। এই নিরিবিলি গাছটার নিচে শুয়ে থাকলে বোঝা যায় কখনও কখনও কলকাতার আকাশে চাঁদ ওঠে। ওরা ঘুমোচ্ছিল। দুটো একটা নিমের পাতা মাথায় পড়ছে এবং শরীরে মৃদু বাতাস, ওপাশে একটু হেঁটে গেলেই লেকের জল, জলে কত সুন্দরী মেয়ে এখন কবিতা আবৃত্তি করছে। নরম সিল্কের পোষাক, ফুলের মতো ফুটে থাকা সব মেয়ে এবং ছোকরা যুবক, হাফ প্যান্ট পরা বালক ব্রিজের নিচে উঁকি মেরে মাছের খেলা দেখতে দেখতে পৃথিবীটাকে পাশের যুবতীর মতো রহস্যময় মনে করছে—বেঁচে থাকা কি মধুর! তখনই মনে হয় কলকাতার আকাশে কোন কোনদিন চাঁদ

ওঠে, নিমের ছায়ায় অন্নহীন ক্ষুধার্ত বালক ঘুম যায়। এবং রাত দশটা না বাজতে অ্যাম্বুলেন্স ফিরে আসে।

সুবল ফিরে এসেছে। হাসপাতালে চিকেন পক্সের জন্য কোন ওয়ার্ড নেই। সুতরাং নিমগাছের নিচে রেখে আবার শহরের বুকে অ্যাম্বুলেন্সটা পালিয়ে গেল।

ওরা কাতর গলা শুনে জেগে গেল। ভোজবাজির মতো ব্যাপার। ওরা উঠে চোখমুখ ঘষে দেখল, দিনমানে যে মানুষ শালা গায়েব হয়ে গেছিল নিমের ছায়া থেকে, সে আবার অধিক রাতে ফিরে এসেছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে গেল, এই যে দাদু খুব কষ্ট হচ্ছে!

—তোরা!

—আমরা তোমাকে খুঁজছিলাম।

—আমাকে খুঁজছিলি?

—তা তুমি যে ফিরে এলে!

সে চুপ ক'রে থাকল। কথার জবাব দিল না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে খুব। তবু বলল, আমাকে খুঁজছিলি কেন?

—তুমি ভাল হলে তোমাকে আমরা এক জায়গায় নিয়ে যাব।

সুবল বলল, বড় ক্ষিধে পেয়েছে রে!

আমাদের কাছে শুকনো রুটি আছে। খাবে?

—কোথায় পেলি!

—ঐ যা দেয়। রোদে শুকিয়ে রাখি। খেতে মচ্ মচ্ করে। খাও। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

এমন ক্ষিদে যে সে এখন যা পাবে, পারলে যেন নিম পাতা বেটে সরবত ক'রে খায়। সে এত কাছে এমন দুজন সহৃদয় মানুষ পেয়ে বলল, আমাকে দিলে তোরা খাবি কি?

—আমরা ঠিক খেয়ে নেব। আমরা ত কোনোদিন উপোস থাকি না। বলে ওরা পুঁটুলি খুলে শুকনো রুটি গুড় এবং একঘটি জল দিল। জ্যোৎস্না নিমের পাতার ফাঁকে জাফরি কাটা। ওরা কাছে এলে বলল, এত কাছে আসিস না। তোরা আমার কাছে থাকলে তোদের অসুখ করবে। তারপর কি আরামে এবং সুখে যেন সে মড়মড় ক'রে মুখ দিতে গিয়ে দেখল জিভে লাগছে। গলায় লাগছে। তবু ক্ষিদের যন্ত্রণাতে সে খেয়ে ফেলল রুটি এবং গুড়। কেমন একটা পরিতৃপ্ত ভাব। সে এবার বলল, আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যাবি?

—একটা কথার মানে বুঝছি না দাদু।

—কি কথার মানে রে ?

—বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে, যে যার মতো চাষবাস করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে।' দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও।

বুড়োর মুখটা কেমন সহসা অতর্কিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কোথাও এমন কথা আজকাল লেখা হচ্ছে !

—হ্যাঁ দাদু !

—আমাকে নিয়ে যাবি সেখানে ? আমি বসে বসে লেখাটা পড়ব।

—তুমি ভাল হলে তোমাকে নিয়ে যাব।

কিন্তু সকাল হতে না হতেই আবার অ্যাম্বুলেন্স এসে সুবলকে নিয়ে গেল। তার আর সেখানে যাওয়া হল না।

গাছের নিচটা আবার খালি। বুড়ো মানুষটিকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেছে। ওরা বাসি খাবার সংগ্রহ করতে বের হবে এবার। উঠি উঠি করেও দেরি ক'রে ফেলেছে। আশা ছিল বুড়ো মানুষটিকে নিয়ে যাবে, যেখানে সেই কথাগুলি লেখা আছে সেখানে। কোথায় কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল ওকে ওরা জানে না। আর দেখা হবে না ভাবতেই কেমন কষ্ট হচ্ছিল ওদের। ওরা চুপচাপ হাতে নুড়ি পাথর নিয়ে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়ছে কাচের জানলাতে।

বড়টি বলল, ফিরে যাবি না?

ছোটটি বলল, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—ভাল লাগছে না কেন রে ?

—ওরা ওকে কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল ?

—দাদুর জন্যে কষ্ট হচ্ছে !

ছোটটি হাসল। তারপর শিস্ মেরে উঠে দাঁড়াল। কষ্ট থাকতে নেই, ঘরে ফিরে নেচে নেচে সে কোমর দুলিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটার সময়ই দেখল, সেই অ্যাম্বুলেন্সটা আবার ফিরে আসছে। ওরা গাড়িটা দেখেই ছুটে এল। এবং ওদের ফের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।—ওরা তোমায় রাখল না।

সুবল বলল, মাদুরটা বিছিয়ে দে। সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর মুখে ও সারা গায়ে এখন গুটি। এবং ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল, আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যাবি বলছিলি ?

—তুমি ভাল হলে নিয়ে যাব।

—আমি ভাল আছি। আমাকে আজ রাতে নিয়ে চল। কেউ দেখতে পাবে না। রাতে রাতে আমরা সেখানে চলে যাব।

রাতের বেলা, যখন গাড়িঘোড়া আর চলছে না, শেষ ট্রাম চলে গেছে, তখন সে ধীরে ধীরে ওদের দুজনকে নিয়ে হাঁটতে থাকল। এমন একটা কথা আজকাল লেখা হচ্ছে। কোথায় কিভাবে লেখা হচ্ছে—সে উৎসাহে সব কষ্ট ভুলে যাচ্ছে। দিনমানে জায়গা বদল ক'রে নাও। ওরা বড় রাস্তা পার হয়ে একটা পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটতেই যেন সুবল তার পরিচিত পথের সন্ধান পেল। এই পথে সে রোজ কুকুটের মাংস কিনতে বাজারে যায়। গরীবের অসুখ হতে নেই। অসুখ হলে হাসপাতালে জায়গা থাকে না। বার বার একটা অ্যাম্বুলেন্স ওকে নিয়ে কপট আরোগ্য কামনায় ছোটাছুটি করে।

বাড়িটা সে চিনতে পারল। বোগেনভেলিয়ার অশান্ত শাখাপ্রশাখা দুলছে। এত রাতে শুধু লিলিদি জেগে আছে। বাড়ির সেই নতুন হলুদ রঙের দেয়ালের নিচে ওরা তিনজন হাঁটু মুড়ে বসল। রাস্তার আলোতে স্পষ্ট সেইসব শব্দগুলি চোখের উপর নাচতে থাকল। কুকুরটা বুঝি টের পেয়েছে। ব্যালকনিতে চিৎকার করছে। ওরা তাড়তাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে পেছনের দেয়ালটায় চলে গেল। এবং রাতে রাতে ওরা এইসব দেয়ালের চারপাশে লিখে বেড়াতে থাকল—বড় মাঠে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। যে যার মতো চাষবাস করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও। ওরা সেই লেখা দেখে দেখে কেমন উদ্দীপ্ত হল এবং নিজেরা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিল।

ওরা দেখল চারপাশের সব জানলা দরজা ভয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যা কিছু ঐশ্বর্য, সুখ এবং প্রেম ভালোবাসা মানুষের কাছ থেকে চুরি ক'রে শুকনো বাঘ অথবা হরিণের মাথার ভিতর ওরা পুষে রেখেছিল, দেয়ালে দেয়ালে এখন সেইসব বাঘের মুখ আস্ত বাঘ হয়ে লাফিয়ে পড়ছে। হরিণেরা দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু বাঘের থাবাতে হরিণের মাংস এবং কলিজা এবার খসে খসে পড়বে।

এইভাবে যবে হাজার লক্ষ মানুষের হাহাকার সমস্ত রাজপথ দীর্ণ করবে তখন এক অলিখিত চুক্তি হবে,—আর শাদা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঘোরাফেরা করবেন না। এবার ভিতরে ঢুকে পড়ুন। এবং রক্তের ভিতর যে রঙ খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে অস্বচ্ছ আলোতে তাকে দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। নিয়মমাফিক আমাদের জানা আছে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।

কালো কোট

হাওয়ায় জানলা খুলে গেল। কিছু বৃষ্টির ছাঁট এসে ঘর ভিজিয়ে দিল। কে যেন এখন ও-বাড়ির উঠোনে কলতলায় যাচ্ছে। হাওয়ায় কিছু পাতা উড়ে উড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পাতাবাহারের গাছগুলো বৃষ্টির জলে ভিজছে। এই বৃষ্টিতে কিছু পাখি ভিজছিল, উড়ে উড়ে ইতস্ততঃ পাখির ডাল থেকে ডালে পাতায় আশ্রয় নিচ্ছিল। টিপটাপ বৃষ্টির শব্দ। এক হলুদ রঙের পাখি ডাকছে। পাতাবাহারের গাছটার বড় ডালটাতে পাখিটা বসে ডাকছে। হাবুল জানলা দিয়ে চুপি দিল। পাখিটাকে হাত বাড়িয়ে ধরার ইচ্ছা। বৃষ্টির ছাঁটে হাত পা মুখ ভিজে যাচ্ছে। তবু কি যেন আছে এই পাখির ডাকে, নিশব্দ দ্রুত এক নির্জনতা এই ঘরে, জানালায়, মায়ের শীর্ণ শরীরে আকাশের মতো ছায়া ফেলছে।

হাওয়াটা ক্রমে অন্য মোড় নিল। জানালা তেমনি খোলা। বৃষ্টির ছাঁট আর আসছে না। হাবুল জানলা পর্যন্ত এগোতে পারল। ভালো করে সে পাখিটা দেখতে পাচ্ছে। পাখির এই ডাক কেন, মা চুপচাপ বিছানায় বসে, মা কেন রোদ উঠলে পিঠে রোদ দিয়ে বসে থাকে, মা ক্রমে কেন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; মার চোখে এমন দুঃখ ঝুলে আছে কেন—হাবুল পাখিটা দেখতে দেখতে ভাবলো। পাখিটা বুঝি টের পেয়েছে হাবুল এসে জানালায় দাঁড়িয়েছে। সে বুঝি ভয় পেয়ে উড়ে যেতে চাইল—কিন্তু কতদূরে যাবে—এই তো সামনে পদ্মফুলের গাছ, স্থলপদ্মের ফুলে এখন গোলাপী রঙ, পাখিটার হলুদ রঙ গোলাপী রঙের ভিতর ডুবে গেল মনে হল—কোথায় যেন সে একবার জলসত্র দেখেছে। কোন মেলায় যেতে যেতে সে দেখেছে গাছতলায় ব্যাজ পরে কারা যেন ক্লান্ত মানুষকে জলদান করছে। ওর যখন মন ভালো থাকে না যখন মা ঘর থেকে বের হতে দেন না, সদর দরজা বন্ধ করে রাখেন—এখন হাবুল কোথাও যাবে না, রাস্তায় বের হতে হবে না, এই যে রাস্তা দেখছ, কত মোটর গাড়ি দেখছ—ওরা কেবল কোথাও না কোথাও চলে যাচ্ছে। তুমি একা বের হলে ওদের মতো তুমি কোথাও না কোথাও চলে যাবে, ঘর চিনে ফিরে আসতে পারবে না—তখন কেবল হাবুলের মনে হয় মা তাকে এই ঘরে সারাদিন বন্দী করে রাখতে চান। সামান্য এই

গাছের পাখি, বৃষ্টি এবং যেসব পাতা ঝড়ে উড়ে নিরুদ্দেশে চলে গেল তাদের মত ওর কোথাও না কোথাও কেবল চলে যেতে ইচ্ছা হয়—গেলেই বুঝি সেই মেলা, মেলার প.থ জলসত্র, সে একটা পাত্র দিয়ে কাকে যেন জলদান করার মত হাত বাড়াল।

মা দেখলেন হাবুল জানালায় হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির জল হাবুলের হাতে পড়ছে। সে জল হাতের অঞ্জলিতে জমা করে রাখতে পারছে না। মা ডাকলেন, হাবুল, বাবা লক্ষ্মী, তুমি বৃষ্টির জল ধরবে না। তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

মা এই বড় শহরে এসে যেন কেমন হয়ে গেলেন। এমন বৃষ্টির দিনে হাবুলের মনে হয় ওর মা বড় দুঃখী মানুষ –সেই কবে কোথায় যেন কে একবার কার হাত ধরে বড় মাঠে গিয়েছিল। মাঠের ভিতর প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, গাছ পার হলে ছোট্ট নদী। নদী থেকে কিছু পাখি উড়ে যেত। বিকেল হলেই পাখিরা উড়ে উড়ে সেই বড় বটগাছটার উদ্দেশে চলে যেত। রেল-লাইন পার হলে হাবুলের মনে হত একটা খয়েরী রঙের বাড়ি, সামনে বারান্দা, মা, বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রয়েছেন। সে পাখি দেখার জন্য কার হাত ধরে রোজ চলে যেতে যেতে একদিন একা চলে গিয়েছিল। তারপর সন্ধ্যা হলে মনে হল – কোথায় কোন দিকে গেছে সেই রেল-লাইন, সে একা একা হাঁটতে হাঁটতে কাঁদতে কাঁদতে যখন ক্লান্ত তখন কি যেন এক জাদুর খেলাতে মা বাবা, সে মা-বাবাকে দেখে তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে দিয়েছিল। মা বলেছিলেন, হাবুল, তুমি এই মাঠে ?

বাবা বলেছিলেন, হাবুল, কে তোমাকে এতবড় মাঠে নিয়ে আসে ?

হাবুল ঠিক কিছু বলতে পারত না। কে সেই মানুষ যে তাকে বিকেল হলেই ডাকে। সড়ক পার হয়ে বিদ্যালয়ের কোয়ার্টার। হাবুল মা-বাবার সঙ্গে সেই কোয়ার্টারে থাকে। বিকেল হলে বারান্দায় মা বাবা বসে গল্প করতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রের চলে যেত। হাবুল একা একা বিদ্যালয়ের মাঠে খেলা করতে নেমে গেলেই মনে হত—সামনে রেল-লাইন পার হলে কি এক বিস্ময়ের জগৎ রয়েছে—সে একা একা কার হাত ধার চলে যেত মনে করতে পারছে না।

মা বলেছিলেন, হাবুল, তুমি দেখবে একদিন ঠিক হারিয়ে যাবে।

বাবা বলেছিলেন, হাবুল, বলো আর কোনদিন একা এত বড় মাঠে নেমে আসবে না ?

—আসব না বাবা।

—এলে তুমি আর কোনদিন আমাদের খুঁজে পাবে না।

—কেন বাবা?

—আমরা হারিয়ে যাব।

সেই থেকে কি এক ভয় হাবুলের। যেন সামনের গাছে ফুল পাখি সবই রহস্যময়। সবই হাত বাড়িয়ে হাবুলকে বলছে, এস। তুমি আসবে না? গাছ ফুল পাখির জগতে হাবুলের কেবল হারিয়ে যাবার ইচ্ছা।

এই বৃষ্টির দিনেই কেন যেন হাবুলের সব মনে পড়ছিল। ওর মনের ভিতর গ্রাম্য এক ছবি ভাসছিল। সামনে ছোট পুকুর, পার হলে রেল-লাইন, তারপর সেই বড় মাঠ। মাঠে যেতে বড় পদ্মদীঘি। কত পদ্মফুল ফুটে থাকত। বিল থেকে বালিহাঁস উড়ে আসত। নদীর ওপার থেকে খাঁচা ঝুলিয়ে আসত মজিদ। ওর দু খাঁচায় বালিহাঁস থাকত, জলপিপি থাকত। কিছু স্নাইপ-জাতীয় পাখি। বাবা গলা টিপে পেট টিপে পাখি কিনতেন। পাখির মাংস রান্না হলে রহমান দপ্তরী একটা ছোট বাটি নিয়ে আসত, দিদিমণি একটু মাংস। সে বারান্দায় বসে বসে কোনদিন ঝিমোত। পাখির মাংস একবার কেন যেন সেদ্ধ হল না—সব দোষ মজিদের উপর, মজিদ তুমি কি পাখি দিলে—পাখির মাংস সিদ্ধ না হলে কার দায়। বাবা নিরীহ মানুষ, তবু কেন যেন সেদিন কে দায়ী এ-প্রশ্ন মজিদকে করেছিলেন।

হাবুল একবার দুটো বালিহাঁসের পেট থেকে তাজা শক্ত ডিম পেয়েছিল। মাকে না জানিয়ে বাবাকে না বলে ডিম দুটো তুলো দিয়ে গরম করার চেষ্টা—যেমন মুরগীগুলো ডিমের উপর বসে থাকত, সে খড়কুটোর ভিতর সেই ডিম লুকিয়ে মুরগীর পেটের নিচে রেখে দিয়ে বসে থাকত। মুরগীটা কিছুতেই বসতে চাইত না, সে সন্তর্পণে মুরগীর ঘরে ঢুকে নিজে মুরগীটার উপর চেপে বসে থাকত এবং একদিন বাবা দেখলেন হাবুল কোথাও নেই—খোঁজ খোঁজ, মুরগীর ঘরে হাবুল, মুরগীটা মরে গেছে। সে মুরগীর উপর চেপে ডিমে তা দিচ্ছিল। বাবা, এমন নিরীহ বাবা পর্যন্ত সেদিন মেরেছিলেন হাবুলকে।

এখন এই বড় শহরে না আছে মুরগীর ঘর, না আছে সেই বড় মাঠ, পদ্মদীঘি। মজিদ মিঞা আর এখানে আসবে না—কি গো বাবু, পাখি চাই? কি পাখি লাগবে। একবার দুটো বনমুরগী দিয়ে গিয়েছিল। হাবুল মুরগী দুটোকে খাওয়াত। পরে বাঁধা থাকত। যেদিন মুরগী দুটোকে কাটা হবে

—সেদিন হাবুল মুখ ভার করে থাকল সারাদিন। সন্ধ্যার ট্রেন বাবার এক উকিল বন্ধু আসবে। কালো কোট গায়ে দেখলেই কেমন রাগ হত হাবুলের। বাবা না থাকলে কতদিন দেখেছে মা খুব হেসে হেসে কথা বলেছেন। মা-র কপালে বড় ফোঁটা থাকত সিঁদুরের। সে বুঝতে পারত না, কালো-রঙের কোট-পরা মানুষটা বাবার বন্ধু। সে সেদিন মুরগীর পা দুটো দড়ি থেকে খুলে দিয়েছিল। কেউ টের পায় নি। উকিল মানুষটা পেটে হাত রেখে বলেছিল, একটা কেস ঠুকে দাও হে।

—কার নামে!

—মজিদের নামে।

খেতে বসে কি আফশোস। সারাক্ষণ বনমুরগীর কলিজা অথবা বাঁ দিকের ঠ্যাঙ খেতে কি সুস্বাদু, এইসব বলাবলি করতে করতে চোখ গোল গোল করে হাবুলকে দেখছিল। যেন টের পেয়ে গেছে—এই নচ্ছার শিশু এমন কাজ করেছে হে অজিত। মজিদের নামে না হয়, ছেলের নামেই এক নম্বর ঠুকে দিয়ে এস। হাবুল ভয়ে তাকাতে পারছিল না। লোকটা খুনী আসামীকে গলা বাঁচিয়ে দিয়েছে, কি এক জাদুর মতো ওর মন্ত্রশক্তি জানা আছে। বস্তুত হাবুলের যখনই ভয় হয় তখনই সে দেখতে পায় এক কালো কোট-পরা মানুষ তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে অথবা নদীর পারে এবং ঠেলা দিয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে।

বৃষ্টির দিনে সেই কুৎসিত লোকটার মুখও জলের ভিতর ভেসে উঠল। সে দেখল এখন জল ভেঙে কারা পথ ধরে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্য পথে জল জমছিল। মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে হাঁটছে। একটা বুড়ো মানুষের ছাতা উল্টে গেছে। ঝড়ো হাওয়া ছাতাটা অনেক দূরে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। মানুষটা ছাতা ধরতে গিয়ে জলের ভিতর পড়ে গেল। হাবুলের কেন যেন হাসি পাচ্ছিল। বাবাও ছাতা মাথায় আসবেন। জল ভাঙতে হবে বলে এখন কাপড় পরে অফিসে যান। এই বড় শহরে এখন মনে হয় বাবা সেই কালো-কোট-পরা মানুষটার ভয়ে গোপনে চলে এসেছেন। কারণ সে দেখেছে সেই মানুষটা আর এ-বাড়ি আসে না। খোঁজ পায় নি হয়ত। খোঁজ পেলে বুঝি মানুষটা জল ভেঙে ছুটে আসত। আর কেন যেন সেই থেকে মা বড় একা নিঃসঙ্গ। মা ওকে যেন তেমন ভালবাসে না। মা ক্রমে ক্ষীণাকার হয়ে গেল। বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওর বলতে ইচ্ছা, মা তুমি ভালো করে হাসো না কেন। সান্টুর মা কি জোরে জোরে হাসতে পারে। মান্টুর মা আমাকে

পিঠে পায়েস দেবার সময় কি জোরে গম গম করে কথা বলছিল। প্রাণপ্রাচুর্যের অভাবে তার মা যে কি হয়ে গেল। মনে হয় বাবা মা-কে এক মরুভূমির ভিতর টেনে এনেছে। জল নেই, গাছপালা বৃক্ষ নেই, সেই রহমানের গল্প যেন এক রক্তশোষক দৈত্য তার মায়ের জীবনের সব প্রাণপ্রাচুর্য হরণ করে নিচ্ছে। সে জানালার ধারে বসে বলতে পারত, মা আমি কোথাও চলে যাব, সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের মত চাঁপাফুল গাছটির সন্ধানে চলে যাব। ওর গল্প মনে হত রহমান দপ্তরীর, মা, আমি সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের সন্ধানে আছি। কি চাই খোকা, চাঁপা ফুল চাই। পাহাড়ে পর্বতে এক ঝরনা জলে জলে মাঠ নদী বন ভেসে যাচ্ছে। দূরে অনেক দূরে, মাগো শস্য নেই, গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে, পত্রপুষ্পহীন মাঠ ঘাট সব। মানুষেরা গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পালিত পুত্র, মাগো, জাদুকরকে বলল, কি হবে? তিতি বললেন, মাগো, তুমি যাও, মাঠ-বন নদী পার হয়ে চলে যাও, পাহাড়ে পর্বতে সোনার চাঁপাগাছটি আছে, চলে যাও, ফুল নিয়ে এস, সেই ঝরনার জল নিয়ে এস। ফুলের জল মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে দাও। সব আবার ফুলে ফুলে ভরে যাবে। মানুষেরা আবার গ্রামে ফিরে আসবে।

মাগো, রহমান দপ্তরী বলত, জাদুকরের পালিত পুত্র তার প্রিয় পোষা ময়না পাখি নিয়ে বের হয়ে গেল। পাখি যেদিকে উড়ে যায় পালিত পুত্র সেদিকে যায়। নাম তার মা, জয়নাল। জয়নাল এক পাখিযালা মা। সে তার প্রিয় পোষা পাখিটাকে নিয়ে উড়ে গেল। কতদূরে কত বন মাঠ পেরিয়ে কত দিন যায়, রাত্রি যায় মা। জয়নাল আর পৌছাতে পারে না। হাত পা স্থবির হয়ে আসছে। চোখে ঘুম। যেখানে সে বসে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তে চায়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় মনে হয় সে আজ হোক কাল হোক মরে যাবে। কিন্তু জয়নালের মনে, মা, এক কি যেন স্বপ্ন। রহমান দপ্তরী বলত, মানুষের ভালোর জন্য, শস্য ফলানোর জন্য, ফুল ফোটানোর জন্য সে চলে যাবে। সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের মত মা আমি চলে যাব। তোমার জন্য, তুমি মা কি যে চাও বুঝি না, আমি বুঝি সেই চাঁপাফুলের 'সেই জল নিয়ে আসতে পারলে, মা, তুমি ভালো হয়ে যাবে।

মাগো, রহমান দপ্তরী বলত, ঝরনার পাশে গিয়ে দেখল জয়নাল—কি উঁচু জমি, খাড়া পাহাড়, ওঠা দায়, প্রাণ হাতে করে উঠতে হয় মা, পালিত পুত্র মা প্রাণ হাতে করে উঠে গেল। পাহাড়ের মাথায় একটা চাঁপা ফুল গাছ, গাছে একটা ফুল ফুটছে মা আর ঝরনার জলে ঝরে পড়ছে। কোন ফুল ফুটে গাছের

ডালে থাকছে না। ফুটছে আর ঝরে যাচ্ছে। কি-ভয়ঙ্কর স্রোত মা জলে। রহমান দপ্তরী বলত মা, জলে দুপারের গাছপালা তীরবেগে ছুটছে। কার সাধ্য সেইজলে নেমে যায়। ময়না পাখি জয়নালের মাথায় উড়ছে। জয়নাল হাত তুলে বলল, পাখি আমি কি করি? পাখি বলল, ওপরে উঠে যাও, ডালে উঠে যাও। ফুল নিয়ে জল নিয়ে এস। যেখানে যা কিছু মরুভূমি জল ছিটিয়ে উর্বরা করে দাও।

জয়নাল গাছের গোড়ায় পৌছে দেখল, ডালে এক পাখির মত ফ্রক পরা মেয়ে। সে গাছের ডালে ফুল তুলতে উঠে গেছে। পড়ে যাবে বুঝি। আর একটু গেলেই ডাল ভেঙে মেয়েটা জলে পড়ে যাবে। কি করি পাখি? ময়না মাথার উপর উড়ছে। তুমি গাছে উঠে যাও জয়নাল। জয়নাল গাছে উঠে গেল। প্রাণ হাতে নিয়ে উঠে গেল। মেয়েটির ফ্রক টেনে ধরল। পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল। নিচে নেমে সেই মেয়েটি বড় হয়ে গেল। বনদেবী হয়ে গেল। হাতে চাঁপাফুল। ফুল নাও, জল নাও—যেখানে যা কিছু দুঃখ আছে এই জল নিয়ে ছিটিয়ে দাও। সব দুঃখ উবে যাবে। ভিতরের ময়না পাখিটা কথা বলতে থাকবে। মা, রহমান বলত, এই ভিতরের ময়না পাখি কখন যে কার কোথায় উড়ে যায় বলা দায়। খোকাবাবু, ময়না পাখি উড়ে আর ফেরে না। খোলা আকাশে উড়ে যাবার লোভ সব পাখির। মাগো আমি তোমার জন্য চাঁপা ফুল দিয়ে আসব। আজ হোক কাল হোক মাগো তোমার জন্য ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসব।

বস্তুত হাবুলের এই ঘর ভাল লাগত না। বড় শহরে আসার পর থেকেই সে বন্দী হয়ে গেল। স্কুলে নিয়ে যাবার জন্য ঝি মঙ্গলা আসে। সে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। চারটা বাজলে মা ওকে মাথা আঁচড়ে দেবেন। ফুল ফল আঁকা জামা গায়ে দিয়ে দেবেন। তখন দাওয়ায় চুপচাপ সে বসে থাকে। কিছুদূর গেলে পার্ক। সে এখান থেকে সেইসব পার্কের গাছ-গাছালি দেখতে পায় না। মনে হয় বুঝি পার্কে গেলেই কালো-কোট-পরা মানুষটার সাক্ষাৎ পাবে। সাক্ষাৎ পেলেই বলবে, যাবে একবার আমাদের বাড়ি। আমার বড় দুঃখী মা কেন যেন আর হাসে না। তুমি গেলে মা আমার নিশ্চয়ই হাসবে।

অথবা এও মনে হয় রেল লাইন পার হলে বড় মাঠ এবং মাঠ পার হলে দীঘির মত পদ্মপুকুর। কত পদ্ম ফুল ফুটে থাকে সেখানে। তারা আর সেখানে যেতে পারবে না। তারা এই বড় শহরের ছোট গলির অপরিসর এক বাড়ির ভিতর। দিনের বেলাতে পর্যন্ত রোদ ওঠে না। মার শরীরে যেন ঠাণ্ডা

লেগেই থাকে। সারাদিন মা চাদর গায়ে শুয়ে থাকেন। মা রুগ্ন। বাবা সারাদিন বাইরে। একটু পথে চুপি চুপি বের হয়ে গেলেই, বাবার কাছে মার নালিশ, খোকা একা একা আবার পথে বের হয়ে যায়।

মা রুগ্ন। বাবা সারাদিন বাইরে, সন্ধ্যায় বাবা আসেন—তখন বাবাকে দেখলে খুব কষ্ট হয়। বাবা যেন কেবল কি খুঁজছেন। এই সংসারের সব কিছুতেই সেই ঝরনার জল ঝরে পড়ুক, বাবা বুঝি মনে মনে এমন চাইছেন। সে একদিন বলেছিল, বাবা তুমি সারাদিন কোথায় থাকো। আমরা এখানে কেন? সেই বড় মাঠ কোথায়? পদ্মবন কোথায়?

বাবা বলতেন, হাবুল, আমার আর সেখানে যাব না।

—কেন যাবো না বাবা?

বাবা বলতেন, আমরা নূতন বাসা নিয়ে এখানে চলে এসেছি। বাবা বাকিটুকু বলতেন না।

পাখিটা জলে ভিজছিলো। স্থলপদ্ম গাছটা থেকে পাখিটা ফের উড়ে এসে পাতা-বাহারের গছটায় বসেছে। এই পাখি, হলুদ রঙের পাখির মতো এক পাখি বুঝি জয়নালের —নাম তার ময়না। সে একবার এই পাখি নিয়ে কোন এক রাজার দেশে চলে গিয়েছিল—রহমান এমন সব গল্প তার কাছে করেছে। এখানে রহমান নেই, স্কুল ছুটি হলে অথবা সন্ধ্যায় যখন গ্রাম মাঠ ডুবে যেত, বাবা যখন হারিকেনের আলোতে পরীক্ষার খাতা দেখতে বসতেন, মার ছাত্রীরা যখন পড়াশোনা করে গ্রামের পথে নেমে যেত তখন রহমান গল্প করে বলত, হাবুল বাবু এবারে খেতে যান, কাল আবার হবে। রহমান যেন তার কাছে সেই জাদুকর, এবং সে নিজে মাঝে মাঝে জয়নাল হয়ে যেত—এবং পাখি দেখলেই পোষ মানানোর ইচ্ছা, সে কতবার রহমানকে বলেছে, আমাকে একটা পাখি দেবে, টিয়াপাখি। আমি পাখি নিয়ে বনে ঢুকে যাব। এখন এই বৃষ্টির দিনে হলুদ রঙের পাখিটা তার কাছে কোন শুভ বার্তার মত। পাখিটা এত কাছে, আর একটু কাছে এলেই হাতের কাছে এসে যায়, সে চুপি চুপি যেন বৃষ্টির জল ধরছে এমনি অভিনয় করতে থাকল। সে পাখি দেখছে না, পাতা দেখছে না, ডালপালা এত যে জানালার কাছে সে সব কিছুই যেন দেখছে না—কেবল বৃষ্টির জল পড়তে দেখছে তার দৃষ্টি বৃষ্টির জলের ভিতর। সে পাখিটাকে খপ করে ধরবার জন্য প্রায় একটা পুতুল সেজে জানলায় বসে থাকল। কত ছোট পাখি—কি নাম তার, হলুদ রঙ কেন গায়ে—এমন ছোট পাখি টুনটুনি হবে হয়ত, কিন্তু টুনটুনি পাখির তো হলুদ রঙ হয় না-কেমন ছাই

ছাই রঙের। সে একবার দুটো ডিম, লাল নীল রঙের, সংগ্রহ করেছিল। ওরা চড়াইয়ের ডিম কি টুনটুনি পাখির ডিম তা জানত না। মা ডিম দুটো দেখে চিৎকার করে উঠেছিল, গ্যাখো গ্যাখো হাবুলের কাণ্ড গ্যাখো—কোত্থেকে সাপের ডিম হাতে করে এনেছে। সে সেদিন কিছুতেই মাকে বোঝাতে পারল না, মা সাপের ডিম নয়, পাখির ডিম। আমি বেগুন গাছের পাতার ভিতরে খুঁজে পেয়েছি। কে কার কথা শোনে, মা তেড়ে এসে হাত ঝাড়তে ডিম দুটো হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। বালতি বালতি জল ঢেলে সব পরিষ্কার হলে মার কি কান্না। আমার কি হবে! হাবুলের মনে হল মার কেমন সেই থেকে ভয় প্রাণে—মা সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করতেন। তবু হাবুলের মনে হয় সে একা একা বেশীদূর না যেতে পারলেও। সড়ক পর্যন্ত একা যেতে পারত। সে সেখানে দাঁড়িয়ে মালগাড়ির শব্দ শুনত—টংলিং টংলিং। সেই শব্দই হাবুলকে কোন্ এক সুদূরের স্বপ্ন দেখাত। সে কথাও আজ হোক কাল হোক চলে যাবে এমন ভাবত।

পাখিটা জলে ভিজছিল। হাবুলের ইচ্ছা হল পাখিটার মত জলে ভিজতে। সে দুবার চেষ্টা করেছে খপ করে ধরার জন্য, কিন্তু সে ধরতে পারে নি। পাখিটা উড়ে গিয়ে এমন ডালে বসেছে যে হাতের নাগালে আর তা কিছুতে আসে না। ওর মনে হল বরং দুটো পাট খুলে দিলে, কিছু ক্ষুদকুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে খাবার লোভে পাখি ভিতরে চলে আসবে। সে বিছানার দিকে চোখ তুলে তাকাল, মা চাদর দিয়ে চোখমু' ঢেকে রেখেছেন। সে তাড়াতাড়ি সামান্য চাল এনে ছড়িয়ে দিল, তারপর হাত তুলে যেমন পোষা ময়নাকে জয়নাল হাতে তালি বাজালে পাখি উড়ে এসে মাথায় বসত, বুঝি এই পাখি তালি বাজালে মাথায় এসে পড়ে না বসুক, অন্তত চাল খেতে ঢুকে পড়লেই জানালা বন্ধ করে দেবে, আলো জেলে দেবে এবং আলো জ্বাললেই চোখে বাঁধা দেখবে পাখিটা।

কিন্তু হলুদ রঙের পাখিটা গাছের ডালেই নাচতে থাকল। বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে গান গাইতে থাকলো। চিরিপ চিরিপ। চড়ুই পাখির মত ডাকছে। ওর হাতের তালি অথবা খাদ্যবস্তু কিছুই দেখল না। এখন একমাত্র পথ দরজা খুলে বাইরে বের হওয়া। তারপর সামনে থেকে তাড়া করলে পিছনের জানালা দিয়ে পালানোর জন্য ফুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু দরজা খোলা যাবে না। মা দরজা বন্ধ করে রেখেছেন ভয়ে, কারণ হাবুল দরজা খোলা পেলেই পালিয়ে সেই পার্কটার উদ্দেশে যাবার জন্য—অথবা

তার সেই ফুল ফলের দেশ এখন কোথায়—কতদূর গেলে সেই টংলিং টংলিং শব্দ শুনতে পাবে—তার-জন্য হাবুল চুপি চুপি ঘর থেকে পালিয়ে যাবে। দরজা খোলা থাকলে হয়ত হাবুল হেঁটে হেঁটে বড় রাস্তায় চলে যাবে। মোড় পার হলেই বড় রাস্তা তারপর, ট্রামগাড়ি, বাসগাড়। হাবুল খুব ছোট, সে শহরের বড় রাস্তা একা পার হতে পারে না। মা বুঝি তাই কেবল দরজা বন্ধ করেন। হাবুল জানালায় বসে থাকে। তখন হাবুলকে বড় দুঃখী হাবুল মনে হয়।

সেই পাখিটা উড়ে চলে গেল—হাবুল মাকে উদ্দেশ করে চেঁচাল, মা বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

মা চাদর থেকে মুখ বার করে বললেন, জানালায় বসো না হাবুল। বৃষ্টির ছাঁট এসে তোমায় ভিজিয়ে দেবে।

হাবুল বলল, জানো মা, মোড়ের ওদিকটায় একটা শিবমন্দির আছে। তার পাশে বড় একটা শিমূল গাছ আছে। সেখানে হেঁটে গেলে—জানো মা, একটা বড় পুকুর আছে।

মা বললেন,—তাই বুঝি!

—হ্যাঁ মা। কাল আমি আর সান্টু গিয়েছিলাম।

মা এবার ধমকে দিলেন,—হাবুল তোমাকে কতবার বলেছি তুমি সান্টুর সঙ্গে যাবে না। জলে নামবে না।

—কেন মা? জলে গেলে কি হবে? সান্টু জল থেকে বড় দুটো কাঁকড়া ধরেছিল।

বাবুলের ফের সেই বড় পদ্মবনের কথা মনে পড়ছিল। মা দুপুরে ঘুমোচ্ছেন, বাবা স্কুল ছুটি বলে ট্রেনে চড়ে ছোট শহরে গেছেন। হাবুল চুপি চুপি দরজা খুলে বারান্দায় নেমে যেত। তারপর উঁকি দিত চারপাশে—না কেউ নেই, হাবুলকে কেউ দেখছে না। সে পাশের বাড়ির বড় বিনুকে নিয়ে মাঠ পার হয়ে ছুটত। পথে নগেন মাঝি দেখে বলত, ও বাবা তোমরা এ-পথে! নগেন মাঝি ওদের ধরে নিয়ে আসত। বলত, দিদিমণি, দ্যাখো তোমাদের ছেলেরা এই ভরদুপুরে লাইন পার হয়ে-কোথায় যাচ্ছিল।

মা বলতেন, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে হাবুল?

—মা আমরা পদ্মপুকুরে যাব ভাবছিলাম।

—সেখানে কি আছে—

—বিনু বলেছে, মা, সেখানে পদ্মফুল আছে, ফুলে মধু আছে।

—কিন্তু বিন্নু বলে নি, জলে বড় একটা শেকল আছে ?

—কিসের শেকল মা ?

—এক দৈত্যের শেকল। বড় এক দৈত্য তার দুই শিঙ। জলের নিচে স্ফটিকের স্তম্ভ। সে তার ঘরে বড় শেকল নিয়ে বসে থাকে। জলে নামলে ধরে নেয়।

—দৈত্য কি মা! রহমান দৈত্যের কথা বলেছে। কিন্তু সে কি বস্তু রাক্ষসের মত, না ভূতের মত! রাক্ষস অথবা ভূত সে যেন চিনতে পারে, দৈত্য চিনতে ওর কষ্ট হয়।

– দৈত্য দেখতে রাক্ষসের মত। রাক্ষসের শিঙ থাকে না। দৈত্যের দুই শিঙ থাকে। বড়ো বড়ো দাঁত। মানুষ পেলে ধরে খায়।

বাবাকে দৈত্যরা ভয় পাবে না, মা ?

তোমার বাবাকে পায়। কিন্তু তোমাকে পাবে কেন হাবুল। তুমি কোনদিন একা বিন্নুর সঙ্গে পদ্মপুকুরে যাবে না। সেখানে পদ্মবনের দৈত্য এক শেকল ছেড়ে দিয়েছে। জলের ভিতর শেকলটা চুপচাপ লুকিয়ে থাকে। কচিকাঁচা কেউ জলে নেমে গেলে, চুপি চুপি শেকলের মুখটা পারের দিকে উঠে আসে। তারপর ধরে নিয়ে যায় তাকে। জলের তলায় ওদের ঘর আছে।

- আমি সাঁতরে চলে আসব মা।

মা-র মুখে কেমন বিষণ্ণ করুণ হাসি ফুটে উঠল। হাবুল মাকে দেখছিল—মা, তার মা রুগ্ন এবং দিন দিন কি এক ভাবনা যেন মাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই লোকটাকে খবর দিলে হয়, সে চলে এলে মা আবার হা হা করে হাসতে পারবে। কালোকোট-পরা মানুষটার হাতে পায়ে অথবা মুখে কি এক জাদুর খেলা—সে এলেই বুঝি নিরাপদ এ-সংসার - সে মাকে বলল, মা আমাকে সান্টু বলেছে, দীঘির পাড়ে বড় এক হরতকী গাছ আছে, গাছের নিচে হরতকী পড়ে থাকে সান্টু রোজ দীঘির জল সাঁতরে পার হয়ে যায়, ওর পিসিমা হরতকী খায়। হরতকী খেলে কোন রোগ হয় না, রোগ থাকলে সেরে যায়।

মা এবারে হাসলেন। সেই এক বিষণ্ন হাসি। এটা হাসি কি কান্না মাঝে মাঝে হাবুল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মা এবার চাদরে মুখ ঢেকে দেবার সময় বললেন, আগে সাঁতার শেখো। সাঁতার না শিখলে দীঘির জল পার হওয়া যায় না।

হাবুল কতদিন ভেবেছিলো সাঁতার শিখবে। ওর জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটার ইচ্ছা কতদিনের। কতদিন সে বাবাকে বলছে, বাবা আমাকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যাবে? বাবার মুখ তখন বড় বিব্রত দেখাতো। হাবুলের মনে হয় এখন, বাবা নিজেই সাঁতার শেখে নি। সাঁতার শিখলে বুঝি নিরাপদ সংসারে সাপ বাঘের মুখ উঁকি দেয় না এখন তো বাবা সারাদিনই বাইরে থাকেন। ঝি মঙ্গলা কাজ করে দিয়ে চলে যায়। মা সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকেন। রাত্রে মাস্টারমশাই এসে হাবুলকে পড়িয়ে যান। ভোরে, হাবুল মা-র কাছে বসে থাকে, মা তাকে অঙ্ক দেন, হাবুল অঙ্ক শেষ করে ফের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের পাতাবাহারের গাছ পার হলে স্থলপদ্মের গাছ, রাজ্যের পা খরা খেলা করতে আসে, বন্দী হাবুল এই জানলায় দাঁড়িয়ে সংসারের যাবতীয় অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখতে দেখতে—এই যেমন রোদ ওঠা, সূর্য ডুবে যাওয়া, পাখ-পাখালির শব্দ শোনা এবং আকাশ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাওয়া; বাবা কিছু কিছু নক্ষত্রের নাম জানত, বাড়ি ফিরে হাবুলকে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বলত, এস হাবুল, আমি তোমাকে আজ ধ্রুবতারা দেখাব সংসারে বিচ্ছিন্ন ঘটনা সব ঘটে যাচ্ছে, তবু বাবা হাবুলের হাত ধরে জানলায় দাঁড়িয়ে বলতেন, দ্যাখো ঐ হচ্ছে আমাদের ধ্রুবতারা। অথবা হাবুলের বইয়ে যে কালপুরুষ রয়েছে সেই ছবি আবিষ্কার করার সময় হাবুলের বড় কষ্ট হত তখন, বাবা, মা ভাল হয়ে উঠছে না কেন, মা-র কি হয়েছে প্রশ্ন করার ইচ্ছা জাগত।

বিকেলে ছুটির দিনে বাবা হাবুলকে গড়ের মাঠে নিয়ে যান। অন্যদিন এই বিকেলে, জানালায় শুধু সামনের পাতাবাহারের গাছটায় একটা হলুদ রঙের পাখি দেখতে দেখতে কেমন সে শুধু তন্ময় হয়ে যায়। তার সেই ছোট্ট গ্রাম মাঠের কথা মনে হয়। ফুল ফলের কথা মনে হয়। আর জল দেখলে মা-র সেই ভয়ের শেকলটার কথা মনে হয়। যেন মা সব সময় তার চোখের ওপর একটা কালোকোটের ছবি ঝুলিয়ে রাখতে চান। একবার নদীতে নৌকায় সে মা-র সঙ্গে অনেকদূর গিয়েছিল, সেখানেও মা হাবুল জলে উঁকি দিলে বলতেন তুমি হাবুল জলে পড়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো রঙের শেকলটা তোমাকে টেনে নেবে। হাবুলেরও সেই ঘন কালো রঙের জলের গভীরে মনে হয়েছিল —বুঝি পাতালে ডুব দিলেই সেই দৈত্যপুরী চোখে ভেসে উঠবে। সে ভয়ে জলে আর হাত ডোবায় নি। কেবল মনে হচ্ছিল পাতালের দৈত্যপুরীতে

শেকলটা শুয়ে আছে, যেন দেখছে জলের ধারে কোন কচিকাঁচা কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে কিনা।

রাত হলে সে বাবাকে বলেছিল, বাবা, আমাদের স্কুলের পুকুরটাতে শেকল ছিল?

বাবা বলেছিলেন, শেকল কি আবার?

—মা যে বলে, জলের নিচে দৈত্য থাকে, তার এক পোষা শেকল আছে।

বাবা বুঝেছিলেন, হাবুলকে মা ভয় দেখাচ্ছে। হাবুল সাঁতার জানে না। একা একা হাবুল কেবল নিরুদ্দেশ হতে চায়। একা একা হাবুল যেন পুকুরে চলে না যায়—তাই বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, হ্যাঁ, হাবুল তুমি একা একা যাবে না। পুকুরে মস্ত বড় শেকল থাকে।

আর কিনা সে এই বড় শহরে এসে পর্যন্ত একটা পুকুর আবিষ্কার করে ফেলেছে। সাণ্টু একদিন শিবমন্দিরের পথ ধরে বড় এক পুকুরের পাড়ে এনে হাজির করেছিল। কি কারণে সেদিন সকাল সকাল ছুটি। সাণ্টু দারোয়ানকে বলে হাবুলকে বের করে এনেছিল। পুকুরটায় যেতে হলে প্রথম এই রাজবাড়ীর দেউড়ি পড়ে। তারপর পুরানো ভাঙা দেয়াল, ভিজে মাটি, কিছু বিদেশী ফুলের গাছ এবং লতাপাতা—যেন ওরা ইচ্ছা করলে এখন এক বনঝোপের ভিতর ঢুকে লুকোচুরি খেলতে পারে। হাবুল এই বড় শহরে এমন একটা জায়গার সন্ধান পেয়ে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল! বিকেল হলেই সে ছটফট করত। মা আমি যাব, এখন আর বৃষ্টি নেই। মা সাণ্টু বলেছে, সে আমাকে একদিন দূরের পার্কটায়ও নিয়ে যাবে।

– না, তুমি যাবে না হাবুল। সাণ্টুর সঙ্গে গেলে বাবা রাগ করবেন।

—মা, সাণ্টুরা কতদিন ধরে এই শহরে থাকে! সাণ্টু পথ চিনে হাঁটতে পারে। সাণ্টু আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে।

—তোমার বাবা এলে বলে দেব হাবুল। তিনি খুব রাগ করবেন।

বৃষ্টি ধরে এসেছিল। হলুদ রঙের পাখিটা উড়ে গেছে। এখন ভাদ্র মাস। কখনও বৃষ্টি কখনও মেঘ। কখনও আকাশে এতটুকু মেঘ থাকে না। আবার কোথা থেকে সব মেঘেরা উড়ে আসে। আকাশ ঢেকে দেয়। ঘন বৃষ্টি হয়। গাছগুলো বৃষ্টির জলে স্নান করে বড় তকতকে হয়ে ওঠে। তখন পথ-ঘাট বড় পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সারা শহরময় রোদ। মনেই হয় না কিছুক্ষণ আগে জল পড়ে এই শহর ডুবে ছিল। তখন বাইরের পৃথিবীতে ছুটতে পারে না বলে হাবুলের বড় অভিমান হয়, মা-র ওপর অভিমানে ওর চোখে জল আসে। যেন

মা-র এই অসুখ - যা কিছুতেই সারছে না, যা সেরে গেলে মা তাকে দিয়ে যাতে পারত সামনের পার্কটায় অথবা সেই রাজবাড়ির দেউড়ি পার হয়ে—কত যে বনঝোপ আছে, সেখানে, যেন অসুখ সেরে গেলেই সে আর এই ঘরে বন্দী থাকবে না, মা-র মনে হবে—সব সময়ই কোথাও না কোথা ফুল ফুটছে সুতরাং হাবুল এবার ঘর ছেড়ে রোদ্দুরে বের হয়ে পড়ুক। মাকে সে আজ হোক কাল হোক নিরাময় করে তুলবে। এই যে হলুদ পাখিটা এসে পাতা-বাহারের গাছটায় বসে থেকে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়—যেন এই পাখিটা ইচ্ছা করলেই জয়নালের সেই জাদুর পাখি হয়ে যেতে পারে এবং চাঁপাফুল নিয়ে আসতে পারে, চাঁপাফুলের গন্ধে মা তার এই সৌরভময় সংসারে হাসিমুখটি তুলে ধরলে বুঝি বাবার আর কোন কষ্ট থাকত না। সে মনে মনে বলল, পাখি তোমাকে আজ হোক কাল হোক নিয়ে চলে যাব। সেই রাজবাড়ীর দেউড়ি পার হলেই চাঁপাফুলের গাছটি আছে আমি সেখান থেকে মায়ের জন্য ফুল তুলে আনব। মাকে নিরাময় করে তুলব।

মা বিছানায় শুয়ে দেখতে পেলেন, হাবুল বড় একা, নিঃসঙ্গ। সে জানলা দিয়ে শুধু এখন আকাশ দেখছে। চারিদিকে আনন্দ, চারিদিকে ফুল ফল পাখি মেলা, মানুষের মিছিল। শুধু হাবুল চুপচাপ ঘরের ভিতর বসে আছে। মা-র ভিতরে ভিতরে বড় কষ্ট হতে থাকল। তিনি বললেন, যাও হাবুল, ছাখো আমার শিয়রে চাবি আছে, দরজা খুলে চলে যাও। কিন্তু সান্টুকে বলবে, তোমাকে যেন সে সাবধানে পথ পার করে দেয়। তোমরা কিন্তু সেই পুকুরে যাবে না।

—না মা, আমি পুকুরে যাব না বলে দরজা খুলে ছুট। ঠিক রাস্তার মোড়ে মৃত এক দেবদারু গাছ, গাছের নিচে সান্টু দাঁড়িয়ে আছে। সে দূর থেকেই চিৎকার করে বলল, সান্টু, আমি এসে গেছি।

সান্টু বলল, যাবি? সেই রাজবাড়িতে, সদর দেউড়ি পার হলে ভিতরে পুরানো দেয়াল, ভাঙা পাঁচিল, ফাঁকে ফোঁকরের ইঁদুরের গর্ত - যাবি? ঝোপজঙ্গলে আমরা হারিয়ে যাব। অথবা যেন বলার ইচ্ছা সান্টুর সেই চাঁপাফুলের গাছটা সদর দেউড়ি পার হলে অনেক ভিতরে বড় এক দীঘির জলাশয়, জলাশয় পার হলে চাঁপাফুলের গাছ, গাছ থেকে নিরন্তর এক দুই করে চাঁপাফুল ঝরে পড়ছে।

হাবুল বলল, মা জলে যেতে বারণ করেছে। জলে শেকল আছে। জলে নামলেই শেকল এসে আমার পা জড়িয়ে ধরবে।

— শেকল! সে আবার কিরে?

হাবুল প্রায় বিস্মিত হল। এত বড় একটা সত্য ঘটনা সাণ্টুর জানা নেই, সে এতবড় শহরের সব জায়গায় চলে যেতে পারে—আর এমন খবর সে রাখে না—ভাবতে অবাক, হাবুল সুতরাং সবটা খুলে বলল, জলের নিচে স্ফটিকস্তম্ভ. ভিতরে ভ্রমর, তার অন্তরে এক পাখির মত প্রাণ বাস করে। আরো কি সব বলতে সাণ্টু এক ধমক, দূর বোকা, তোর মা তোকে ভয় দেখিয়েছে। চল যাবি। আমি জলে নেমে দেখাবো, জলে শেকল থাকে না, দৈত্য থাকে না। দেখবি দিঘীর অন্য পাড়ে কত রকমের গাছ আছে, ফুলের গাছ। ফলের গাছ। আমি পিসিমার জন্য হরতকী ফল নিয়ে আসি।

—হরতকী আনবি?

হরতকী খেলে শরীর ভাল থাকে। আমার পিসিমা রোজ খেয়ে উঠে হরতকী খান। ওঁর কোন অসুখ নেই।

—আমাকে একটা দিবি? মাকে একটা হরতকী দেব। তবে আমার মা-ও হরতকী খেলে ভাল হয়ে উঠবে।

ওরা রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে এল, দেউড়িতে দারোয়ান। সাণ্টু দারোয়ানকে বলল, আমরা ভিতরে যাব।

দারোয়ান বলল, ভিতরে কি আছে?

—ভিতরে একটা হরতকী গাছ আছে। আমরা দুজনে দুটো হরতকী নেব। ওর মা-র অসুখ, হরতকী খেলে ওর মা ভাল হয়ে যাবে।

হাবুল ভয়ে বলতে পারল না, সেই চাঁপাফুল গাছটা আছে না, আমরা সেখানেও যাব। চাঁপাফুল তুলে আনব।

চাঁপা ফুল নেবে—এ-কথা জানতে পারলেই আর দারোয়ান ঢুকতে দেবে না—ওরা শুধু হরতকীর কথাই বলল।

দারোয়ান লোহার দরজা খুলে দিল। চোখে কালো চশমা, উর্দিপরা দারোয়ান, মাথায় লাল পালকের টুপি, হাতে গাদা বন্দুক, কোমরের পাশে তরবারি ঝুলছে।

হাবুল বলল, সাণ্টু, আমার ভয় করছে।

—ভয় কি রে? এখানে কেউ থাকে না। রাজা মোকদ্দমা করতে সেই যে বিলাতে গেছে আর ফিরে আসেনি।

—আর আসবে না?

—মোকদ্দমা শেষ না হলে আসে কি করে?

ওরা ভেতরে ঢুকে দেখল সেই সব পুরানো ভাঙা দেয়ালের মাথায় বড-বড় সব অশ্বত্থ গাছ, গাছে রাজ্যের সব পাখি এসে জড় হয়েছে। বাড়ির ইট কাঠ সব ভেঙে পড়ছে। শার্সি দিয়ে প্রাসাদের ভিতরটা দেখা যায়। বড় বড় আয়নায় সূর্যের আলো এসে পড়ছে আর সব বাড়িটা যেন আগুনে জ্বলছিল। ওরা ছুটে ছুটে পিছনের দিকে যাচ্ছিল। যাবার সময় দেখল—বাড়ির পিছন দিকটাতে একটা ঈগল পাখি বসে রয়েছে।

সান্টু বলল, বুঝলি হাবুল, এই পাখি উড়ে গেলেই রাজার মোকদ্দমা শেষ হয়ে যাবে।

—কি যে আজগুবি বলিস না তুই।

—তোকে সেই সাপের ডিম, বাঘের ডিম এসব গল্প কে বলে রে?

—কে বলবে আবার, আমার মা বলে।

—পাখি উড়ে গেলে মোকদ্দমা শেষ—আমার পিসিমা বলে।

হাবুল ঠোঁট ওল্টাল। ওর মন্দ লাগছিল না। চারিদিকে উঁচু পাচিল। পাচিলের পাশে ছোট ছোট ঘর। ঘরের ভিতর এখনও দু' একজন প্রবাসী পুরুষের মুখ, লম্বা দাড়ি। ওরা কিছু হলঘর পার হয়ে এল। কোন মানুষ নেই। তারপর সেই ঝোপের মত জায়গাটা, পাশে বড় দীঘি। দীঘির উত্তর পাড়ে শুধু একটা কাঠের বেড়া। বেড়ার ফোকরে একটা কালো-কোট-পরা হাত। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা হাত। হাতে বঁড়শি। যেন বেড়ার ও-পাশ থেকে চুরি করে মাছ ধরছে।

হাবুল এবার চেঁচিয়ে উঠল, আমি বলে দেব। তুমি চুরি করে মাছ ধরছ, আমি বুঝি মনে কর কিছু বুঝি না।

আর কি অবাক সে, হাতের আঙুলগুলো নড়তে চড়তে দেখল এবং হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সান্টু বলল,—কিরে তুই চিৎকার করছিস কেন?

—একটা হাত দেখলি কেমন পালিয়ে গেল।

সান্টু বলল,—কোথায়?

—ঐ যে ও দিকটায়।

—ওমা ওটা একটা কালো বেড়াল। লাফ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

হাবুলের বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপছে। কে যেন আবার ওকে বড় মাঠে নিয়ে যেতে চায়। হাবুল কিছুতেই আর পুকুরের পাড়ে পাড়ে হাঁটছে না। এই কালো জলের ভিতর থেকে একটা শিকল ঠিক সাপের মত উঠে আসবে

এবং পায়ে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু অবাক, সান্টু প্যান্ট খুলে জলে নেমে গেছে। সে কেমন চিৎ হয়ে উপুড় হয়ে সাঁতার কাটছে। কোথায় সেই শেকল, কালো বেড়ালের মুখ অথবা……অথবা—এই কি হচ্ছে, কি রে তুই, কি করছিস? সান্টু জল থেকেই চিৎকার করতে লাগল।

তুমি বড় বাহাদুরি নিচ্ছ সান্টু। আমিও জানি। তুমি পানকৌড়ির মত ডুবে ডুবে বাহবা দেখাবে আর আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখব। হাবুল ডাকল, আমিও সাঁতার কাটতে জানি। ওপারে গেলেই আমি হরতকী পাব। চাঁপাফুলের গাছ পাব। হাবুল সেই কবিতার কথা মনে করতে পারল। জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। সব এতদিন তাকে ভয় দেখিয়ে ঘরে বেঁধে রেখেছিল। জলের ভয়, কালোকোটের ভয় এবং দূরে এক মাঠ্ আছে, মাঠ পার হলে ফেরা যায় না এমন ভয় দেখিয়ে ঘরের বার হতে দেয় নি। হাবুল এবার ভয়ের কথা ভুলে গেল, ঘরে ফেরার কথা ভুলে গেল। সে জলে নেমে গেলে ওপারে ওঠার জন্য। ওপারে গিয়ে উঠতে পারলেই সেই অমৃতফল। ফল নিয়ে যেতে পারলে মা-র আর কষ্ট থাকবে না। মা-র জন্য জলের ভিতরে সে হরতকী ফলটা ধরতে গেল। ফলটা ফুল হয়ে গেল চাঁপা ফুল, তারপর কালো বেড়ালের মুখ হয়ে গেল এবং মনে হল অবশেষে একটা কালো-কোট পরা হাত ওর দুপায়ে জড়িয়ে ধরেছে। ওকে জলের নিচে ক্রমে সকলে মিলে টেনে নিচ্ছে। সে ক্রমশ কিছু আর দেখতে পাচ্ছিল না। কেবল বিকেলের হলুদ পাখিটা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেসে—বিকেলের হলুদ পাখিটাকে জলের নিচে ধরার জন্য ছটফট করতে লাগল।

নির্জনে বুনো একা

এভাবে তার দুপুরটা কেটে গেল। সকাল থেকে বৃষ্টি। বৃষ্টি আর থামছে না। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি। ঘাস-পাতা ভিজে যাচ্ছে। মাটি তেমন ভাল করে ভিজছে না। বৃষ্টিতে ঘুড়ি ওড়ে না। সে বৃষ্টি না থামলে ঘুড়ি ওড়াতে পারছে না।

ওর মনটা এমনিতেই ভাল না। তবু এদিনে সে ঘুড়ি ওড়াবে। সে আকাশে চোখ তুলে তাকালেই টের পায় সব নানাবর্ণের ঘুড়ি যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনোটা খুব আকাশের ওপরে, কোনোটা দূরের বাড়িতে ছাদের মাথায়—আবার কোনো ঘুড়ি উড়তে উড়তে অনেক দূরে ভেসে যাচ্ছে। নিরিবিলি নীল নীলিমায় ঘুড়ি ভেসে গেলে ওর ভীষণ ভাল লাগে।

সেও চায় এভাবে ওর ঘুড়িটা কখনও কখনও অন্তহীন আকাশের ওপাশে উড়ে যাবে। কিন্তু সে কোনোদিন অত ওপরে ঘুড়ি ওড়াতে পারেনি। সে তো নীলবর্ণের ঘুড়ি কিনে আনতে পারেনি। সে তার পুরানো খাতার সব লেখা কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে নেয়। সে মাচান থেকে বাঁশের পুরানো বাতা কেটে খুব যত্নের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুড়ি বানায়। কখনও সে ছুটন্ত ঘুড়ির পিছনে ছুটতে থাকে। কিন্তু ঘুড়িটা সে পায় না। কেউ না কেউ তার আগেই ঘুড়িটা ধরে ফেলে। কেউ তখন দয়া করে কিছু সুতো ওকে দিয়ে দিলে সে তা একটা বাঁশের কঞ্চিতে জুড়ে নেয়। তারপর খেলা। নিরিবিলি মাঠে নির্জনে তার খেলা আরম্ভ হয়ে যায়।

সেই যে সে ঘুড়িটা বানিয়েছে কাগজ কেটে কেটে লম্বা লেজ বানিয়ে, সে থাকে এক পাশে—অন্য পাশে কেউ থাকলেই তার বলা. তোমরা আমার ঘুড়িটা উড়িয়ে দাও, ছাখো আমার ঘুড়িটা কোথায় উঠে যায়। কিন্তু সে পারে না। কিছুদূর উঠতে না উঠতেই কেমন ওটা লাট খেতে থাকে, যেন একটা দিক ভারি হয়ে গেছে ওটার। ওটা বাতাসে ভেসে থাকতে পারছে না, নেমে আসার জন্য প্রাণপণ লাট খাচ্ছে। আর তখন সে ঘুড়িটা যাতে লাট না খায়—বাতাসে যেন ওটা ভেসে থাকে—সে প্রাণপণ ছুটছে পেছনের দিকে—তবু কেন যে সে এক

সময় দেখতে পায়, ঘুড়িটা লাট খেয়ে একেবারে ঘাসের ওপর পড়ে ছড় ছড় শব্দ তুলছে। আর মা তখন জানালায়, মার চোখ দুটো চিক চিক করতে থাকলে কেন জানি ভীষণ ওর কষ্ট হয়।

সে তখন বলে, মা আমাকে তুমি একটা রং-বেরং-এর ঘুড়ি কিনে দাও। বাবাকে বলতে আমার ভয় লাগে। আমার যে ইচ্ছা, ঘুড়িটা অনেক দূরে উঠে যাবে, অনেক দূরে, যেখানে আকাশে মেঘেরা ভেসে বেড়ায় সেখানে, অথবা মা, তার ওপরে কি আছে জানি না, ইচ্ছা হয় আমার ঘুড়িটা যেখানে নক্ষত্রদের বাড়িঘর আছে সেখানে উঠে যাক, মা আমাকে একটা লাটাই কিনে দাও, লাটাইয়ে থাকবে অনেক অনেক সুতো। যত ইচ্ছা সুতো ছেড়ে তোমাকে আমি দেখাব—কত ওপরে ঘুড়ি আমি তুলে দিতে পারি। আমার যে ইচ্ছা, মা, তোমার চোখের ওপর ঘুড়িটা আকাশের নীলিমায় ভেসে বেড়াক।

যাবার দিনে মা ওকে ডেকেছিল, বুনো কাছে আয়।

সে তখন দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

মা বলেছিল, কাঁদছিস কেন বোকা। আমি ঠিক ভাল হয়ে চলে আসব। কথা বলতে বলতে মার চোখে জল।

বুনোর দুঃখ তখন আরও বেশি। রাস্তায় সাদা রঙের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বাবা, মার কি সব গোছগাছ করে নিচ্ছে। পিসি তাড়াতাড়ি একটু ফল কেটে দিচ্ছে মাকে। মা চলে যাচ্ছে সাদা রঙের গাড়িতে।

বাবা বলেছিলেন, বুনো, যা তো গাড়িতে এ-বালিশটা রেখে আয়।

বুনো এক দৌড়ে বালিশটা সাদা গাড়িতে রাখতে গেলে দেখলে ড্রাইভার সামনে। দুজন মানুষ, ওদের শরীরে খাঁকি পোষাক, ওরা নেমে আসছে। ওদের হাতে লম্বা ভাঁজ করা কি একটা।

বুনো বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। সে বাবাকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে পারে না। পিসিকে বললে, কোন্ কিছু বলতে চায় না পিসি। কেবল বলবে, সে অনেক দূরে যাবে। সেখানে কত বড় বাড়ি! কত বড় বড় ডাক্তার। পৃথিবীতে এমন কোন অসুখ নেই যা তারা ভাল করতে পারে না।

আমি যেতে পারব পিসি? মার সঙ্গে থাকব। দ্যাখো কোন দুষ্টুমি করব না—এ-সব বলার ইচ্ছা কিন্তু সে কেন যে পারে না, মা একবারও বলছে না তুই বুনো আমার সঙ্গে চল, মার ওপর ওর ভীষণ অভিমান। অত বড় বাড়ি, অত

সব মানুষ, সে একজন আর কি বেশি, কিন্তু মা, না বাবা, কেউ ওর সম্পর্কে কোন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। মার শীর্ণ হাত এখন বুকের ওপর। ছাদের দিকে মার মুখ। মার সাদা মুখে কালো চোখ দুটো কেমন মাছের চোখের মত মনে হচ্ছে।

সে চুপি চুপি ড্রাইভার সাবের পাশে উঠে বসে থাকল।

ড্রাইভার বলল, তুমি কাঁহা যাবে খোকাবাবু।

—বড় বাড়িতে।

—সেখানে তো বাচ্চালোকের যানা মানা হ্যায়।

—আমি যাব।

ড্রাইভার হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না। চোখ দুটো ভীষণ মায়াভরা। টল টল করছে চোখ দুটো। বুনো কোনদিকে তাকাচ্ছিল না পর্যন্ত। যেন চারপাশে তাকালেই সবাই ওকে টেনে নামিয়ে নেবে। সে সেজন্য ড্রাইভারের শরীর ঘেঁসে বসেছিল। যেন সে পারলে ড্রাইভারের শরীরের ভিতর লুকিয়ে থাকতে চায়।

ড্রাইভার মাথার চুলে বিলি কেটে বলল, খোকাবাবু তুমকো হাম ঠিক লে যাবে। দোসরা টাইম এসে লিয়ে যাবে।

বুনোর কানে কোন কথা যাচ্ছে না। সে যতটা পারছে আরও সেঁটে বসছে। সে ড্রাইভারের পাশে বসে ওকে আঁকড়ে ধরেছিল। কেউ বুনোকে আর বুঝি নামাতে পারছে না।

কিন্তু বাবা এসে কেমন গম্ভীর গলায় ডাকলেন, বুনো এদিকে এস।

বুনো ভাল ছেলের মতো বাবার পায়ের কাছে নেমে গেল।

বাবা বললেন, আমার ফিরতে রাত হবে বুনো। তুমি পিসির সঙ্গে খেয়ে নেবে।

বুনো বলল, মা কবে ফিরে আসবে বাবা ?

—ভাল হলেই নিয়ে আসব।

মাকে তখন ওরা নিয়ে আসছে। একটা স্টেচারে মা শুয়ে আছে। সীম গাছের মাচানের পাশ দিয়ে মার পা দেখা যাচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে মার কপাল দেখা যাচ্ছে। চোখ চুল মুখ মাথা শরীর হাত পা, শাড়ি, শাড়ির রঙ। মা সুন্দর সাদা জমিন আর হলুদ পাড়ের শাড়ি

পরেছে। মার চুল সুন্দর বিনুনি করা। পিসি মার কপালে বড় সিঁদুরের টিপ দিয়েছে। পায়ে সুন্দর করে আলতা পরিয়ে দিয়েছে। সিঁথিতে কি লম্বা দাগ সিঁদুরেরর। মাকে তার কেন জানি খুব সেদিন সহসা অচেনা মনে হচ্ছিল। মা আকাশের দিকে সোজা তাকিয়ে আছে। চারপাশে কোনদিকে তাকাচ্ছে না। চারপাশে তাকালেই বুঝি মার চোখ বুনোর ওপর পড়ে যাবে। বুনোর ওপর চোখ পড়ে গেলে মা বুঝি কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না।

বুনো তবু স্টেচারের পাশে পাশে হেঁটে গিয়েছিল। এবং মা তাকালেই সে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল, পিসি জোরজার করে কোলে তুলে নিয়েছে বুনোকে। আরও যারা দাঁড়িয়েছিল, প্রতিবেশীরা, বুনোকে তারা নানাভাবে বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে। কিন্তু বুনো তো স্কুল থেকে ফিরে এলেই সেই নিরিবিলি মাঠটাতে ঘুড়ি ওড়াতে চলে যেত। মা জানলায় বসে দেখছে বুনো ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। বুনোর কি প্রাণান্তকর ইচ্ছা। হাওয়ায় ঘুড়ি উড়ে যাক, ঘুড়ি নীল নীলিমায় ভেসে যাক, কিন্তু সে কোন দিন তার ঘুড়িটাকে নীল নীলিমায় উড়িয়ে দিতে পারে নি। মার কি কষ্ট তখন।

কিন্তু মার সাহসে কুলোয় নি বলতে, তুমি বুনোকে একটা রং-বেরংয়ের পাতলা কাগজের ঘুড়ি কিনে দিও, মানুষটা তার অসুখে অসুখে সব নিঃশেষ করে ফেলেছে। একটা বাড়তি খরচার কথা সে যে কি করে বলবে, একটা লাটাই, কিছু গুটি সুতো আর একটা ঘুড়ি। সে তবু বলতে পারত মানুষটাকে, কিন্তু মানুষটার আছে এক অহেতুক ভয়, যেন বলা, বুনো তুমি একা একা মাঠে যাবে না, আমার সময় খারাপ, গ্রহ খারাপ, কোনদিক থেকে যে বিপদ আসবে আবার বুঝতে পারছি না। বাড়ি ফিরে আসতেই আমার ভয় লাগে। যেন চারিপাশ থেকে সবাই আমার শত্রুতা করছে। এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত।

একদিন বুনোকে এসে কি ধমক মানুষটার, আবার তুমি মাঠটায় গেলে। সেখানে তোমাকে বলেছি না যাবে না, সেখানে কত রকমের পোকামাকড় থাকে। কিছুতে কামড়ে দিলে কি যে হবে!

এবং এভাবে এক ভয়, ভয় থেকে মানুষের বুঝি মুক্তি থাকে না। সাদা গাড়ি বড় রাস্তায় এভাবে উঠে যায়, বুনো পিসির কোলে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় ক্রমে সাদা গাড়িটা বড় রাস্তার বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে মার মুখ চোখের ওপর ভাসতে থাকে, তারপর কেমন কুয়াশার মতো চোখ থেকে মার মুখটা অস্পষ্ট হয়ে যায়। সে ফিরে আসে, একা জানালায় চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

মাঠটা পুকুর পার হলেই। ওর ঘুড়ি ওড়ানো, কাল থেকে নিবিষ্ট মনে পৃথিবীর আর কেউ দেখবে না।

গভীর রাতে মনে হয়েছিল বুনোর-কেউ তাকে ডাকছে। ওর মাথার কাছে ছোট একটা সবুজ রংয়ের আলো। অন্য দিন মা, সেদিন ওর পাশে পিসি। পিসিই ওকে ডেকে তুলেছিল, দ্যাখ তোর জন্য কি এনেছে বুনো।

বুনো ধড়মড় করে উঠে বসেছিল।

সে দেখেছিল বাবা তার সামনে।

বাবা বলেছিল, বুনো তোমার ঘুড়ি লাটাই। প্যাকেটে সুতো।

বুনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে ঘুড়িটা চোখের ওপর রেখে দেখতেই বাবা বলেছিলেন, এখন ঘুমোও সকাল হলে দেখবে।

বুনো দেখেছিল বাবার মুখে ক্লান্তি। বাবার চোখ ভীষণ লাল। বুনোর মনে হয়েছিল মাকে রেখে এসে বাবা একা একা কোথাও গোপনে কেঁদেছে। না কাঁদলে চোখ এমন লাল হয় না। বাবার শেষ ট্রেনে ফিরে আসতে সেজন্য দেরী হয়েছে। সে ঘুড়িটা টেবিলের ওপর রেখে দিলে বাবা বললেন, তোমার মা তোমাকে কিনে দিতে বলেছে। তুমি খুশী।

—খুউব বাবা।

—মা বলেছে ভাল ছেলে হয়ে থাকতে।

বুনো ঘাড় কাত করে জানাল, সে ভাল হয়েই থাকবে।

—মা বলেছে, পিসির কথা শুনতে।

—আমি পিসি তোমার কথা শুনি না?

—তোমাকে বলেছে সন্ধ্যা না হতেই ফিরে আসতে।

যেন বুনোর মনে হল, মা এতগুলো কথা রাখার বিনিময়ে ঘুড়ি-লাটাই-সুতো বাবাকে কিনে দিতে বলেছে।

বুনোর শুয়ে ঘুম এল না। মার যে কি কষ্ট, বুনো নীল মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে পারে নি! বুনো ঘুড়ি ওড়াতে না পারলে কোথায় যেন একটা কষ্টের জায়গা আছে মায়ের, সে শুয়ে শুয়ে সেটা যখন টের পায় তখন আর মাকে খুব স্বার্থপর মনে হয় না। আহাঃ সকাল হলে, না ঠিক সকালে সে যেতে পারবে না। সকালে ওর কটা সরল অঙ্ক করতে হবে, সরল অঙ্ক করতে ওর মাথা যেন গুলিয়ে

যায়, সরল অঙ্ক করতে করতে স্কুলের বেলা হয়ে যাবে—সে সকালে ঘুড়ি ওড়াতে পারবে না। বিকেল, আহা বিকেলে যে কতক্ষণে হবে—সেদিন সে শুয়ে শুয়ে সারা রাত কিছুতেই ঘুমোতে পারে নি।

ঘুম ভাঙলে প্রথমেই বুনোর চোখে পড়েছিল ঘুড়িটা। দেয়ালে ঘুড়িটা ঝুলছে। নানা রংয়ের ঘুড়ি। শুধু একটা রং নেই। মাথার কাছে সাদা রং। বুকের কাছে নীল রং। পেটের কাছে হলুদ রং। দু পাশে লাল রং। আর ঠিক নিচে সোনালী রং। বাবা কি যে সুন্দর ঘুড়িটা এনেছে!

বুনোর অঙ্ক করতে বসে একটাও অঙ্ক ঠিক হল না। সে একটা অঙ্কেরও ফল মেলাতে পারল না। স্কুলে সবার পিছনে বসেছিল সেদিন। মাস্টারমশাই ওর চোখ-মুখ দেখে কি যেন টের পেয়েছিলেন, অথবা হয়ত জানেন বুনোর মন ভাল নেই। ওর মাকে সাদা গাড়িতে অনেক দূরের একটা বড় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে ইচ্ছা করলেই সব সময় যাওয়া যায় না। সেখান থেকে সবাইকে শেষ ট্রেনে ফিরে আসতে হয়।

ঘরে ফিরে এলে পিসি বলেছিল, বুনো তুমি কোথাও বের হবে না।

—কেন পিসি?

—আমি একা। কত দিকে সামলাব।

—বাবার আসতে আজ দেরী হবে?

—যেমন আসেন তেমনি আসবেন।

—তুমি পিসি মাকে দেখতে যাবে না?

—আমি গেলে তোকে কে দেখবে? অনেক দূর।

আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে। এখন আমি ঘুড়ি ওড়াব পিসি। বেশী দূরে যাব না।

—দ্যাখো ডাকলে যেন সাড়া পাই।

—ঠিক পাবে পিসি।

মা চলে গেলে পিসির কি যে ভয়। পিসি এমন ভয় পায় কেন সে জানে না। আসলে পিসি একা একা থাকতে পারে না। মা নেই, বাবা কারখানায় রান্নাবান্নার কাজ শেষ হলে বোধ হয় পিসির হাতে কোন কাজ থাকে না, তখন বুনো কাছে না থাকলে ভয় লাগারই কথা। সেও তো ভয়ে মায়ের ঘরটাতে বেশী যেত না। বাবাও কেমন যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন। সবাই মার

ঘরটাকে এড়িয়ে চলছিল। সে বলেছিল, আমি ঠিক যাই মা। সে সেজন্য তিন-চারবার এক সঙ্গে বার বার ঘুরে-ফিরে ঢুকে যেন দিনে যত বার ঢোকা উচিৎ সব ঢোকার ব্যাপারটা সে নিমেষে শেষ করতে চেয়েছিল সেদিন।

তারপর খেলা। ঘুড়ি নিয়ে খেলা। নিরন্তর খেলা। সে বার বার ঘুড়ি সুতো লাটাই সব নিয়ে সেই নীল মাঠে হাজির। পাশাপাশি বাড়ির সব মানুষেরা দেখল সেই ছেলেটা এসেছে আবার। ঘুড়ি ওড়াবে। ওর হাতে আর পুরানো খবরের কাগজে তৈরী ঘুড়ি নেই। একেবারে নতুন চক চক করছে। ওরা দেখল যেন সে আসায় গোটা মাঠ, মাঠের সজীব ঘাস এবং যে পাখির উড়ে যাবার কথা তারা পর্যন্ত সব থেমে দেখছে, এক নীরিহ স্বভাবের ছেলে লাটাইতে সুতো জড়িয়ে যাচ্ছে। সে বসে আছে ঘাসের ওপর। সে পরেছে সাদা রংয়ের প্যান্ট। ডোরা কাটা হাফ সার্ট। চুল ওর মাথাভর্তি। মুখ কি যে সুন্দর। সরল অনাড়ম্বর মুখ চোখ নিয়ে সে বসে আছে ঘাসের ওপর। নানা বর্ণের ফড়িংয়েরা উড়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে। এই মাঠের নির্জনতা ছেলেটি এসে কেমন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওর চুপচাপ বসে থাকা, নিবিষ্ট মনে লাটাই ঘুরিয়ে যাওয়া—আর এভাবে আছে এক নিরিবিলি নির্জনতা, না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না, এমন নীল আকাশের নিচে, সবুজ ঘাসের ওপর কোন বালক ঘুড়ি ওড়াবে বলে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ ভুলে বসে থাকতে পারে।

বুনো দেখল বাবা তাকে অনেক অনেক সুতো কিনে দিয়েছে। যেন মা বলে দিয়েছে, বুনোকে তুমি এমন সুতো কিনে দেবে সে যেন মেঘের ওপরে ওর ঘুড়ি উড়িতে দিতে পারে।

আসলে বুনো এই নিরিবিলি নির্জন মাঠে এলেই টের পায় মা তার কাছেই আছে। যেন মা তার জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। খোকা নতুন ঘুড়ি ওড়াবে মার কি আনন্দ।

কিন্তু বুনো ঠিক ঘুড়ি ওড়াবার মুখে জানালায় তাকিয়েছিল। খালি জানালা। সেখানে কেউ নেই। শুধু এক আশ্চর্য নীরব দুঃখ বুকের ভিতর বেজে উঠলে সে চুপচাপ ফের হেঁটে এসেছিল। সে মা না থাকলে ঘুড়ি ওড়াতে পারে না। মা ফিরে এলে এই নানাবর্ণের ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দেবে। মার চোখের সামনে ঘুড়ি উড়িয়ে বলবে, ছাখো মা কত ওপরে ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছি।

দ্যাখো, দ্যাখো কত ওপরে উঠে যাচ্ছে। কি সুন্দর লাগছে না মা! এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ ঘুড়িটা ?

হ্যাঁ। ঐ তো, অনেক উচুতে যেখানে ছোট্ট ময়ূরের মতো সাদা মেঘের ছবিটা আছে তার ঠিক নিচে।

—এবার মা ?

—হ্যাঁ। ঐ তো, ঠিক মাছের মতো মেঘেরা যেখানে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে তার নিচে। কত ছোট হয়ে গেছেরে! একেবারে ছোট্ট একটা প্রজাপতির মতো মনে হচ্ছে।

—এবার মা ?

—না। কোথায় গেল ?

—ঠিক দেখতে পাচ্ছ না ?

—নারে দেখতে পাচ্ছি না! আমার খোকা কত ওপরে ঘুড়ি তুলে দিতে পারে। পৃথিবীতে এমন তার কেউ পারে না।

সুতরাং মা না এলে বুনো ঘুড়ি ওড়াতে পারে না। মা না এলে ঘুড়ি ওড়াতে তার ভাল লাগবে না। সে, সেদিন ঘুড়ি, না উড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। কারণ পৃথিবীতে মার মতো আর কেউ তার ঘুড়ি ওড়ানো দেখে খুশি হবে না।

তারপর কি করে যে দিনকাল পার হয়ে যায়। ঘুড়িটা তেমনি দেয়ালে ঝুলে থাকে। বুনো স্কুল থেকে ফিরে একটা পুরানো কাগজের ঘুড়ি নিয়ে মাঠে চলে যায়। সে চায় অভ্যাসটা না থাকলে, মাকে ঠিকমতো নতুন ঘুড়িটা উড়িয়ে দেখাতে পারবে না। আর এভাবে এই সংসারে মানুষের এক নিত্য খেলা জমে ওঠে। সে নিজেও জানে না, তার ভিতরেই আছে ভুলে থাকার স্বভাব, এ-স্বভাবেই সে এই প্রিয় মাঠে চলে আসতে পারে, দৌড়াতে পারে, ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে পারে, নীল নীলিমাতে মাছের মতো মেঘেরা ভেসে গেলে সে বুঝতে পারে কিছুই থেমে থাকে না। ক্রমাগত সব চলে যায় এভাবে।

বাবা কতকাল পরে যেন সহসা মনে করার মতো বলেছিলেন. বুনো তুমি যাবে। তোমাকে ওরা নিয়ে যেতে বলেছে।

—পিসি যাব না ?

—পিসিও যাবে।

—মা আমাদের সঙ্গে চলে আসবে বাবা ?

বাবা কোন জবাব দিতে পারেননি। তিনি চুপচাপ ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে শুধু বলেছিলেন, তুমি তো ওর দেওয়া ঘুড়িটা ওড়ালে না বুনো।

—মা এলে ওড়াব।

বাবা ঘরের ভিতর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বোধ হয় তিনি দেয়ালের নতুন রঙ করা দরকার হবে কিনা দেখছেন। মা আসবে, সব নতুন সাজে সাজবে, যেমন, গোলাপের গাছ, গাছে কি যে ফুলের বাহার, কিছু লাল কিছু সাদা এবং মার হাতে লগোনো নানারকমের জবা, মার বড় বেশি সখ কেবল কি করে সারা বাড়িতে গাছেরা ফুল ফোটাতে পারে। বাবা বেশ সময় পার করে দিয়ে একসময় মুখ ফেরালেন বুনোর দিকে।

তিনি বলেছিলেন, বুনো আমরা যাব।

তারপর বুনোর মনে আছে সে কেমন একটা বড় বাড়িতে পিসির হাত ধরে সিঁড়ি ধরে উঠে গিয়েছিল ?

সে অবাক হয়ে যায় পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা আছে।

কেমন ঝাঁঝালো গন্ধ ! সে তো মায়ের ঘরে মাঝে মাঝে এমন একটা গন্ধ পেত।

কত বড় বাড়ি। বাবা আগে। সঙ্গে আরও সব আত্মীয়স্বজন। মাঝে মাঝে সে দেখছে, সবাই তাকে ভীষণ ভালবাসতে চাইছে। বাবা পর্যন্ত কোন কঠিন কথা বলছেন না। সে দুষ্টুমি করলে বাবা রাগ করছেন না। সে ক্রমাগত উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। কতদিন পর সে মাকে দেখতে পাবে। মা তার জন্য কত কথা জমা করে রেখেছে। সে-ও মাকে কত কিছু বলবে স্থির করেছে। সে মাঝে মাঝে ডাকছিল—বাবা !

—কি !

—আর কতদূর বাবা।

—বেশিদূর না। লিফট খারাপ না হলে কখন উঠে যেতে পারতাম।

—বাবা।

—এস। আমরা সহজেই উঠে যেতে পারব।

—বাবা !

—কি !

—আমরা কতদূর উঠে যাব।

—ঐ অনেক দূরে।

—বাবা !

—কি !

—ওটা আই ডিপার্টমেণ্ট ?

—হ্যাঁ।

—বাবা !

—তুমি এস বুনো। এত কথা বলে না।

—বাবা !

—কি বলবে বল !

—মাকে কোথায় রাখা হয়েছে !

—পাঁচ তলায়।

বুনো পাঁচ তলায় উঠেই দেখেছিল লেখা রয়েছে বড় বড অক্ষরে—এম এস এম এম। লম্বা করিডোর। দুদিকে সারি সারি ঘর। ওর কেমন ভয় করছিল। ওদিকের ঘরটাতে কিছু মানুষের ভিড়। বাবা কোন দিকে তাকাচ্ছিলেন না। বাবা প্রায় যেন ছুটে যাচ্ছেন। সে বাবার সঙ্গে প্রায় দৌড়ে গেল। দেখল বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল সহসা। বুনো বলেছিল, মা কোথায় বাবা !

—এখানে ছিল।

সে বলেছিল, মা ! মা আমি এসছি।

বাবা বলেছিলেন, বুনো এমন জোরে ডাকে না।

নার্স এসে কি একটা নম্বর দিতেই বাবার ঠোঁট বেঁকে গিয়েছিল। বুনো দেখেছিল বাবার শরীর কাঁপছে। হাত পা কাঁপছে। বাবা এমন কেন করছে সে বুঝতে পারছে না। পিসি এবং মামারা বাবাকে ধরে আবার সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সে জোরে ডেকেছিল, বাবা, মা কোথায় ? মা কোথায় ?

বাবা নামতে নামতে কেমন চিৎকার করে উঠেছিলেন, বুনো তোমার মাকে ওরা ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দিয়েছে।

পিসি বুনোকে বুকে জড়িয়ে নিচে নামছিল। বাবার হাতের নম্বরটা হাত বদলে বদলে অনেক আগে সিঁড়ির ঠিক নিচে এবং যেখানে রেলিঙের বেড়া, পুকুরের জল শান্ত, এবং এখনও পাখিরা ডাকে, সূর্য উঠলে ছায়া দেখা যায়, তেমনি এক জায়গায় সেই হাতের নম্বরটা একটা গাছের বিন্দুতে লটকে রেখে কেউ কোথাও চলে গেল! ওরা সবাই তার নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই এল ফল-ওলা। এল মানুষ জন। বুনোকে সবাই তখন ভীষণ ভালবাসছে। সে মায়ের কথা কাউকে বলতে পারছে না। ঠাণ্ডা ঘরটা কোনদিকে, এখানে কে নম্বর গাছে আটকে দিয়ে গেল, কারা আবার আসবে, কাদের সঙ্গে বাবা আবার ঠাণ্ডা ঘরটায় যাবে. এবং বাবার দিকে সে তাকালে দেখেছিল, বাবা মাথা গোঁজ করে গাছের ছায়ায় বসে আছেন। সে বাবার পিঠে দুম করে কিল মেরে চিৎকার করে উঠেছিল, বাবা মাকে নিয়ে আসবে না! মা ঠাণ্ডা ঘরে কেন আছে।

তারপরই বুনো দেখেছিল হা হা করে বাবার শিশুর মতো কান্না, বাবা হয়ে কেউ এমন কাঁদে সে জীবনে দেখেনি। যেমন সে মার কাছে কিছু না পেলে মাঝে মাঝে ভীষণ কাঁদত, হাউ হাউ করে কাঁদত, তেমনি বাবা একটা শিশুর মতো কাঁদছে! বাবাকে কাঁদতে দেখে ওর ভীষণ লজ্জা হচ্ছে। এখানে একটা কিছু হয়েছে সে বুঝতে পারছিল। বাবাকে বসিয়ে রেখে, কেউ কেউ, বিশেষ করে মামারা এবং অন্য কেউ কেউ, সে সবাইকে ভাল করে চেনেও না, কি যেন আনবে বলে চলে গেছে। বাবা আর উঠছে না। বাবা যেন কেমন অসহায় সহায়সম্বলহীন মানুষ হয়ে গেছে মুহূর্তে। এখন সে ইচ্ছা করলে বাবাকে নানা-ভাবে শাসন করতে পারে। এই যে রাগে দুঃখে সে বাবার পিঠে একটা কিল পর্যন্ত বসিয়ে দিল, অন্য সময় হলে সে এমন ভাবতেও পর্যন্ত সাহস পেত না। অথচ বাবা কিছু বলছে না। কি ভালমানুষ বাবা! বাবা কি সরল সহজ। বাবাকে সে এখন সম্মান দিয়ে কথা বলতে পর্যন্ত লজ্জা পাচ্ছে। বরং যেন বলার ইচ্ছা, কিহে ধেড়ে খোকা এভাবে বসে গাছতলায় কেউ কাঁদে। যাও, মাকে নিয়ে এস ঠাণ্ডা ঘর থেকে। তোমার কান্না দেখে আদৌ মায়ের কথা ভুলে যাচ্ছি না।

আসলে মনের ভিতর কি যে হচ্ছিল তখন, সে সরল গণিতের কঠিন অঙ্কের

মতো সেখানে একটা ভীষণ সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল, তাকে কেউ কিছু স্পষ্ট বলছে না। কেমন ধাঁধার মতো সব কথা। এমন সবারই হয় বুনো। কেউ চিরদিন বাঁচে না। আমরা কেউ বাঁচব না। তোমরা বাঁচবে না বলে আমার কি! আশ্চর্য! মাকে কারা যে সেদিন ঠাণ্ডাঘরে রেখে দিয়েছিল। সে ওদের পেলে ঠিক ফড়িঙের লেজ কেটে দেবার মতো ওদের লেজ কেটে দিত। এবং আশ্চর্য মনে হয়েছিল তার সেদিন, ঘুড়ির লেজের মতো ফড়িঙের লেজের মতো মানুষেরও একটা লেজ থাকে।

সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল ঠিক একদিন না একদিন সে মানুষের লেজ কেটে দেবে। না হলে মানুষেরা ঘুড়ির মতো স্বাধীন হতে পারবে না।

ঝড়ের বিকেলে সে হরদম ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। সে যেন ফুসমন্তরে এখন ইচ্ছা করলে সবটা আকাশে ঘুড়ি ছেড়ে দিতে পারে। প্রাণের ভিতর তার এক আশ্চর্য হাহাকার। সে বাড়ি ফিরে এমন কি, সে খোঁট পরতে পরতে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পর্যন্ত টের পায়নি, সে ভীষণ হাহাকারে ভুগছে। এখন এই ঘুড়ির পেছনে ওকে ছুটতে দেখলেই বোঝা যায় কি তীক্ষ্ণ তার ভেতরের দুঃখটা।

ঝড়ের বিকেলে সে এভাবে ঘুড়ি উড়িয়ে যাচ্ছে। দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টি ছিল। এখন বৃষ্টি নেই। ঝড়ো হাওয়া। দুপুর পর্যন্ত কেউ ঘর থেকে বের হয়নি। বৃষ্টি না সারলে ঘর থেকে বের হওয়া যায় না। আর এখন কেবল বাতাস। বেশ বেগে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আর বাতাসে আকাশের নীলিমাতে ঘুড়িটা ধীরে ধীরে কাঁপছে। কোনো মেঘের রাজত্ব সে খুঁজে পাচ্ছে না, সে যেখানে ইচ্ছে করলে ঘুড়িটা তুলে দিতে পারে।

চারপাশের সাদা রঙের জানালা খোলে, সবাই দেখল, আবার অনেকদিন পর মাঠটার একা একা ভাব কেটে গেছে। সেই ছেলেটা এসেছে ঘুড়ি নিয়ে। নতুন ঘুড়ি। রঙবেরঙের ঘুড়ি। অনেক দূরে অনেক ওপরে নদী পার করে ঘুড়িটা বড় অশ্বত্থের মাথায় বেশ সোজা দাঁড়িয়ে আছে। আর ছেলেটা কেবল সুতো ছেড়ে যাচ্ছে চুপচাপ। সে কোনদিকে তাকাচ্ছে না।

এই মাঠ এবং সাদা রঙের বাড়িগুলো কতদিন থেকে যেন একা একা। ছেলেটা এলে সবার একা একা ভাবটা একেবারে কেটে গেল।

অন্যদিকে একটা বড় মেঘ উঠে আসছে। এবং এই শরতের আকাশ

নিমেষে আবার ঢেকে দিতে পারে। কখন বৃষ্টি যে এসে পড়বে! কেউ বাইরে থাকতে সাহস পাচ্ছে না। অথচ পশ্চিম থেকে ঠিক রোদ মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ ভাবতেই পারে না, আকাশে এভাবে রোদ এবং বৃষ্টি একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে পারে।

আর সবাই যখন ঘরে ফিরছিল বৃষ্টি আসবে ভেবে তখন ছেলেটার ঘুড়িটাকে নিয়ে কি যে নিবিষ্ট খেলা! একবার ঘুড়িটাকে টানতে টানতে সে মাথার ওপর নিয়ে আসছে, আবার সুতো ছেড়ে, সেই কোন অজানা রহস্যের এক দেশ বুঝি আছে মানুষের যেখানে সরল গণিতের অঙ্ক দিয়ে সে ফল মেলাতে পারে না, সেখানে পৌঁছে দিতে চাইছে।

কখনও কখনও সে লাটাইটা মাটিতে গুঁজে চুপচাপ বসে থেকে, কি সব ভাবে। সবুজ ঘাস, সাদা বাড়ি, নীল রঙের আকাশের নিচে তখন ছেলেটাকে ভীষণ মায়াবী মনে হয়। জানালা কেউ কেউ বন্ধ করে দিলেও সবাই বন্ধ করতে পারে না। কেউ কেউ খুলে চুপচাপ ওর ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে ভালবাসে।

চারপাশে মানুষের কি ব্যস্ততা। মানুষ এমন বৃষ্টির দিনে অনবরত এক দুঃখের ভিতর যেন ডুবে থাকে। চারপাশে সেই এক প্যাচপ্যাচে কঠিন অস্তিত্ব আর ছেলেটা এই বিকেলে বেশ সুন্দর ঘুড়ি আকাশে ছেড়ে বসে রয়েছে। সে আর কোনদিকে কিছু দেখছে না। লাটাই থেকে সে কেবল সুতো ছেড়ে যাচ্ছে। সে বুঝি ভেবেছিল, এভাবে ঘুড়ির সুতো ছেড়ে, মেঘের রাজত্ব পার হয়ে কোথাও একটা যে দেশ আছে সেখানে ঘুড়িটাকে পৌঁছে দেবে।

আকাশে ঘুড়িটা কি যে একলা! সেও বড় একা। তার মা নেই। গত বছর ঠিক এ-সময়ে একটা গাড়িতে করে তার মাকে বাবা বড় শহরে নিয়ে গেল। সামনের সাদা বাড়িটা পার হয়ে বড় রাস্তা গেছে। মা আর ফিরে এল না। সে ভেবেছিল মা এলেই রঙবেরঙের সুন্দর ঘুড়িটা আকাশে উড়িয়ে দেবে। সে এবার কেমন বড় চুপচাপ হয়ে গেল।

বাবাও কেমন চুপচাপ দুঃখী মানুষ বনে গেছে। বাবা বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ ওকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। বাবাকে সে কখনও এমন আদর করতে দেখেনি। ওর কেবল বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, বাবা তুমি মাকে এত সাজিয়ে কোথায় নিয়ে গেলে! আমাকে সঙ্গে নিলে না কেন! শেষ পর্যন্ত

সে শুধু বলেছে, বাবা আমার ভীষণ ভয় করছে। মা আর ফিরবে না বাবা!

বাবা শুধু বললেন, তোমার মা আর ফিরবে না বাবা।

—কেন বাবা? আমি যে ভেবেছি, মা এলে নীলরঙের মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে যাব।

—কখনও কখনও বুনো, মানুষ আর ফিরে আসে না।

—তারা কোথায় যায় বাবা?

—অনেক দূরে চলে যায়।

—কষ্ট হয় না বাবা? আমাদের ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় না!

—খুব কষ্ট, তবু মানুষকে এভাবে বুনো, যেতে হয়।

বুনো বলল, মার ওপর ভীষণ রাগ করেছি।

এর পর বাবা তাকে নিয়ে সেই রাস্তার পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। এই রাস্তাটা দিয়েই গাড়িটা গেছে। যেন এখানে এলেই পিতাপুত্র একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষের কথা মনে করতে পারে।

বাবার কেমন পাহারা দেবার স্বভাব হয়ে গেছে। বুনোকে কোথাও যেতে বারণ করছে।—তুমি কোথাও যাবে না বুনো। এ-সময় দূরে যেতে হয় না। দূর বলতে তো এই নীল মাঠ। কটা বাড়ি পার হয়ে এলেই মাঠটা। মাঠের ঘাস রোদে নীলরঙের হয়ে যায়। সে তার ওপর একটা সাদা হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট গায়ে দিয়ে দৌড়াতে ভালবাসে।

আজ সে এসেছে পালিয়ে ঘুড়ি ওড়াবে বলে। গলায় কি সব পরিয়ে দিয়েছে। সে একটা খোঁট পরেছে! এমন পোশাকে ওকে কেমন আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে।

সে তবু কি করে যে কি সব ভেবে ফেলেছিল, মা তবে সেই গল্পের দেশে চলে গেছে। সেখানে ঘুড়িটা উড়িয়ে দিতে পারলে মা বলবে, ওরে খোকা তুই আমাকে মনে রেখেছিস! আমাকে ভুলে যাসনি!

বুনো এভাবে সব সুতো ছেড়ে দিয়ে দেখল, আর উড়তে পারছে না ঘুড়িটা, ঘুড়িটা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, আর একটু উঠে গেলেই মেঘের দেশ পেয়ে যেত, কিন্তু সুতো নেই বলে, ঘুড়িটা ক্রমে রুপালী নদী পার হয়ে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে মেঘেদের দেশে ঢুকে গেল। নানা রঙের ঘুড়িটা ক্রমে চোখের

ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে, সে লাটাইটাও নদীর জলে ফেলে দিল। ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছে। সে যেন মাকে বলছে, মা আমি কোন দোষ করিনি। আমি তো তোমার ভাল ছেলে মা। তুমি কেন তবে ফিরে আসবে না ?

তারপর আবার সেই নীলরঙের মাঠ একা। সাদা বাড়িটা একা। এখানে আর কোনদিন বুনো ঘুড়ি ওড়াতে আসবে না। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে বুনো, আমরা তো আছি। তুমি আমাদের মায়া কাটাবে কি করে !

বুনোর মনে হল, পাশের সব বাড়ি, গাছপালা, মাঠ সবাই ওর সঙ্গে কিছু বলতে চায়। সে কোনদিকে তাকাল না। একা একা হেঁটে যাচ্ছে। ওর ভেতরটা ভীষণ ভার। এমন বিকেলে শরতের দিনে ওর মুখ ভারি কষ্টে ভরা। এমন সুন্দর পৃথিবীতে মাকে বাদে সে বড় হবে ভাবতেই পারে না।

নীলপদ্ম

এই শুনছো !

—কি।

—কিছু বলছ না কেন ?

—কি বলব ?

—কেমন লাগছে ! এতদিন পর দেখছ, এতদিন পর দেখলে কেমন লাগে কিছু বলছ না তো !

—খুব সুন্দর লাগছে। এমন একটা সুন্দর বাড়িতে, কি বড় আর ছিমছাম, তুমি ভীষণ সুখে আছ পদ্ম।

—ভীষণ সুখ। ভীষণ সুখ বলেই তো শেষ পর্যন্ত ওকে না বলে পারলাম না, অজুর পৈতায় নীলদা আসবে। নীলদাকে যে করেই হোক আনতে হবে। তুমি তো বিয়ের পর আর আমার বাড়িতে কিছুতেই এলে না। ও কতবার তোমার কথা উঠলেই বলেছে, তোমার নীলদাটা কেমন যেন।

নীল হাসল। সে দেখল বেশ আকাশভরা তারা। পদ্মর বাড়ির এখানটায় বসে অনেক কিছু দেখা যায়।

পদ্মর ছেলের নাম অজু। ভাল নামটা মনে আসছে না। পদ্মর শ্বশুর অজুর কম বয়সে পৈতা দিয়েছে !

তখন নীল দেখল, সামনে বড রাস্তা। মাঝখানে সুন্দর সুন্দর সব ফুলের গাছ। কলকাতায় এমন একটা সুন্দর রাস্তা হয়েছে সে জানত না। এ-সব ফুলের গাছের জন্য পদ্মর বাড়িটা আরও সুন্দর লাগে। নীল রঙের বোর্ডে রাস্তার নাম। বড় কবির নামে রাস্তা। এমন রাস্তার নাম কবিদের নামে না হলে যেন মানায় না। পাশে সল্ট লেকে নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। এদিকের বাড়িগুলো ফাঁকা। চার পাশে এখনও সবুজ মাঠ চোখে পড়ছে। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে খুব সবুজের সমারোহ। পদ্মকে এমন একটা বাড়িতে খুব মানায়।

নীল খুব বেশি দূরে থাকে না। শহরের এদিকটায় তবু সে কোনদিন

আসেনি। পদ্মের সঙ্গে শহরের কোথাও দেখা হয়েছে দু একবার! দেখা হলেই পদ্ম বলত, নীলদা কবে যাচ্ছ। একবারও গেলে না। তুমি বড়মানুষ বলে যাও না।

নীল তখন হেসে দিয়েছে। সব কথাতেই নীলদা এ-ভাবে হেসে ফেলে। আসলে নীলদা সেই যে কষ্টের ভিতরও ভীষণ হাসতে শিখেছিল, সেটা আর কিছুতেই ভুলে যায়নি। নীলদা দুঃখেও হাসে, সুখেও হাসে। নীলদাকে সে কখনও মুখ গোমড়া করে থাকতে দেখেনি। এমন কি ওর বিয়ের দিনেও নীলদা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা খেটেছে। দেখা হলে বলেছে, বিয়েতেও রেহাই দিলে না। খাটিয়ে নিলে।

সারারাত পদ্ম ঘুমোতে পারেনি। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে একবার উঠে খুঁজেছে। পায়নি। বিয়ে বাড়ি, কে কোথায় আছে ঠিক যেন কেউ বলতে পারে না। সে আবার উঠে এসেছিল, নীলদা কোথায়। সে দেখেছিল দক্ষিণের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে নীলদা ঘুমোচ্ছে। বেশ শীত। অথচ কেমন শীতে সে চুপচাপ শুয়েছিল। পদ্ম চুরি করে ওর চাদরটা দিয়ে শরীর ঢেকে দিয়েছিল। নীলদা টের পেয়েছিল কিনা সে জানে না। পদ্ম শুধু মনে মনে বলেছিল, আমি কি করব নীলদা, তুমি তো আমাকে কিছুই করতে দিলে না।

পদ্ম এবং নীল এ-ভাবে মুখোমুখি চুপচাপ বসে কত কিছু ভাবছে। উৎসবের বাড়িটা এখন নিঝুম। কিছুক্ষণ আগেও সুধাময় পাশের চেয়ারে বসে পদ্মের কাছে শোনা সব গল্পের কথা বলে হৈ চৈ করে গেছে। সুধাময় বলেছিল, আপনি ভীষণ নিষ্ঠুর নীলদা, এভাবে আপনার শৈশব কেটেছে পদ্মর সঙ্গে আর বিয়ের পর এত পর পর হয়ে গেলেন।

তারপর সুধাময় বলেছে, আপনাদের কথা এখন শেষ হবে না। ক'দিন খাটাখাটনি গেছে খুব। পদ্ম, আমি উঠি। তুমি নীলদার সঙ্গে গল্প কর।

নীল বুঝতে পারল, পদ্ম সুধাময়কে ওর শৈশবের কথা সব বলেছে! সুধাময় ওর চেয়ে বয়সে বেশ বড়। তবু নীলদা ডাকে। পদ্ম যে-ভাবে ডাকে, সেও সে-ভাবে নীলকে নীলদা বলতে বোধ হয় ভালবাসে। নীল বলেছিল, এমন মানুষ যার পদ্ম, তার আর কি দুঃখ থাকতে পারে।

পদ্ম কিছু বলেনি। বরং এখন যেন পদ্ম চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করছে।

এতদিন পর দেখা, কত কথা বলার আছে, অথচ পদ্ম একটা কথাও গুছিয়ে বলতে পারছে না। বোধ হয় পদ্মের সব কিছু থেকেও কি নেই যখন মনে হত, যখন মনে হত তার কিছু ভাল লাগছে না, একটা অসহায় দুঃখ ভিতরে ভিতরে বাজতে থাকলে, পদ্ম সুধাময়কে কেবল শৈশবের গল্প শুনিয়েছে হয়তো। এবং এ-ভাবেই গল্প শুনে শুনে তাকে ঠিক চিনে ফেলেছে সুধাময়। আর যখন সে মানুষ নিজেই এসে গেছে- নিভৃতে একটু কথা বলতে না পারলে আর কি থাকল। সুধাময় বুঝতে পারত হয়তো পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক থাকে যারা মরে গেলেও নিজের ইচ্ছের কথা বলতে পারে না।

যেমন পদ্ম বলত সুধাময়কে, নীলদা, সেই যে-বারে পিসেমশাইর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এল কি বোকা বোকা চোখ! কি খাটো খাটো চুল! আর পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। হাফসার্ট গায়। একটা পুঁটুলি মাথায়। পুঁটুলিতে নীলদার পড়ার বই অঙ্কের খাতা ভাঙ্গা পেনসিল। আমার পিসেমশাই কেন যে সহসা গরিব হয়ে গেছিলেন, জানি না। নীলদাকে দেখে সেদিনই আমার কি যে মায়া! এমন চোখ আমি কোথাও দেখিনি। গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটে গেলে নীলদাকে ভীষণ ভাল লাগত। তারপর একটু থেমে বলত, মা ভীষণ কষ্ট দিত নীলদাকে।

—কেন ?

—মার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাদু নীলদাকে স্কুলে পড়াবে বলে এনেছিল। পেটভরে খেতে দিত না পর্যন্ত।

সুধাময় বলত, যা, কি যে বলছ !

—সত্যি বলছি। বাবা তখন কলকাতায়। খিদিরপুরে বোমা পড়তেই বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

সুধাময় তখন চুপ করে থাকত। আর ভাবত তবে সেটা যুদ্ধের শেষ দিকে। তখন দুর্ভিক্ষ হয়তো চলেছে। সুধাময় এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পদ্মর শৈশব কোথায় কিভাবে কেটেছে জানতে চাইত। তারপর জড়িয়ে ধরার সময় বলত আচ্ছা, নীলদা তোমাকে কিছু করেনি।

—ছিঃ কি যে বলছ! সে তেমন মানুষই না।

নীল এখন কি কথা বলবে—ভেবে পাচ্ছে না। তবু কিছু বলতে হয়, এত আলো রাস্তায় আর গাড়ি ঘোড়া যখন ক্রমে কমে আসছে, এবং এক নিভৃত

আকাশ মাথার ওপর, তখন কিছু বলতে না পারলে কেমন সংকোচ লাগে। সে ফের এক কথাই বলল, সুধাময় লোকটি বেশ।

—খুব ভাল মানুষ। ফিস ফিস করে পদ্ম বলল।—তবে একটা দৈত্য।

নীল জানে সুধাময় খুব স্বাস্থ্যবান মানুষ। যেমন হাসতে পারে তেমন খাটতে পারে। সে বলল, সুধাময়কে বিয়ের পর এই দেখলাম। প্রায় এক যুগ হবে। চেহারার হেরফের বিশেষ হয়নি! ফুর্তিবাজ মানুষের চেহারা সহজে পালটায় না। সুধাময়কে আমার খুব ভাল লাগে।

পদ্ম বলল, আমার ভাল লাগে না।

—কেন এ কথা বলছ, পদ্ম! এ-কথা বলা তো ঠিক না।

পদ্ম বলল, আমার কিছু ভাল লাগে না নীলদা। এত থেকেও আমার কিছু নেই মনে হয়। তারপর পদ্ম বলল, আচ্ছা নীলদা তোমার লেখা খুব খুঁজে পেতে পড়ি। কিন্তু, তুমি তোমার শৈশবের কথা লেখ না কেন। কত না আমাদের মজার মজার ঘটনা। ও তো বলে, নীলদা কেন যে এমন সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা লেখে না!

নীল বলতে পারত, আমি যে কি চাইতাম পদ্ম! শৈশবের পরে যত বড় হয়েছি, তোমাকে যেন আমার কত কিছু বলার ছিল। অথচ একটা কথাও বলতে পারিনি। লিখলে সে-সব কথা লিখতে হয়। তবে যে তুমি আমাকে কখনও আর সুন্দর ভাববে না। সে শুধু বলল ও সব পুরোনো ঘটনা, পাঠক নতুন ঘটনা চায়।

পদ্ম কেমন অবাক হয়ে বলল, ঝড়ের দুপুরে তুমি আর আমি চিনি-পাতা গাছটার নিচে পালিয়ে থাকতাম, কখন টুপ করে আম পড়বে, আমরা কুড়িয়ে নেব···

—তাও লিখে গেছেন কেউ কেউ। আর লিখে কি হবে!

পদ্ম চুপ করে গেল। মানুষটা এই রকমের। কোন কিছুতেই গুরুত্ব দিতে চায় না। সে এবার কেমন দুঃখের সঙ্গে বলল, আচ্ছা নীলদা, তুমি তো পুকুরে ডুব দিয়ে মাছ ধরতে। ডুব দেবার আগে বলতে পদ্ম কি মাছ চাই? বলতাম, শোল মাছ, ঠিক ধরে আনতে। কিন্তু যেই বলতাম পুঁটি মাছ, তুমি বলতে পুঁটি মাছ ধরা যায় না। খুব সাঁতার কাটে। মরে গেলেও কাঁদায় ঢুকে যাবে না। অর্থাৎ পদ্মর বলার ইচ্ছা এমন গ্রামবাংলা অথবা

সবুজ গ্রীষ্ম এবং টলটলে জলে সাঁতার কাটার ভিতর আমাদের এক আশ্চর্য মহিমা ছিল—তোমার লেখাতে এ-সব কেথোও নেই। এবং বোধ হয় এ-ভাবে পদ্ম আরও চায়, সেই যে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখত, পদ্ম, নীলপদ্ম খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা পাচ্ছে না, কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছে, নীলদা, আমরা কোথায় পাব নীলপদ্ম, তুমি কিছু বলছ না কেন—এ সব কোথাও লেখাতো নেই।

নীল মনে করতে পারে সব। এ-সব লিখলে কেউ না কেউ ভীষণ কষ্ট পাবে ভেবেই সে লেখে না। যেমন নীলের মনে আছে, বাবা তাকে রেখে এলে, তার বয়স কত তখন, দশও হয়নি, বাবা তাকে ছ ক্রোশ পথ দূরে রেখে গেলে কেবল পূজার আর গ্রীষ্মের ছুটিতে সে যেতে পারবে,—আর সব দিন, এই বাড়ি মামীমা এবং দাদু, পদ্ম, পদ্মর দাদা নীলের বয়সী এবং নীল এসেই বুঝতে পেরেছিল সে এ-বাড়িতে বাড়তি লোক। কেবল দাদু আর পদ্ম ছিল নিজের লোক। এবং বাবা যখন বিকেলে তাকে রেখে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন হয়তো মার কথা ভেবে, কারণ সে প্রথম মাকে ছেড়ে থাকছে, একা থাকবে, রাতে একা বিছানায় শোবে, কেউ থাকবে না পাশে—এমন ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। বাবা যত গাছপালার ভিতর দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছেন, চোখের জল তত সে রোধ করতে পারছিল না। তখনই পদ্ম এসে বলেছিল, নীলদা যাবে?

—কোথায়?

—এই কোথাও। নীল বুঝতে পেরেছিল, কোথাও পদ্ম তাকে নিয়ে যাবে। অথবা এখনও মনে হয় পদ্ম যেন সব সময় বলছে, নীলদা যাবে?—কোথায়? কোথাও। আর এভাবে বোধ হয় সবাই কোথাও যেতে চায়। নীল বলেছিল, যাব। চল। সে আর কাঁদতে পারেনি। কি যে সহজে পদ্ম, মার কথা, তার প্রিয় গাছপালা পাখির কথা ভুলিয়ে দিল। সে আর পদ্ম সোজা দৌড়ে দত্তদের আমবাগান পার হয়ে চৌধুরীদের যে ঘোড়াটা কেবল নিশিদিন ঘাস খায়, সেখানে এসে বসেছিল। সে আর পদ্ম। লালরঙের ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে। ওরা ঘাসের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঘাস খাওয়া দেখছে। পদ্ম বলেছিল, ঘোড়াটা নীলদা আমাকে খুব ভালবাসে। কিছু করে না।পদ্ম ইচ্ছা করলে নীলকে নিয়ে ঘোড়ার শরীর ছুঁয়ে দিতে পারে। এমন একটা ঘোড়া যখন ঘাস খাচ্ছে, আর সামনে যখন আদিগন্ত মাঠ এবং ছাড়া

বাড়িতে কত সব বিচিত্র পোষা জঙ্গল তখন পদ্ম বলেছিল, নীলদা যাবে?—কোথায়? পদ্ম বলেছিল, এই একটু দূরে। তারপর ছুটতে ছুটতে ওরা দেখেছিল হিজলের ফুল শতরঞ্চের মতো পাতা। পদ্ম সেই ফুলের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছিল, হিজল ফুল আমার খুব ভাল লাগে। এখানে দাঁড়ালেই দূরের কাছারি বাড়ি, টিনের চাল, বাতাবি লেবুর গন্ধ! কি মজা! টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ—কি মজা! পদ্ম একদিন টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনার জন্য বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছিল। পদ্মর মার কি রাগ! যুদ্ধের জন্য কলকাতা ছেড়ে এসেছে। এখানে এসে মেয়েটা কি যে হয়ে যাচ্ছে। তারপরই পদ্ম বলত, যাবে নীলদা?—কোথায়?—এই দূরে কোথাও। ওরা এ-ভাবে কখনও পালিয়ে রমজান ফকিরের দরগায় চলে যেত। চারপাশে কি নিবিড় গাছপালা। গা ছম ছম করত। তবু কি যে আকর্ষণ, পদ্ম আর নীল হাত ধরাধরি করে ছুটত। কেউ দেখলে বলত, নীল-পদ্ম যাচ্ছে। দরগার ফকিরসাব বলত, নীলপদ্ম ফুটছে। কত সব বিচিত্র পাখি আসত দরগায়। নীল আর পদ্ম রঙবেরঙের পাখি দেখলেই ধরতে যেত। পদ্মর বড় পাখি পোষার শখ ছিল। তারপর নীল বলত, পদ্ম, কোথাও যাবে?—কোথায়?—এই দূরে। পদ্ম বলত, আমি স্কুলে যাব। তোমার স্কুলে। নীলের কষ্ট হত তখন। পদ্মকে এত দূরের স্কুলে নিয়ে যাবে কি করে। পদ্ম বড় হয়ে উঠছে। পদ্মকে সে নিয়ে যেতে পারত না। নিয়ে যেতে পারত না বলে, বাড়ি ফিরে স্কুলের গল্প করত। রাস্তার গল্প। খেতখামার থেকে চুরি করে জাম-জামরুল আখের দিনে আখ, বর্ষাকালে সাপলা শালুক তুলে নেওয়ার গল্প। পড়তে পড়তে গল্প শোনা ছিল পদ্মর বাতিক। সেই স্কুলে যাবার রাস্তাটা কত যে লম্বা, পদ্ম না গিয়েও তখন শুনে শুনে সব বলে দিতে পারে—এই যেমন নীলদা এবং আরও সব গাঁয়ের ছেলেরা মাঠ পার হয়ে যখন যায় তখন শীতের বটগাছ, বসন্তের দেবদারু দেখলেই বসে পড়ে। বড় বেশি দূর, প্রায় দু কোশের কাছাকাছি। রোজ রোজ এতটা পথ হেঁটে যায় নীলদা, ফিরে আসে, ফিরে এলেই পদ্ম কোন পাতাবাহারের ঝোপ থেকে উঁকি দিয়ে বলত, নীলদা যাবে? কোথায়? এই একটু দূরে। নির্জন জায়গায় ঝোপের ভিতর ওরা দুজনেই লুকিয়ে পড়ত। পদ্ম উবু হয়ে বসে ফ্রকের নিচ থেকে বের করত খাবার। কি সুন্দর গন্ধ। ক্ষীরের পুলি। পদ্ম বলত, তোমার জন্য চুরি করেছি। নীল চুপচাপ খেয়ে যেত। পদ্ম দেখত

শুধু। পদ্মর ইচ্ছা হত নীলদা বলুক, তুই একটা খা। কিন্তু নীলদা কিছু বলত না। ওর ভীষণ অভিমান হত। সে তখন বলত, নীলদা যাবে ?—কোথায় ? —এই একটু জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়াব। কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর দিনে পদ্ম নীলকে নিয়ে এ-বাড়ি সে- বাড়ি পূজোর প্রসাদ খাবার নামে হেমন্তের গাছ-পালার ভিতর হারিয়ে যেত।

পদ্ম বলল, নীলদা তোমার এ-সব মনে পড়ে না ?

—পড়ে।

—তবে তুমি লেখ না কেন ?

—ভাল লাগে না লিখতে।

এবং এ-ভাবেই বলতে পারত নীলদা তুমি বিয়েও করলে না। আচ্ছা মানুষ তুমি। এখানে সেখানে ঘুরলে, একবার এখানে এলে না। এলেই বুঝি ধরা পড়ে যাবে। তারপর আরও কি যেন বলতে চায় পদ্ম। পদ্ম এখন এ সব বলছে কেন। শৈশবে পদ্ম এবং সে তারপর আরও বড় হলে অর্থাৎ কৈশোরে পদ্ম আর সে এভাবে দরগার মাঠে অথবা কবিরাজ মশাইর দালান পার হলে যে সুন্দর গাছপালার ফাঁকে আকাশ দেখা যায় দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে, সে সব তারা দেখত। তারপরও সে যখন বড় হয়ে যায়, পদ্ম যখন বড় হয়ে যায় দেশ ভাগের পর ওরা যখন ভাগ হয়ে যায়, তখনও পদ্ম কলকতার বাসায় নীলদার জন্য অপেক্ষা করত জানালায়। নীলদা আসবে। পদ্মের স্কুল ছুটি হলে, পদ্ম তখন উঁচু ক্লাশের ছাত্র, পদ্ম ফ্রক পরে না, শাড়ি পরে, বাড়ি ফিরে এক বিকেলে নীলদাকে দেখে অবাক। চার বছরে নীলদা কত বড় হয়ে গেছে ! কি সুন্দর হয়েছে দেখতে ! কি লম্বা হয়ে গেছে আর আশ্চর্য নীল রঙের নরম গোঁফ। পদ্ম কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। সে টুপ করে প্রণাম সারতে গিয়ে পায়ের কাছে যে বসে পড়েছিল আর বোধ হয় উঠতে ইচ্ছা হয়নি। নীল হেসে বলেছিল, পদ্ম ওঠো। কি হচ্ছে। খুব ভক্তি দেখছি।

এ-সব মনে পড়লেই পদ্মর বোধ হয় কিছু ভাল লাগে না। পদ্ম বলল, নীলদা, বেশ ছিলাম।

—এখনও বেশ আছ। সুধাময় কি সুন্দর মানুষ !

পদ্ম বলল, সবাই ভাল। সবাই ভাল নীলদা। আমি কেবল ভাল না।

—তুমি কি এ-সব শোনাবার জন্য সুধাময়কে পাঠিয়েছিলে !

পদ্ম বলল, এখন এমন বয়সে সবই বলতে পারি। আগে যে পারিনি কেন!

নীল তেমনি হাসল, বলল, না-বলে ভালই করেছ। আমি এখনও তোমার কাছে ভীষণ দামী মানুষ। আমার ভীষণ ভাবতে ভাল লাগে! আমার ভীষণ অহংকার হয়। এখনও একজন আমাকে রাজার মতো ভাবে।

পদ্ম বলল, তা রাজার মতো, রাজার তো কথা ছিল সে একজনকে নীলপদ্ম এনে দেবে। কোথায় দিলে।

নীল দেখল তখন আকাশে সেই অপরূপ বর্ণমালা। কত সব নক্ষত্র এবং আলোর ভিতর রাস্তার সব ফুলের গাছে সাদা এক সৌন্দর্য, যা দেখতে দেখতে কেমন হতবাক হয়ে যেতে হয় এবং দূরে যে-সব সল্ট লেকের বাড়ি উঠছে, তার ও-পাশে মরুভূমির মতো মাঠ, জোরে হাওয়া উঠে আসছে, পদ্মর ঘন চুলে ওর মুখ ঢেকে যাচ্ছে। পদ্মকে ভীষণ দুঃখী লাগছে। সে বলল, নীলপদ্ম কোথাও নেই। থাকলে সত্যি চেষ্টা করতাম।

নীল কিছু বলতে পারছে না। শৈশবে ওরা সুর করে রামায়ণ পড়ত। এ-ভাবে তারা নীলপদ্মের কথা জেনেছে—কখনও কখনও ওরা ভেবেছে, দূরে কোথাও গেলে কি সেই ফুল এরা পেয়ে যাবে! এবং এ-জন্যই বোধ হয় ওরা শৈশবে রমজান ফকিরের দরগায়, অথবা দূরে কোথাও বিলের জলে, কোন নীল রঙের ফুল দেখলে ভাবত, এই সেই ফুল, আসলে শালুক আর পদ্মে কি তফাৎ মানুষের জানা না থাকলে যা হয়, ওরা এ-ভাবে অনেক বড় হতে হতে খুঁজেছে একটা ফুল, যা ভিতরেই ফুটে থাকে, যা তুলে আনা যায় না, যত দূরে ফুলটা সরে যায় তত তার সৌরভ বাড়ে।

নীল বলল, পদ্ম এই তো বেশ। তোমার আমার এই সৌরভ আমাদের কখনও ক্লান্ত করবে না।

ওরা তারপর কেউ কোন কথা বলল না। পদ্ম এবং সে পাশাপাশি বসে থাকল। হাওয়ায় ওদের চুল উড়ছে। পদ্মর আঁচল উড়ছে। ওরা এভাবে বসে থাকল। বসে থাকতে কি যে ভাল লাগল! যেন সেই সকাল থেকে ওরা বসে রয়েছে, সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখবে বলে, কিন্তু সেই সূর্য আর উঠছে না। তবু বসে থাকতে ভাল লাগছে। সূর্য উঠুক না উঠুক ফুল ফুটুক না ফুটুক কিছু আসে যায় না। ওরা যেখানে যেভাবে থাকুক আসে যায় না।

এমন মনে হলে পদ্ম বলল, আমার আর কোন কষ্ট নেই নীলদা। তুমি এস। মাঝে মাঝে এস। এলে ভাল লাগবে।'

নীল বলল, আসব। তারপর ওরা উঠে গেল। ওরা দু-ঘরে শুতে চলে গেল। ওরা দু-ঘরে দুজন, তবু ওরা কাছাকাছি। পদ্ম দেখল সুধাময় ঘুমোচ্ছে। পদ্ম ইচ্ছা করেই ওকে জাগিয়ে দিল না। ওর ক্ষুধা নিবারণ হলে আর কিছু লাগে না। সরল সহজ বালকের মতো খাই খাই স্বভাবের। পদ্ম নিজের জানালায় পাশ ফিরে শুল। কি যে নিঃসঙ্গতা ভিতরে—আর তেমনি সেই আকাশে অজস্র নক্ষত্রমালা এবং এ-ভাবে কত হাজার লক্ষ নক্ষত্রারাজির মতো এমন সুন্দর সুন্দর ঘটনা পৃথিবীতে কতভাবে না ঘটে গেছে। নীলদা এখন কিভাবে শুয়ে আছে, ওর চুরি করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল, না নীলদাও জানালায় তার মতো জেগে বসে রয়েছে! এখন ওর ভারি কষ্ট হচ্ছে, যেন এখানে এনে নীলদাকে ভীষণ একটা দুঃখের ভিতর ফেলে দিয়েছে। বরং না নিয়ে এলেই সে ভাল করত। পদ্ম সারারাত কিছুতেই ঘুমোতে পারল না।

আর এ-ভাবেই থেকে যায় মানুষের ভিতরে এক আকাঙ্ক্ষা, তার সব কিছু পাবার পরও থেকে যায় দুঃখ, সেটা নীলের জন্য হতে পারে, পদ্মের জন্য হতে পারে, অথবা নীলপদ্মের জন্য হতে পারে। কেউ দুঃখটা বাদে বেঁচে থাকতে পারে না। আর দুঃখটা না থাকলে বাঁচার ভিতরেও কোন সৌরভ থাকে না, তা নীল বুঝতে পারে। পদ্মকে অনেকদিন পর দেখে এ-সব মনে হচ্ছিল তার। আর সে বুঝতে পারে শুধু এ-জন্যই পদ্মর মুখ এমন পবিত্রতায় ভরা। সারা আকাশের বর্ণমালা যেন পদ্মের মুখে। পদ্মকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

কঠিন হযবরল

সে আজ সকাল থেকে ডেথ ডেথ খেলা খেলছে। সে রোজ এমনভাবে খেলে না। এবং সে একা একা কখনও খেলে না। ওদের ডেকে নেবার কথা থাকলে সে ঠিক ডেকে নিত। যেমন অন্যদিন কিছু ভাল না লাগলে, সে ওদের নিয়ে খুব জ্যামের সময় অথবা কখনও কখনও রাস্তা ফাঁকা থাকলে কেমন ঘুরে ফিরে রাস্তা পার হয়ে যায়। গাঁক গাঁক করে বাসের হর্ন সে কান পেতে শোনে। •এবং কোন কোন সময় ড্রাইভারের ইতর কথাবার্তা। তবু নেশার মতো খেলাটা মাঝে মাঝে পেয়ে বসলে, শহরের বড় বড় রাস্তায় অথবা মোড়ে, ডাবল ডেকারের মুখে এক আশ্চর্য যুগল হাত তুলে ডেথ ডেথ খেলা তার ভারি মজা লাগে। নেশার মতো, রক্তের ভিতর কঠিন ইচ্ছারা তখন ঘোরাফেরা করে।

অথচ আজ সে একা। সকাল থেকেই একা। সকাল থেকেই একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক বড় রাস্তার পাশে। খুব জোরে আসছে একটা বাস, খুব জোরে—কত স্পিড হবে সে ঠিক জানে না, তবু মনে হয় অনেক স্পিড, রকেটের মতো মাটি ফুঁড়ে যেন উঠে আসছে। সে তার ভিতর ঠিক টাইমিং রেখে বাসের গা ঘেঁষে রাস্তার ও-পাড়ে উঠে যাবে। অনেকটা সে নিমেষে, যেন এটা তার কাছে খেলা, সে খেলার মতো একটা বাসের সামনে বিপজ্জনক রাস্তাটা পার হয়ে যাবে।

আর যা হয়, পার হয়ে যেতেই শালা হারামি এবং আর যা গালাগাল না দিলে রক্তের ভিতরে বাস চালানো যায় না—তেমন সব ছোট হাফ্-গেরস্ত কথাবার্তা সে শুনতে পায়। সেও ছেড়ে কথা বলল না। সে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হেঁকে উঠল দরাজ গলায়, আমার বাবাকে তুমি শালা গাল দিচ্ছ। তোমার বাবাকেও আমি শালা গাল দেব। এসব কথা সে এখন হামেশাই বলে থাকে। কারণ শহরের যা কিছু তার ভাল লাগে সবই তার নাগালের বাইরে। ওর ভাল লাগে নদীর পাড়ে অঞ্জুকে নিয়ে বসে থাকতে। অঞ্জু এখন আর নদীর পাড়ে বসতে চায় না। নদীর পাড়ে সে একা একা বসে থাকে, অঞ্জু আসে না।

যেমন ভাল লাগে তার, সে একটা সুন্দর বাড়ি করবে। বাড়ির চারপাশে নানা রঙের ফুলের গাছ, কিছু ক্যাকটাস, আর সব লতাপাতা। লতাপাতায় ঢাকা একটা পাঁচিলের নিচে সে আর অঞ্জু, কিছু কবিতার বই টিপয়ে নীল রঙের খামে প্রেমিকার চিঠি। অথবা অঞ্জু আর সে বসে থাকবে পাশাপাশি এবং এই যেমন ব্লো-আপ ছবির দুটো একটা দৃশ্য নিয়ে কথাবার্তা, একটু সোনালী মদ সামনে কখনও কথা বলতে বলতে হা হা করে হাসবে। তারপর সাদা জ্যোৎস্না উঠলে সব আলোগুলো নিবিয়ে দেবে সে। অঞ্জু আর সে তখন সাদা জ্যোৎস্নায় বাড়ির চারপাশে ঘুরে ঘুরে যে সব ফুল ফোটার কথা তাদের রাত জেগে ফুটতে দেখবে।

সে হেঁকে উঠল তখন, হেই!

গাড়ির ভিতর থেকে অঞ্জু মুখ বের করে বলে উঠল, ওমা, দ্যাখো সজলদা। অঞ্জু লম্বা একটা টান ঝুলিয়ে দিল—স-জল-দা···আ!

—আরে সজল তুমি?

—হ্যাঁ মাসিমা আমি।

—এভাবে রাস্তা পার হতে হয়!

—এই একটু দেখছিলাম, পার হতে পারি কি না।

—তোমার বাবা কেমন আছেন?

—ভাল না। কাল পরশু মরে যেতে পারে।

—তোমার দিদির চাকরিটা আছে তো?

—আছে বোধ হয়।

—তুমি এখন কি করছ?

ওর বলার ইচ্ছা ছিল ভেরাণ্ডা ভাজছি। কিন্তু অঞ্জু আছে গাড়িতে। একেবারে সোজাসুজি অপমান অঞ্জু পছন্দ নাও করতে পারে। সে বলল, পার্কসার্কাসে একটা ভাল ফ্রেসকো আঁকার কাজ পেয়েছি। কাজটা করতে পারলে অনেক টাকা। 'অনেক' কথাটা সে বেশ লম্বা হিজলের সারির মতো বলে গেল।

—তুমি যে কি লিখছিলে টিখছিলে?

গাড়ি থামিয়ে এতক্ষণ কেউ ওর সঙ্গে কথা বলে না। ভাবল, সে আর গাড়ি পেল না, ডেথ্ ডেথ্ খেলা সে এরই সঙ্গে খেলতে গেছে। সে এখন

ওদের ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে। তবু বাবার এক সময়ের বন্ধুপত্নী বাবার সঙ্গে পুরাকালে, একটা সম্পর্কও থাকলে থাকতে পারে ভেবে সে খুব সত্যবাদী হতে চাইল, ফুল লেংথের একটা উপন্যাস লিখে দশ টাকা পেয়েছি মাসিমা।

…দশ টাকা!

—দশ টা…কা! সে লম্বা টান দিল ঠিক সেই হিজলের বনে ঢুকে দৌড় দেবার মতো।

—দশ টাকায় কি হয়! খুব দুঃখের সঙ্গে কথাটা যেন বলেছেন মাসিমা। চোখে মুখে ভীষণ কাতর ভাব।

—কিছু হয় না মাসিমা, তবে দশ টাকায় ইচ্ছা করলে আপনি কয়েক বাণ্ডিল মোমবাতি কিনতে পারেন।

মাসিমা ওর অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে বললেন, ঠিক আছে তোমার বাবাকে একদিন দেখতে যাব।

সে খুব ভাল ছেলের মতো ঘাড় কাত করে বলল, আচ্ছা মাসিমা।

অঞ্জুর মা মেয়েকে তাড়া লাগাচ্ছে—কিন্তু অঞ্জুর কথা শেষ হচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর রেগে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে।

অঞ্জু বলল, তুমি সজলদা এই সকালে কোথায় বের হয়েছো?

—কলেজ স্ট্রীটে যাব ভাবছি।

—ওঠে এস না। নামিয়ে দেব।

সুতরাং আর কোন দিকে না তাকিয়ে সে সোজা দরজা খুলে পিছনে বসে পড়ল। এতটা রাস্তা রোজ রোজ হেঁটে যেতে কষ্ট হয়। কোন কোনদিন আর হাঁটতে ইচ্ছা না হলে সে ডেথ ডেথ খেলা খেলতে খেলতে রাস্তা পার হয়ে যায় এবং এক সময়ে ঠিক সেই লাইট পোস্টের নিচে পুরানো বইয়ের দোকানের সামনে, সে সারি সারি সিনেমা স্লাইডের মতো সরে সরে যায়। গাড়িতে বসে ভীষণ ভাল লাগছে। সে আনন্দে বলেই ফেলল, মাসিমা মোমবাতি কিনেছেন কখনও।

এমন প্রশ্নে অঞ্জুর মা হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছেনা। হ্যাঁ কত! কালীপুজোর সময় কত!

—কি যে মা বলছে না! এখন আর আমরা মোমবাতি জ্বালি!

কথাটা বলে খুব বোকা হয়ে গেছে যেন, এত বড় বাড়ি গাড়ি ফুল ফলের

বাগান করে কি আর মোমবাতি জ্বালানো যায়। ঝাড়-লণ্ঠন দুলবে, ঝুলবে, চকমক করবে অঞ্জুর মুখ। ঝাড়-লণ্ঠনের নিচে অঞ্জু, অঞ্জুবালা, পুরাকালে মেয়েদের নাম 'বালা' দিয়ে হত, সজল দেখছে অঞ্জুবালা বেশ গাড়ি চালাচ্ছে। খুব স্মার্ট। হাতে একটা আংটি, দামী হীরের হবে হয়ত, এত রাতারাতি লোকে বড়লোক হয়ে যায় কি করে!

মাসিমা বললেন, সে অনেক আগের কথা সজল। তোমরা তখন হওনি। তোমার মেসোমশাই তখন ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে যাওয়া আসা করতেন। দেওয়ালীর সময় মোমবাতি কিনতে হত তখন।

—তুমি মা এমন বলছ না! দারিদ্র্যের কথা কেন আবার। অঞ্জুর এটা পছন্দ না।

—এসব বলবেন না মাসিমা, এ-সব কথায় অঞ্জুর আজকাল ভারি রাগ হয়।

—তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ সজল দা!

—না না ঠাট্টা নয়। পুরো দশ টাকায় মোমবাতি পুরো লেংথের উপন্যাস। থ্রি ডাইমেনসান। কত দাম হতে পারে বল। বিদেশে এমন একটা লিখলেই, সমুদ্রে শুনেছি দ্বীপটিপ কিনে থাকা যায়।

অঞ্জু খুক খুক করে হাসছিল।—থ্রি ডাইমেনসান মানে সজল দা?

—বা থ্রি ডাইমেনসান মানে জান না! বয়স বাড়ছে অথচ এখন ঈশ্বর কে এবং কি কি জন্য তিনি আমাদের কাজে লাগেন, জান না! একটু থেমে বলল, ভাবা যা···য়···না। সেই হিজলের বনে ঢুকে ছুট দেবার মতো কথার টান।

গাড়ির ভিতর এতক্ষণ বেশ একটা সুবাস ছিল। কিন্তু সজলের জামা প্যাণ্ট বাড়িতে কাচা এবং তাও চার পাঁচদিন আগে। শহরের ধূলোবালি চার পাঁচদিন ধরে শরীরে মুখে, জামাকাপড়ে জমছে। এতক্ষণ সে ভিতরে থাকায় সব সুবাস মরে গিয়ে ওর ঘামে ভেজা নোংরা গন্ধটা গাড়ির ভিতরে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। মাসিমা তাড়াতাড়ি আরও ভাল করে কাচ নামিয়ে দিলেন, অঞ্জুটার এখনও ওর জন্য একটা বাতিক থেকে গেছে। তিনি মনে মনে সজলকে গাড়িতে নেওয়ায় ভীষণ বিরক্ত। এই ছেলে রতনবাবুর, আধপাগলা। এমন না বলে এখন আর কি বেশী বিশেষণ দেওয়া যায়।

সজল এবার বেশ গায়ে পড়া ভাব দেখাল—থ্রি ডাইমেনসান মানে ক্রাইম সেকস অ্যাণ্ড লাভ। রহস্য পত্রিকা-ফত্রিকাতে থ্রি ডাইমেনসান না থাকলে চলে না। বলে ছিক করে থুথু ফেলল জানালা দিয়ে। যেন কথা বলতে বলতে মুখে থুথু জমে গেছে। সে বলল—খুব গলায় গলায় ভাব। সম্পাদক মশাই বললেন, ওসব কথাতে চলবে না। লেগে গেলাম, লিখে ফেললান। রাত জেগে প্রুফ দেখে দিলাম। একটু থেমে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, ভা···বা যা য় না। সে এবার যেন হিজলের বনে কোথাও হাঁটু মুড়ে বসে আছে। আর হাঁটতে পারছে না।

—বুঝলেন মাসিমা সম্পাদক মশাই বললেন, উপন্যাসের দাম দেওয়া যায় না। ধনকুবের টুবের হলে দামটা দিতে পারত। অঞ্জু, সে অঞ্জুর দিকে চোখ না রেখেই বলল, ধনকুবেরের ডেফিনিসান কি ?

—জানি না।

—আমি একটা ডেফিনিসান ঠিক করেছি।

—যেমন।

—এই দ্বীপ-টিপ কিনে ফেলতে পারলেই ধনকুবের হওয়া যায়।

—তাই কিনে ফেল।

—পয়স। হলে তাই করব। শহর ফহর আমার ভাল লাগে না। আমি যখন দশ টাকার মোমবাতি কিনতে পারি, পয়সা হলে দ্বীপও কিনতে পারি।

অঞ্জু বলল, তা পার। সামের মোড় পার হতে পুলিসের হাত। সে জোরে ব্রেক কষল।

—সম্পাদকমশাই দশ টাকা কাটলেট খেতে দিয়েছিলেন।

অঞ্জু গাড়ি স্টার্ট করার সময় বলল, একা কাটলেট খাবে না।

—কিন্তু আমি যে দশ টাকারই মোমবাতি কিনে ফেললাম।

—দশ···টা···কার! যেন কচি খুকির চুল বেড়েছে, বিনুনি বাঁধার শখ। বিনুনি বেঁধে আশ্চর্য হয়ে গেছে অঞ্জু।

—দশ টাকার। ইচ্ছা ছিল একটা কাঠি জালিয়ে মুখের ওপর নোটটা পুড়িয়ে দিই।

—দিলে না কেন ?

—সাহস হল না! পরে যদি লেখা আবার না চায়। সুতরাং অঞ্জু, দশ

টাকার মোমবাতি, ভালো করে স্নান, পাট ভাঙা ধুতি, তারপর আমার ঘরটা তো অঞ্জু তুমি দেখেছ। চারপাশে মোমবাতি জ্বলছে, রাত বাড়ছে। মাঝখানে আমি সজল, রতন ঘোষের ছেলে সজল ঘোষ, তস্য পুত্র, কি আর পুত্রের কথা বলা চলে, পুত্র ক্রিয়তে ভার্য্যা, আমার বাবারা মাদের আনতে এমন দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করতেন।

মাসিমা কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তিনি প্রায় শক্ত হয়ে বসেছিলেন। অঞ্জু তাড়াতাড়ি কলেজ ষ্ট্রিটে পৌছানোর জন্য যতটা জোরে পারছে গাড়ি চালাচ্ছে। কেন যে তুলতে গেল! এখন বলাও যায় না, তুমি নেমে যাও সজলদা।

—বুঝলে অঞ্জু, আমি সারারাত মোমবাতি জ্বেলে মেডিটেশনে থাকলাম। তারপরই তড়াক করে লাফ দিয়ে বসার মতো বলে ফেলা. মাসিমা কখনও ম্যাডিটেশানে বসেছিলেন! কোন জবাব আসছে না।—তুমি অঞ্জু? কেউ জবাব দিচ্ছে না। কেবল গাড়িটা গাঁক গাঁক করে ছুটছে। এবং দুপাশে কাঠের বাড়ি, টিনের চাল, কখনও কখনও পাটের গুদাম আর গঙ্গার হিমেল হাওয়া। ঠাণ্ডা ক্রমে বেশ নেমে আসছে। সে ওদের কথা বলতে না দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেল। সে বলল, অঞ্জু কাইন্ডলি গাড়িটা একটু থামাবে! আমার ভী···ষ···ণ। ভীষণ কথাটা সে হাঁটু ভাঙ্গা দয়ের মতো ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলতে চাইল।

মাসিমা আর অঞ্জু সামনে। একটা সেতুর মুখে ওর নামার ইচ্ছে হবে কে জানত। বাঁ পাশে রেলের ওয়াগণ। সেতুর নিচে গাড়িগুলোর টংলিং টংলিং শব্দ। এবং এনজিনের ধোঁয়া। যখন এমন একটা দৃশ্য সেতুর নিচে আর সামনে অঞ্জু মাসিমা পাশাপাশি বসে, অঞ্জুর নরম চুল ফাঁপানো ঘাড় পর্যন্ত, আরও নিচে অঞ্জুর শাড়ি সায়ার অন্তরালে সব মহার্ঘ বস্তু লুকানো তখন সে নেমে না গেলে ওদের ঠিক জাত থাকছে না। সে নেমে গেলে মাসিমা বলল, এস একদিন।

অঞ্জু বলল, আমি কাল পাটনা চলে যাচ্ছি।

পাটনাতে অঞ্জুর বড়দা থাকে। কথাটা মনে হতেই সজলের মুখটা ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওরা আর কিছু না বলেই হয়ত গাড়িটা ছেড়ে দিত। কিন্তু দয়াপরবশে মাসিমা যেন না বলে পারল না, অঞ্জুর বিয়ে পাটনাতে হচ্ছে।

এখানে হলে ভাল ছিল। তোমরা সবাই মিলে করে-কম্মে দায় উদ্ধার করে দিতে পারতে। রমুর কিছুতেই ইচ্ছা নয় বিয়েটা এখানে হোক।

রমুর ইচ্ছা নয়, অঞ্জুরও নয়। সারাদিন সারামাস যে মেয়েটা ছিল ওদের কলেজ ছুটি হলে যে ওদের সঙ্গে কখনও কখনও ডেথ্ ডেথ্ খেলার পার্টনার ছিল, তার আর এখন ওসবে কাজ নেই। এখন তার কাছে খেলা বলতে লাইফ লাইফ খেলা। কত মহার্ঘ বস্তু সে পুষ্ট করে রেখেছে, ঝাঁপি খুলে না দেখালে তার স্বস্তি নেই। সজল এ-পর্যন্ত ভেবে লাফ দিয়ে একটা নর্দমা পার হল। গাড়িটা হুস করে বের হয়ে গেল। পনেরটা পয়সা তার পাক্কা বেঁচে গেছে। এক টাকা থেকে পনের পয়সা খরচ হলে বাকি থাকে পঁচাশি পয়সা। পঁচাশি পয়সায় এক ভরি সে কিছুতেই কিনতে পারত না। মনটা তার অঞ্জুর ওপর ভীষণ প্রসন্ন।

অঞ্জু এখন গাড়িতে। সে এখন ফুটপাথে। এখানে ডেথ্ ডেথ্ খেলার জায়গা কম। সে এই পথটা হেঁটেই মেরে দেবে। সে বাগবাজার হয়ে যেতে পারে অথবা সোজা। গঙ্গার ধারে বড় একটা জেটির পাশে এলেই মনে হয়, সে আর অঞ্জু সামনে গঙ্গা, বাবার ভাল মাইনের চাকরি—সে তখন বড় হচ্ছে। জেটিতে সে আর অঞ্জু। বর্ষার গঙ্গা এবং মাঝেমাঝে স্টিমারের শব্দ পেলে সে অবাক হয়ে যেত। বলত, অঞ্জু আমি বড় হয়ে একটা ছবি করব। দেখবে কি ছবি! ছবিতে তুমি থাকবে, গঙ্গার দৃশ্য থাকবে। ক্যামেরা প্যান করা থাকবে। ঘুরে ঘুরে সব ছবি। হাওড়ার পুল, আকাশের সাদা জমিন এবং শ্মশানের ধোঁয়া অথবা যদি কখনও একটা ফাঁকা শ্মশান দেখানো যায়। কেবল কিছু পাতা উড়ছে। মাথার ওপর মরা ডালে কাক। তারপর আকাশটা ক্রমে সরে যাচ্ছে কেবল। তখন কাশের বন, বনের ভিতর তোমার চোখ, বেণী দোলানো তোমার মুখ এবং ফ্রকের ভিতর যে মনোরম একটা পৃথিবী নিয়ে তুমি বড় হচ্ছিলে তার ছবি—আর কিছু থাকবে না। কাট।

সে হাঁটছে। মাথা নিচু করে হাঁটছে। বাবার রুগ্ন মুখ, মার অসহায় চোখ, দিদির ভর্ৎসনা, সকালের সামান্য রুটি চা—যা খেলে মনেই হয় না সে কিছু খেয়েছে। কেবল মনে হয় সে পেট ভরে খাবে, আরও খাবে, দুহাতে লুটেপুটে খাবে। কিন্তু পকেটে পঁচাশি পয়সা থাকার কথা অঞ্জু দয়া দেখিয়েছে বলে, পুরো টাকাটাই আছে। কফিহাউসে এভাবে তার দুপুরটা

কেটে যাবে। একটা নকল কাজের সন্ধানে আছে বড়বাজারের দিকে। দেয়ালে ছবি আঁকার কাজ। কাজটা সে ভেবেছে এবার মন প্রাণ দিয়ে করবে। রেস্তোরাঁর মালিক এবং যুবতী স্ত্রী মিলে একসঙ্গে একটা ছবি আঁকিয়ে নিতে চায়। নিলে সে এমন ছবি এঁকে দেবে, হুবহু ওদের মুখের মতো। অথচ সে পারে না। সে ছবি যতবার এঁকেছে ততবারই উপেক্ষা—মোশাই এটা কি আমার মুখ!

—আপনারই মুখ স্যার।

—ইয়ার্কির আর জায়গা পান না।

—কি বলছেন! এমন সত্য ছবি আপনার কেউ আঁকবে না। কেউ আঁকতে পারে না।

—আমার চোখ দুটো জুয়াচোরের মতো?

—ভাল করে দেখলে টের পেতেন এ-চোখ আপনারই।

হায় তারপর সে কিল চড় ঘুসি এই সম্বল করে পথ হেঁটেছে! সে কেন যে মানুষের সঠিক মুখ আঁকতে পারে না। যা তার কাছে সঠিক, যা সে দেখতে পায় ভিতরে, কারণ সেতো মুখটাই দেখতে পায় না। তাদের ভিতরের চেহারাটাও দেখে ফেলে। দেখে ফেললেই ওর তুলি বেঁকে যায়। সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঁকে এবং আঁকতে আঁকতে নিজের ভিতর গুটিয়ে আসে। সে এটা কি যে করছে! নেকড়ের মতো মুখ হয়ে গেছে। মানুষের মুখে কেন যে নেকড়ের মতো হয়ে যায়।

অনেকবারই সে দেখেছে মানুষের মুখ নেকড়ের মতো হয়ে গেলে তার আর ছবি আঁকতে ভাল লাগে না। সে তখন সুন্দর সুন্দর শিশুদের জন্য ছড়া লিখতে বসে। ছড়াগুলো বাগবাজারের রসগোল্লার মতো টগবগ করে ফুটলে কে খাবে —হন্যে হয়ে আসে ইঁদুরের ঝাঁক—আমরা খাব। শিশুরা আর খেতে পারে না। সে এমন করে কেন যে আর ছড়া লিখতে পারে না, যা শিশুদেরই ভাল লাগবে, আর কেউ খেয়ে সুখ পাবে না। এবং এভাবে নানারকমের ভাবনা। ছোট শিশুদের মতো থাকতে ভাল লাগে তার। সারাদিন ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। কোন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কবিতার আলোচনায় সে রাত্রি ভোর করে দিতে পারে। অথচ তার মুখে কি যে ঘৃণা—সে কাল সারারাত মোমবাতি জ্বালিয়ে জেগেছিল। মা জানালায় এসে দাঁড়ালে গাঁক করে উঠেছে। আর

এগুতে মা সাহস পাননি। দিদি চিৎকার করেছে হারামজাদা পাগলামি করতে হয় বাইরে গিয়ে করবে। পয়সা রোজগারের মুরদ নেই দশ দশটা টাকার মোমবাতি জ্বালিয়ে ধ্যানে বসেছেন। আরও কি সব আজগুবি কথা, যেন সব জীবনের কঠিন হ য ব র ল—যা সে ঠিক মেলাতে পারে না সব সময়। দিদি সবার মাথা কিনে রেখেছে বলে, দিদি জানলায় এলে সে গাঁক করতে পারে না। সিংহের মতো চোখে তাকাতে পারে না। বরং সে কেমন কোমল হয়ে যায়। সে দিদির কাছে হাত জোড় করে বসে থাকে। এমন একটা মনোনিবেশের সময় তোমরা ঝামেলা করলে, গল্পের ইঁদুরেরা আমার মাথার মগজ কুরে কুরে খেতে পারে না। দোহাই যাও। কাট্।

সে মাঝে মাঝে ভাবনার সময় এই রকম শব্দ দিয়ে তার ভাবনা শেষ করে। কাট্ মানে, আর অযথা চিন্তা নয়। এখন একটু কফিহাউসে গিয়ে বসা। তাবৎ পৃথিবীর বড় বড় ডিরেকটরদের ছবি সম্পর্কে কথাবার্তা।—আরে ব্যাস ব্লো আপ দেখেছেন দাদা, মাই···রি ভাবা যায় না। বলেই চোখ মুখ ঘুরিয়ে মাথা নিচু করে বলা সেই যে টেনিস্ খেলার দৃশ্যটা পাহাড়ের কোলে নীল আকাশ এবং মুখোশ পরা মানুষের ছবি সে···ই যে ব···ল···টা নেই অথচ আছে, আমরা খেলছি বলটা উড়ে যাচ্ছে, অথচ কিছুই উড়ছে না তবু আমরা তাকিয়ে আছি; শূন্য সব অথচ পূর্ণ ভেবে আমরা বসে আছি—মনে নেই দৃশ্যটা ভা···বা যা···য়···না···

—আরে সজল! কতক্ষণ?

—সকালেই বের হয়েছি দাদা। অনেকদিন পর আবার পুরানো সেই ডেথ্ ডেথ্ খেলাটা সকালে একটু খেলে দেখলাম। তা বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু অঞ্জুটা সব গোলমাল করে দিল। বেমক্কা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা। না হলে এখনও হয়ত খেলতাম। একটু থেমে কি দেখল, কারণ এখন ওর পাশে আরও দু-চারজন বসবে, ওর কবিতা মুখস্থ বলে যাবে তারা! ছড়ায় জুড়িদার তার আর নেই। অথচ চোখেমুখে ঈগলের মতো কঠিন বাসনা। সে বলল, প্রেমিকার সঙ্গে সকালে আজ একটু ডেথ্ ডেথ্ খেলা জমে গেল। খু···উ···ব জমেছিল দাদা। যত নষ্টের গোড়া ওর মাটা।

—তুমি সজল কিছু খাবে?

—কি যে বলেন দাদা, আপনি বললে না করতে পারি! সে ওমলেটের

এক টুকরো ভেঙে মুখে পুরে দেবার সময় বলল, আমার মা মোচারঘণ্ট যা করে না! দাদা, কাঁঠাল দিয়ে মুগের ডাল রান্না হয় জানেন! একদিন আপনারা সবাই মিলে আসুন না, মা খুব খুশী হবে। মার হাতের রান্না মটর ডালের শুকতোনি, পলতা পাতা সম্বারে—সে যা একখানা…গ্র্যাণ্ড। গ্র্যাণ্ড কথাটা সে ভেবেছিল খুব লম্বা করে বলবে, কিন্তু মুখে ওমলেটের কুচি, বলতে গেলে জিভের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে—সে খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে।—আপনারা এলে মা কত খুশী হন। কবে আসছেন, মাকে বলব। সবই নিছক কথা, তবু সজল এগুলো খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে, কারণ সে মনে মনে এ-সব ভাবে, যেমন তার ভাবনা সে অনেক কাজ করে সব সময়। কাজের জন্য শ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। সে তাই সময় মতো খাওয়া দাওয়া করতে পারে না। শরীরের ছিরি দিন দিন তাই এমন হচ্ছে।

—কতক্ষণ বসবে?

—বেশী সময় বসতে পারছি না। বড়বাজারের ধারিয়াল সাহেবের ঘরে একটা কাজ পেয়েছি। শোবার ঘর। দুটো মুড আঁকতে হবে। প্লাস্টারের কাজ। সকালে বের না হলে আপনাদের সঙ্গে দেখা হত না। একবার দেখা না হলে ভাল লাগে না। সে ওঠার সময় বলল, সারাটা দিন লেগে যাবে। কখন ফিরব ঠিক নেই। তাই একটু বসে গেলাম।

এবং এ-ভাবেই সে আহার শেষ করে, কথা শেষ করে এবং নিদারুণ ব্যথার কথা লুকিয়ে যায়। সে যে কতদিন না খেয়ে থাকে। (তার যে ইচ্ছা: একটা সুন্দর ছোট বাড়ি, ফুল ফলের গাছ, মসৃণ ঘাসের জমি এবং অঞ্জুর মতো ভালবাসার মেয়ে—যার হাত মোমের মতো, যার পায়ে কোমল উষ্ণতার ছবি এবং যার নরম স্তনে হাত রাখলে চারপাশ থেকে সব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য উঠে আসে।) একটা বড় মাঠের কথা মনে হয়, একটা জলাশয়ের কথা মনে হয় আর গাছপালার ভিতর দিয়ে সে ছুটছে, অঞ্জু ছুটছে এমন মনে হয়।

এমন মনে হলেই সে আবার রাস্তায় হাঁটে। ক্রমান্বয়ে হেঁটে যাওয়া শুধু। কোথাও গিয়ে একটু থামে। ঈষৎ ঘাড় তুলে আকাশ দেখার চেষ্টা করে। অথবা মানুষজন ভিড়। ট্রামগাড়ি, ফুলের দোকান এ-সবের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হয় কোথাও ওর একটা কাজ করার কথা আছে। সে সেই কাজ করবে বলে যাচ্ছে। অথচ সঠিক ঠিকানা সে জানে না। সে কেবল হাঁটে।

এবং কোন এক বড়বাজারি মানুষের কাছে একটা ছবি এঁকে দেবার বাসনা জানালে আশ্চর্য অপরিচয়ের মুখ করে রাখে মানুষটা! তবে তখন সুন্দর সুন্দর খেলনা কিনে নিতে ইচ্ছা হয়। মনে মনে সে রাজ্যের সব খেলনা কিনে ফেলে। তার ভারি শখ মাথায় থাকবে নীল রঙের পালক, গায়ে আলখাল্লা, মির্জাপুরি চটি পায়ে। চটিতে বাহারি কাজ থাকবে কিছু। সে মুখে সাদা লম্বা দাড়ি গজিয়ে নেবে এবং শীতের দেশে চলে যাবে। চারপাশে কেবল বরফ, পাইন গাছ, উঁচুনীচু পথ, ওর স্লেজ গাড়িটা ছটা কুকুরে টানছে। আর চারপাশে নীল রঙের কাঠের বাড়ি, দরজা জানালা ঈষৎ খুলে গেলে সব সুন্দর সুন্দর শিশুদের মুখ, নীল চোখ ওদের। সোনালি চুলে শিশুরা হাত পাতলে সব টফি আর খেলনা দিয়ে সে চলে যাব। ছড়াগুলো বড় চেনা, ওদের মুখে সব ছড়া কিছুটা ধর্মীয় সঙ্গীতের মতো তার কানে বাজে। সে সারাক্ষণ কান পেতে শুনতে শুনতে স্থির হয়ে গেলে মনে হয় চারপাশে তুষারপাত হচ্ছে, ক্রমে সে বরফে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে এবং দূর থেকে কারো ডাক ভেসে আসছে। দিদি যেন অনেক দূরে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকছে—স··জ···ল। কাট্।

—কাজটা দিন, খুব ভালভাবে করব।

—তিনটে টেণ্ডার এসেছে। রেট ওদের খুব কম।

—টেণ্ডারে এসব কাজ হয়, না টেণ্ডারে ছবি আঁকানো যায়!

বড়বাজারি মানুষটি হাসল। অর্বাচীন। সে বলল, বাই বাই ধারিয়াল সাব। চলি'।

এবং এভাবে আবার চলা। সারাটা দিন এভাবে কাটাতে হবে। কি করা যায়। বাবুঘাটে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলে হয়। বাবুঘাটে এসেই মনে হল, পাশের মাঠে ঘাসগুলো বেশ নরম আর মসৃণ হয়ে গেছে। এমন একটা মাঠের ওপর দিয়েই তো অঞ্জুর হাত ধরে বিকেলের দিকে তার রোজ রোজ হাঁটার কথা ছিল। সে আজ একা হাঁটবে বলে ঘাসের ভিতর নেমে গেল। বেশ চারপাশে গাছপালা, জলাশয়। পাশে ইডেনের লোহালক্কড় এবং দূরে আরও বড় মাঠ। মাঠ দেখলে মনটা তার হতাশায় ভরে যায়। অঞ্জু সত্যি চলে যাচ্ছে। কাজটা না পেয়ে ওর বুকের ভিতর অপমানের বোঝাটা বেশ ভারি ঠেকছে। এবং এভাবে সে যে এখন কি করবে—ভাবতে ভাবতে মনে হয় সে একটা পুরু লেংথের ছবি করছে। সে ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছে

নায়ক নায়িকার মুখে মুখোশের ছবি। ওরা নানারকমের মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা কামনা বাসনার, কোনটা লোভের। কোনটা ইতর মুখের ছবি আর কোন ছবি দেখলে মনে হয়—আহা কি ভালমানুষ, ভদ্র, বাংলা কথায় জেন্টেলম্যান। সে ভাবল ডিরেকশন দেবে বাংলায়। সে ঘাসের ওপর দিয়ে চোখে ক্যামেরা লাগিয়ে থপ থপ করে যেন হেঁটে চলেছে। আলো বেশী না কম দেখছে। খুব দ্রুত গতিতে একটা ঘোড়া ছুটে আসছে। দুপাশে পাহাড়। কি গ্র্যাণ্ডার ছবির! শালা বাংলা বইয়ে যেন আর গ্র্যাণ্ডার আনা যাচ্ছে না! তার ছবি হবে একটা বড় উটের মতো। উটটা মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হেঁ··টে যাচ্ছে। হেঁ··টে ··যা···চ্ছে।

—স ·জ··ল।

কেউ যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে।

সে চারপাশে তাকাল। না কোথাও কেউ নেই। চারপাশে সব অপরিচিত মুখ। এখন সূর্য পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে। নানা রঙের শাড়ি পরা মেয়েছেলে সব মাঠে নেমে আসছে। এদের কেউ ওকে চিনবে না। চেহারাগুলো দেখলেই মনে হয়, ওরা কেউ কবিতা পড়ে না। কবিতা না পড়লে, সজলকে চিনতে পারবে না। সুতরাং সে বেশ নিশ্চিন্তে দশ পয়সা খরচ করে চিনাবাদাম খাচ্ছিল। তখনই কেউ যেন ওর কাঁধে হাত রাখল। সে পিছন ফিরে তাকাল। বলল, তুমি কি আমাকে ডাকছিলে?

—না তো! রাইটার্সে যাচ্ছি। দেখি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ।

—আমাকে কে যেন ডাকল। স···জ···ল। সে যেমন ভাবে ডাকটা শুনেছিল, হুবহু তেমনি লম্বা করে কথাটা বলল। —আমাকে এতদূর থেকে কে আর ডাকতে পারে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। মা এভাবে আমাকে ডাকত। দিদি আমাকে খুঁজে না পেলে এভাবে ডাকত। এখন আমাকে আর এভাবে কেউ ডাকে না। বেদনায় ওর মুখ কেমন ভার হয়ে গেল।

—এখানে একা একা কি করছ?

—এই একটা কাজ করছি। ফ্রেসকো। কাজটা পার্ক স্ট্রিটে। সকাল থেকে কাজ করতে করতে হাতের আঙ্গুল অবশ হয়ে গেছে। বলে সে মট মট করে আঙ্গুলগুলো ভেঙ্গে ওর চোখের সামনে জড়তা কাটিয়ে নিল। তারপর হাই তুলতে তুলতে বলল, বড় একঘেয়ে কাজ। দুটো হ্যাড আঁকছি। সূর্যাস্তের

আগে দুই যুবক যুবতীর—ওরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যাস্তের আগে অর্থাৎ যখন আকাশ, মাঠ, গাছপালা লালে লাল হয়ে যায় তখন নদীর পাড়ে কোনো সুন্দরী যুবতী নগ্ন হলে যা হয়। এসব ছবি কেউ কেউ ঘরে রাখতে খুব পছন্দ করেন।

—কত পাবে?

—কত আর। আজকাল সবাই ফোকোটের বাবু। তবু বলেছি সাতশ টাকার কমে হবে না। দিতে চায় না। ফের বললাম, সাতশ টাকায় ছবি হয় না, ছবির ফ্রেম হয়। কিন্তু হাতে কাজ না থাকলে বসে তো থাকা যায় না। ভদ্রলোকের কথাটা খুব লেগেছে। ভদ্রলোক সাতশোই দিতে রাজি হয়ে গেল।

—এ বাজারে সাত শো! কম কোথায়। তারপর সজলের চোখ মুখের ছিরি দেখে বলল, তোমাকে খুব রুগ্ন দেখাচ্ছে।

—খুব খাটনি। সেই কোন সকালে কাজে বের হয়েছি। দুজন অ্যাসিস্টেন্ট আছে। ওরা কাজকর্ম ভাল বোঝে না। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হচ্ছে। কাজ থেকে একটু ছুটি পেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবছি তখন অঞ্জুকে নিয়ে উটি থেকে ঘুরে আসব।

—তা হলে তোমার সঙ্গে অঞ্জুর সেটেলড্।

—কবে! আমিই ঠিক মত দিতে পারছি না। বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বাবা ভাল না হলে পিঁড়িতে বসে যাওয়া ঠিক না।

তখন এদিকে ডাবল ডেকার, অন্যদিকে কলা বিক্রি করে খায় এমন এক মানুষ, তার মাঝখানে সে। বেশ একটা আড়াল। এবারে ভিড়ের মধ্যে কেটে পড়া যাক। সে কেটে পড়ল। সে প্রায় লাফিয়ে পার হল ফুটপাথ। কোন জায়গা খুঁজছে যেখানে এমন সব লোকদের সঙ্গে তার দেখা হবে না। দেখা হলেই একটা না একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে। বেকার হলে করুণা ছাড়া আর কেউ কিছু করে না। আবার কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে কি বলবে ঠিকঠাক করে ফেলে। আরে তুমি? কি খবর?

—খবর কিছু নেই দাদা, এই কিছুদিন এখানে ছিলাম না। একটা ডকুমেন্টারি তুলতে বিষ্ণুপুর গেছিলাম। প্রাচীন মন্দির টন্দির নিয়ে ছবিটা। এ-ভাবে একজন যুবক এ সময়ের যুবক তাকে কলকাতার যুবকও বলা চলে—

গড়ের মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে চুপচাপ মাঠের ভিতর বসে থাকবে। এবং সূর্যাস্ত হলেই হাঁটা। চুপি চুপি, ভিড়ের জ্যাম বাঁচিয়ে হাঁটা। তারপর বড়বাজারের ভিতর ঢুকে কোনরকমে পরামানিক লেনের দোকানটার কাছে গেলেই ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়। তারপর ভঁড়ি খানেকের মতো ওজনের ডেলাটা মুখে ফেলে দেয়। বেশ চিবিয়ে সুস্বাদু খাবারের মতো চেটে চেটে খেয়ে ফেললেই মনে হয়—এই কলকাতায় সে খুব সুন্দরভাবে বেঁচে আছে। তার যা কিছু আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন একেবারে চোখের ওপর সব সত্য হয়ে যায়।

প্রথম দিকে যা হয়ে থাকে, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। চোখ কান কেমন একটু জ্বালা জ্বালা করে, তারপর এক সুন্দর নেশা, সুন্দর দৃশ্যের মতো উঠে আসে। হাত পা অবশ মনে হয়। মনে হয় সব তার আলগা। সে যখন যেখানে খুশি যে কোন হাত, পা, মাথা খুশিমতো খুলে এখানে সেখানে রেখে দিতে পারে। সারাটা পথ সে কখন যে কোথায় এভাবে হাত পা মাথা রেখে হাঁটতে থাকে নিজেও জানে না। কোনটা টাটা বিল্ডিংএর ওপর, কোনটা মনুমেণ্টের নিচে, আবার দেখা যাবে ওর ডান হাত রয়েছে বরাহনগরের বাজারের কাছে নন্দীবাবুর কাঠ-গোলায়। বাড়ি ফিরতে গেলে সব আবার ঠিকঠাক করে নিতে হয়। তখন সে হেঁটে পারে না। পায়ের নিচে খড়মের মতো স্কেট পরে নেয়। সে লম্বা হয়ে যায় ক্রমে। হাত পা লম্বা একটা মানুষ বাস ট্রামের ওপর দিয়ে, রাস্তায় ওপর দিয়ে স্কি করতে থাকে যেন। যখন যেখানে খুশি সে উঠে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে। এই ফুটপাথ, ছাদ জ্যাম থাকলে ট্রাম বাসের ওপর—যখন যেখানে খুশি উঠে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে। খুব দ্রুত সে যাচ্ছে বলে কখনও রেল গাড়ির মতো দু পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, গড়ের মাঠ সব ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওর পা মাথা হাত সব ছিটকে পড়ছে চারিদিকে। তবু সে আছে, সজল বলে এক যুবক আছে—গায়ে তার এখন লম্বা পোষাক, মাথায় ম্যাংকি ক্যাপ এবং হাতে সাদা দস্তানা। সে একেবারে বরফের দেশের মানুষ হয়ে গেছে। কেবল বরফ. বরফময় কলকাতা। বরফের নিচে কলকাতায় বাড়ি ঘর যানবাহন। কেবল আছে মনুমেণ্ট। সাদা রঙের মনুমেণ্ট, তার তলায় একটা আলগা মাথা। সে মাথাটা তুলে নিতেই বুঝল এটা সে এখানে রেখে গেছিল। কি করা যায়। উটকো একটা বেশী মাথা যখন পাওয়া গেল, বগলের নিচে রেখে দিলে মন্দ হয় না। সে সজল, এক

কঠিন জীবন, হ য ব র ল হে জীবন, বগলের নিচে জীবন নিয়ে বরফময় কলকাতায় স্কি করে বেড়াচ্ছে।

সজল জানে না, এখন সে একটা লাইট পোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে একটা কুকুর। ট্রাম বাস হুস হাস বের হয়ে যাচ্ছে।

কখনও সে লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। কখনও বেঁটে। এবং সে লম্বা হয়ে গেলে মনে হয় আকাশটা খুব কাছে। সে তখন আকাশটাকে বোর্ডের মতো ব্যবহার করতে পারে। বড় বড় ছবি আঁকতে পারে, যা সে এতদিন ধরে কোন দেয়ালে অথবা রেস্তোরাঁয় আঁকবে বলে স্থির করেছিল। তবে এখন যা খুশি করে ফেলতে পারে। আকাশের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে, কারণ সে তার বরফের পা পরে এত বেশী সহজ হয়ে গেছে যে সে নিজেও জানে না, যে কোন সময় টুপ করে মহাশূন্য থেকে ছিটকে পড়তে পারে। এবং এভাবে মহাশূন্যে ভাসমান ছোট্ট ভেলার মতো সে যখন ভেসে বেড়াচ্ছিল তখন একটা কুকুর —জীবন এক কঠিন হ য ব র ল, ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কুকুরকে ভীষণ ভয় তার। সে তাড়াতাড়ি জায়গাটা বদল করে নেবে ভাবল। কোথা থেকে আবার একটা নচ্ছার কুকুর, বোধ হয় অঞ্জুর মা কুকুরটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে—এই মহাশূন্যে তাড়া করছে। সে যে এখন কি করে—যেদিকে সে ভেসে যাচ্ছে, কুকুরটাও সেদিকে। কোথাও একটা গীর্জা অথবা মন্দির পেলে হত। গীর্জার মাথায় অথবা মন্দিরের চূড়ায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কুকুরটা কিছুতেই নাগাল পাবে না। গীর্জার কথা মনে পড়তেই স্কেটিঙ করে দু'লাফে সেণ্ট পল গীর্জার মাথায় উঠে গেল। কিন্তু কুকুরটা একটা স্পুটনিকের মতো ছুটে আসছে। এখানেও রেহাই নাই। সে এবার বেশ দু পা ফাঁক করে বরফের পাহাড়ে স্কেটিঙ করার মতো টাটা বিল্ডিং-এর মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বিল্ডিং-এর নীচে এই শীতের রাতে কুকুরটা এসে ওৎ পেতে বসে আছে কিনা দেখবে বলে উঁকি দেবার সময় কি যেন হয়ে গেল তার। সে নড়তে পারছে না। সে শুতে পাচ্ছে না। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কুকুরটা এখানে আছে কি চলে গেছে। সে শক্ত হয়ে গেছে। বরফের মতো শক্ত। স্থির এবং স্থবির। হাত পা গুলো পাথরের মতো শক্ত। সে একটা পাথরের মূর্তি হয়ে যাচ্ছে। এবং বুঝতে পারছে, মূর্তিটা আর কেউ না, সেই বিলেতের লোকটা—হ্যাপি প্রিন্স।

সে টাটা বিল্ডিং-এর মাথায় হ্যাপি প্রিন্স অথবা বলা যেতে পারে বাংলা-দেশের সুখী রাজপুত্র। মাথায় রবিন পাখি। অঞ্জু পাটনায় যাচ্ছে। চার-পাশে তার সারিসারি মোম জ্বলছে। সারা গায়ে তার রাজপুত্রের পোশাক। কোমরে তরবারি। মাথায় রাজপুত্রের মুকুট। মধ্যরাত বলে হিমে সব মোম নিবে যাচ্ছে শুধু মাথার ওপর নীল আকাশ, অজস্র নক্ষত্র এবং কোর্টের ওপাশে নদীতে জাহাজ—জাহাজে ব্যাণ্ডের বাজনা বাজছে। তার মনে হচ্ছে আকাশ ঠাণ্ডা এবং তরবারির মতো শীতল হিমেল স্পর্শ চার পাশে।

সে এ-ভাবে কতকাল ধরে যে টাটা বিল্ডিং-এর মাথায় দাঁড়িয়ে আছে! মাথার ওপর রবিন পাখিটা কতকাল থেকে বসে রয়েছে। সে মাঝে মাঝে এভাবে বাংলাদেশের সুখী রাজপুত্র হয়ে গেলে চোখের মণিতে যে দামী মুক্তো আছে তা দিয়ে আসতে বলে।

—কাকে দেব, সুখী রাজপুত্র?

—সেই যুবককে, যে আশা করেছিল মানুষের সঠিক ডকুমেণ্টরি করবে ছবিতে।

—তারপর?

—সেই যুবককে, যে আশা করেছিল আকাশের মতো বড় ক্যানভাসে মানুষের সঠিক মুখ আঁকবে।

—আর কাকে কি দেব?

—সেই যুবককে, যে আশা করেছিল শিশুদের জন্য কেবল ছড়া লিখে যাবে।

পাখিটা কেবল উড়ে বেড়ায় মাথার ওপর। তার ভারি কষ্ট চোখের মণি তুলে নিলে সুখী রাজপুত্র আর কিছু দেখতে পাবে না।

—না, তবু তুমি যাও। সেই যে একটা বাড়ি আছে, কাঠের বাড়ি, রেলিং ঘেরা লতাপাতায়, অন্ধকার সব সময় ঘরের ভিতর, একজন মানুষের অসুখ, কঠিন অসুখ, অভাবে অনটনে চিকিৎসা হচ্ছে না, শিয়রে আমার দুঃখিনী মা জেগে—সেখানে যাও। মায়ের জন্য পার তো আমার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নাও। কাট।

এভাবে শয়তানের আবাসে খুকু ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছিল।

এভাবে গুপ্ত নিবাসের খুকু ক্রমে কল্যাণী হয়ে গেল। কেউ এখন খুকু বলে ডাকলে তার ভীষণ রাগ হয়। তবু বাবা যখন ওপরে উঠে আসার সময় খুকু বলে ডাকেন তখন মনে হয় এ-বাড়ির ভেতর যে একটা শৈশব তার ছিল, রুগ্ন বেড়াল ছানা অথবা কুকুর ছানার প্রতি তার যে ভীষণ মমতা বোধ ছিল, কে যেন মনে করিয়ে দেয়। মা মরে যাবার পর থেকে একমাত্র বাবার এই সুন্দর ডাক এবং তাতে সাড়া দেওয়ার ভেতর বেশ একটা আনন্দ আছে। আর কেউ ডাকলেই যেমন বাবুর্চি মকবুল একদিন ডেকেছিল খুকুদিদিমণি তোমার কে এসেছে ছাখো। তখনই কল্যাণী রাগ করে বলেছিল, মকবুল আমাকে আর খুকু দিদিমণি ডাকবে না। আমার ক্লাশের বন্ধুরা শুনে ভীষণ হাসাহাসি করে। মকবুল বলেছিল আচ্ছা দিদিমণি কি বলে ডাকব?

—আমাকে তুমি মেমসাব ডাকতে পার না!

মকবুল বলেছিল, জী মেমসাব।

গীতা মাসি বলেছিল, তোমার এখনও মেমসাব হবার মতো বয়েস হয়নি কল্যাণী।

কল্যাণী বলেছিল, হয়নি তো হয়নি। ডাকতে বলেছি ডাকবে।

গীতামাসির সে সাহসও নেই সে প্রতিপত্তিও নেই। মকবুল প্যানট্রি থেকে শুনতে পেয়েছিল। এবং ভীষণ মজা লাগে তার তখন। বেশ বলেছে মেমসাব। মকবুলের সামান্য বিরূপতা আছে গীতামাসির প্রতি। বাড়িটাকে শয়তানের আবাস অথবা সেই যে বলা যায় খুকু দিদিমণির মা. সংসারে যে ছিল আসল মেমসাব, যাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করেছিল—এবং একটা গোপন অশ্লীলতা ছিল গীতা মাসির শরীরে, গীতা মাসি কি করে যে হাত করে ফেলল গুপ্তসাবকে সে এখনও সঠিক বুঝতে পারে না। মেমসাব তারপর থেকে দিন দিন শুকিয়ে গেল। মেমসাব মরে গেল। এবং নতুন মেমসাব আবার এ বাড়িতে যখন গজিয়ে উঠছে তখন তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। সে মুরগির

রোস্ট লোহার উনুনে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল তখন। দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করছে এবং সন্তর্পণে আর কি কি কথা কাটাকাটি হয় শোনার জন্য বেশ আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। আর বোধ হয় খুকু দিদিমণি টের পেয়ে যাচ্ছে—সংসারে একজন আয়া দিন দিন কিভাবে গীতা মাসি হয়ে গেছিল। খুকু দিদিমণি যখন মুখের ওপর জবাব দিতে শিখেছে, তখন সে আর অন্য কোথাও কোনো বড় হোটেলে কাজ নিয়ে চলে যাবে না ভেবেছিল।

কল্যাণীর পড়ার ঘরটা একেবারে পশ্চিমের দোতলায়। এবং ঘরটা ভীষণ নিরিবিলি। আর চার পাশে অজস্র গোলাপের সমারোহ নিয়ে যখন বাড়িটা এক অতিশয় বৈভবের ভেতর আছে, তখন কল্যাণী তার পড়ার ঘরে সুন্দর কারুকার্যময় টেবিলে ঝুঁকে দেখতে পায় নিজের প্রতিবিম্ব—আয়নায় সে দেখতে পায় ভারি লম্বা শরীর তার। তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভীষণ লাবণ্যময়। আর সে জামদানি শাড়ি পরতে পছন্দ করে। ওর শাড়িতে তখন নানারকম প্রিণ্ট থাকে। এবং এত হাল্কা যে মনেই হয় না সে শাড়ি পরে আছে। সে আবার বাইরে বের হবার সময় দামী অথচ সাদামাটা শাড়ি পরতে পছন্দ করে থাকে। এবং কোনো অহমিকা নেই মুখে। ক্লাশের মেয়েরা তাকে ভীষণ পছন্দ করে সেজন্য। ছেলেদের কাছে সে ভারি প্রিয়। যেমন সে মাঝে মাঝে গোপাল বলে একটি ছেলেকে লিফট দেয়। গোপাল নামটা সাদামাটা। গোপাল খুব ভীরু স্বভাবের। আর গোপাল ভীষণ লাজুক। গোপালের মা আর গোপাল। গোপাল গরিব এবং দুঃখী। অদ্ভুত ব্যাপার এটা ঠেকত সবার কাছে। গোপালের শ্রী আছে মুখে। গোপাল উঁচু লম্বা মতো ছেলে। পড়াশোনায় গোপাল খুব একটা ভালো ছেলে নয়। কল্যাণী তবু সবার চেয়ে গোপালকে পছন্দ করে থাকে বলে—এটা গীতার ভারি আশ্চর্য স্বভাব মনে হয়েছে। কখনও কখনও বাড়ির সবাই অবাক। মকবুল দেখেছে গোপালকে নিয়ে হাজির মেমসাব। ভাল খাবার যা কিছু মুখোমুখি বসে খেয়েছে। গীতা মাসি তখন কেবল গজগজ করেছে অন্য ঘরে। গুপ্তনিবাসে এমন অনাসৃষ্টি ব্যাপার কে কখন দেখেছে এমন বললে মকবুল বলত, আমি দেখেছি।

—তুমি আবার কবে দেখলে!

—বারে মনে নেই, সেই যে একবার একটা নোংরা বেড়াল ছানা নিয়ে বাড়িতে কি অশান্তি। আপনার কি অশান্তি!

—আমার আবার অশান্তির কি আছে!

—সেই যে গীতা মাসি মনে নেই করণ সিং-এর ছেলে কাল্লু না কি নাম ছিল, মনে নেই একটা লেডি কুকুরের বাচ্চা তুলে এনেছিল, পাঁচিলের ওপাশ থেকে খুকু দিদিমণি তুলে আনতে বলেছিল কাল্লুকে—আমার মনে আছে সব।

গীতা মাসি ভীষণ চটে যেত। এবং যেহেতু খেয়ে খেয়ে চর্বি জমে যাচ্ছে, কারণ মকবুলের ধূর্ততা যদি একবার টের পেত! মকবুল সব সুস্বাদু খাবার গীতা মাসিকে গোপনে যোগান দিয়ে থাকে এবং এই সূত্র ধরে মকবুলের কাছে খুব বড় একটা রোয়াব নিতে পারে না গীতামাসি। যত স্থূল হয়ে যাচ্ছে শরীর তত গুপ্তসাবের নজর পড়ে আসছে। এবং আর কিছুদিন গেলে মকবুল জানে গীতামাসি গুপ্তসাবের কাছে ভারি অকেজো হয়ে যাবে। এবং সে ভেবেছিল সেদিনই এ বাড়ি থেকে তার ছুটি। তার যেন একটা প্রতিশোধের স্পৃহা ক্রমে জেগে উঠেছে।

আর তখনই হাঁক, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ। মেমসাব স্নানে যাচ্ছেন। এবং এ সময়টা বাড়িতে টু শব্দ হলে রক্ষে থাকবে না। বাথরুম থেকে চেঁচাবে মেমসাব, কি হচ্ছে তোমরা কেউ আস্তে হাঁটতে পার না।

মকবুল বুঝতে পারে না চানের সময় কোথায় কি একটা বড় রকমের শব্দ হল—ব্যাস। অথচ নিচে রমেনবাবু খাতা নিয়ে বসে থাকেন। সংসারে যার যা দরকার এবং পয়সা গণ্ডা যার যা কিছু লাগবে তিনি সাধারণত দিয়ে থাকেন। লম্বা খাতায় পাই পয়সার হিসেব। আর মুখে চোখে কত সৎ মানুষ এমন একটা ভাব। মকবুলের বেলায় যত তার হিসেবে গণ্ডগোল। এখন হবে না, পরে দেখা যাবে—গীতা মাসি কিংবা করণ সিং অথবা ড্রাইভার নবীন ভটচায তো রোয়াবের মাথায় এসে টাকা পয়সা নিয়ে যায়—সে কেন যে পারে না। দোতালায় থাকে বলে একটু যে মনের দুঃখে কাওয়ালি গাইবে তাও পারে না। একবার চানের ঘরে মেমসাব সে জোরে কাওয়ালি গেয়েছিল। মেমসাব বের হয়ে বলেছিল, মকবুল আমি আর চানটান করব না। তোমাদের এত করে বলি, তোমরা শুনতে পাও না।

এই হয়েছে জ্বালা মকবুলের, সে থাকে ওপর মহলায়—প্রায় মেমসাবের মহলার কাছাকাছি এবং সে যেহেতু বয়সী মানুষ তার প্রতি মেমসাবের কোনো লাজ সরম নেই। যে পোশাকে এসে দাঁড়িয়েছিল মেমসাব, সে যতই

ধার্মিক হোক চোখ তুলে তাকাতে পারে নি। মাথা নিচু করে বলেছিল জি মেমসাব !

সেই থেকে চানের ঘরে যাচ্ছে শুনলেই মকবুল যত কম সম্ভব কথাবার্তা বলে থাকে। বয় রতন সাদা প্যাণ্ট জামা, মাথায় সাদা টুপি পরে তখন পা টিপে টিপে হাঁটে। হাতা খুন্তির যেন কোনো শব্দ না হয় এবং যতক্ষণ চানের ঘরে থাকবেন মেমসাব মকবুল একেবারে তটস্থ। ওর সাদা দাড়িতে তখন অল্প অল্প ঘাম দেখা দেয়। দু এক ফোঁটা পড়ে গেলে ঝালে ঝোলে তোবা তোবা বলতে থাকে মনে মনে। এত করেও সে দাড়িতে ঘাম কমানোর কোনো দাওয়াই খুঁজে পায় নি। এবং একবার হাত থেকে কাচের জার পরে ভেঙ্গে গেলে ওর জ্বর এসে গেছিল। কারণ ভয় ছিল, বুঝি মেমসাব ছুটে আসছে। রাগ হলে মেমসাবের মাথা ঠিক থাকে না। হয়তো একেবারে নাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। গায়ে যে আব্রু নেই মনেই থাকবে না। তখন যে তার কি হবে এবং ভয়ে তার জ্বর আসার মতো যখন অবস্থা তখন গীতামাসি এসে বলেছিল, আবার ভাঙ্গলে !

—আমি কি করব মাসি ? হাত থেকে পড়ে গেলে আমি কি করব ?

—তুমি কি করবে দেখাচ্ছি। বদমাসের হাড়। তুমি মকবুল ভীষণ বদজাত। সাহেব আসুক, আজ বলছি। এটা আমি প্রয়াগের মেলা থেকে এনেছিলাম। গুপ্তসাব বলেছিলেন, কি সুন্দর ছ্যাখো গীতা। তুমি সেটা হারামির মতো ভেঙ্গে ফেললে। বোধহয় সেদিন গীতামাসি তাকে খেয়েই ফেলত, কিন্তু খুকু দিদিমণি খুব ধীর-স্থির পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, তুমি ভেঙ্গেছ ?

মকবুল বলেছিল, জি মেমসাব।

—বেশ করেছ। কাচের জিনিস ভাঙ্গবে না তো সোনার জিনিস ভাঙ্গবে। বলে প্রায় ধীর পায়ে চলে যাচ্ছিল। তখন মকবুল উর্দি পরে ঘেমে নেয়ে গেছে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল মেমসাব।

—কিছু বলবে ?

—মেমসাব, কিছু হবে না তো ?

—কী হবে ?

—গুপ্তসাব যদি···

—সে আমি দেখব।

তারপরই মকবুল ট্যারা চোখে চেয়েছিল গীতামাসির দিকে। আর আল্লা এমন খুবসুরৎ মেয়েটিকে দোয়া করুন, এমন সে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। খুকু দিদিমণিকে কি যে ভাল লাগছে। প্রায় আসমানের তারার মতো। হেঁটে চলে যাচ্ছে। লম্বা মতো পায়ের কাছাকাছি গাউন, চুল হেয়ার—ডু করা, পিঠ একেবারে প্রায় খালি। এমন সব ছবি সে যখন জাহাজে চিফ-কুকের কাজ করত, বড় বড় বন্দরের সো-কেসে দেখেছে। এখন এ বাড়িতে। চোখ টানা টানা, আর ভ্রু-তে মিশকালো জলের রঙ। যেন ছুঁয়ে দিলেই সব ঝর ঝর করে ঝরে পড়বে।

গীতামাসি ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল। মুখ গোমরা করে রেখেছিল অনেকক্ষণ—কিন্তু গীতামাসির যা স্বভাব, ভাল খাবার, এই সুস্বাদু কিছু হলে অপমানবোধ একেবারে থাকে না। খুব আপনজনের মতো বলেছিল, আমি তো বলি না মকবুল। যদি কোনদিন গুপ্তসাব জিজ্ঞেস করে, গীতা আমাদের সেই প্রিয় কাচের জারটা কোথায়? তখন কি হবে?

মকবুল বলতে পারত, সাবের তো খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। কাচের জার বেশিদিন টেকে না গুপ্তসাব জানেন। এ নিয়ে তিনি কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ভাবতেই মকবুলের সামান্য হাসির উদ্রেক হল।

মকবুল এত সব জানে বলে মেমসাবের চানের সময় কোনো গণ্ডগোল করে না। দুটো একটা শব্দ কেউ কোথাও জোরে করে ফেললে মকবুল সন্তর্পণে ছুটে যাবে—এই কে রে? কে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছিস! আস্তে বাপজান। মেমসাব চানের ঘরে। এবং গীতামাসি ভেবে পায় না মেয়েটার এত সময় কেন দরকার চানের ঘরে। যেন মেয়েটা চানের ঘরে থাকলে বের হতে চায় না। ঘড়িতে সময় হয়ে যায়। ঘড়ির সামনে গীতামাসি দাঁড়িয়ে থাকে—আর কেবল বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে তখন। সময় মতো কলেজে পৌঁছে দেওয়া, গাড়ি-বারান্দায় সেই কখন থেকে গাড়ি লেগে থাকে—তবু মেয়ের চান শেষ হয় না। আদরে আদরে একেবারে বারোটা বেজে গেছে।

কল্যাণীর কি যে সুন্দর লাগে চানের এই ঘরটা। যতবার ঢুকে যায় তত এক যেন মনোরম জগৎ। চারপাশে পাতলা লেসের পর্দা ঝোলানো। সুন্দর কারুকার্য করা আলোর মালা। এবং বাথটবে কাচের মত জলের ভেতর সোপ-পাউডার মেশালে আশ্চর্য ফেনা। তার ভেতর কল্যাণী শুয়ে থাকে। এবং

হাতে পায়ে অথবা জংঘার দু'পাশে মনোরম সব নরম উলের সবুজ অথবা নীল কখনও ফ্লোরোসেন্ট বাতির মতো হা করা মুখ। আর সেই হাতির দাঁতের রঙ জংঘার। মোমের মতো মসৃণ এবং ত্বকে কি যে লাবণ্য। আয়নায় নিজের মুখ চোখ দেখে সে কখনও গুনগুন করে গান গায় অথবা নিজের সৌন্দর্যে কেমন এক অভিমানী মুখ। তখন চোখ বুজে থাকে। গোপাল, গোপাল নামটা মনে হয় আশ্চর্য এক নাম অথবা, যে-কোনো দুঃখী যুবক পায়ের কাছে গড় হয়ে আছে, অথবা হেঁটে গেলে সে পাশ থেকে তার শরীরে লেপ্টে থাকতে চায় এবং মনে হয় সেই জংঘার দু'পাশে সব ইচ্ছারা খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে হাত দিয়ে দিয়ে কখনও দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়—এটা এক মনোরম জীবন। এখান থেকে চলে গেলেই তার সব কেমন সাদামাটা। বাড়িতে সব মানুষের ভারি উৎপাত। ওর কোথাও কখনও পান থেকে চুন খসবার নিয়ম নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভারি নরম হাতে শরীরের সব জল ধীরে ধীরে মুছে বের হবার সময় স্তন উঁচু করে একটু তার ঝুঁকে দেখা—এ-সবের ভেতর তার নিমগ্নতা এবং নিজের কাছে নিজেই বড় মহার্ঘ বস্তু। তখন হয়তো দরজায় দাঁড়িয়ে গীতামাসির ভীরু গলা—কল্যাণী কলেজের সময় হয়ে গেছে।

কল্যাণী পাত্তাই দিতে চায় না। সে নিজেও একটা ঘড়ি সেলফে রেখে দেয়। কিংবা বাথরুমে যেন বড় গোল টেবিল ঘড়ি সব সময়ই থাকার নিয়ম। ঘড়িটা দামী এবং বিদেশ থেকে আনা। কাঁচের বাতিদানের মতো মনে হয়। ভেতরে একটা পাখি ফুল ঠুকরে খাচ্ছে। সময় হলেই পাখিটা কাঁচের জারে ঘুরে বেড়ায় এবং ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। তখন কল্যাণী বুঝতে পারে তার যথার্থ সময় হয়ে গেছে। সব ধুয়ে-পাকলে ঘাড়ে এবং বগলে, তারপর স্তনে নরম পাফ বুলিয়ে দিলেই কেমন এক স্নিগ্ধতা—সে তখন একেবারে পরিপাটি হয়ে বের হয়ে আসে। দেখতে পায় সাদা চাদরে সব বড় চিনেমাটির প্লেট, দুপিস পাউরুটি, একটু গ্রীন পিজ, সামান্য স্যালাড, দু টুকরো মুরগীর ঠ্যাং অথবা রোস্ট বলা যেতে পারে। দুপুরে এই খেয়ে এক কাপ চা। আর কিছু নয়। শরীর সম্পর্কে বড় বেশি চিন্তা কল্যাণীর। সে যত বড় হয়ে যাচ্ছে তত সে এভাবে নিজেকে সুখী দেখতে ভালবাসছে।

মকবুলের তখন আসার নিয়ম নেই এদিকে। রতন তখন দরজার কাছে কোথাও থাকে। কখন কি ফরমাস তামিল করতে হবে। গীতামাসি জানালার

কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সে কারো দিকে তখন তাকায় না। ন্যাপকিনে মুখ মুছে পায়ে শ্লিপার গলিয়ে তর-তর করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। নিচের তলায় নেমে সে দেখতে পায় রমেনবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। করণ সিং গাড়ির পাশে, তার ড্রাইভার স্বজিত বেশ একেবারে উর্দি পরে যেমন থাকার কথা, কোথাও এতটুকু অনিয়ম নেই—আর তখন কেন যে কল্যাণীর ভীষণ হাসি পায়—রমেনবাবুকে সে পৃথিবীতে যতবার দেখেছে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীতদাসের মতো হেসে বড় সুখে আছে এমন মুখ করে রেখেছে। বোধহয় ওর পায়ের শব্দে এ-বাড়ির সবাই টের পেয়ে যায়, মেমসাব নামছে। টের পেয়ে যায় আসছে—একেবারে মুখে চোখে শংকা জাগিয়ে, জোর করে একটু হাসা তখন। কল্যাণী সব বুঝতে পারে বলে সময়ে কেমন অহংকারী মুখ। তবু বিনয় চোখে মুখে রাখার জন্য কথাবার্তা ভীষণ মোলায়েম—সহবৎ বলতে যা-কিছু সব যেন সে জেনে ফেলেছে। গীতামাসি তখন পেছনে পেছনে ওর যা যা দরকার কলেজের বই, খাতাপত্র সব, নোট নেবার ডায়েরি আরও কত কি, বগলদাবা করে নেমে স্বজিতের কাছে দিলে—স্বজিত বেশ গুছিয়ে রেখে দেয়—এবং গাড়িটা বের হয়ে গেলেই একবারে সব আমলারা সহজেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন গোলমাল চেঁচামেচি, কারণ সাব অফিসে, মেমসাব কলেজে বাড়িটা আবার তখন স্বাভাবিক। রমেনবাবু তখন ইজিচেয়ারে শুয়ে পর্যন্ত পড়তে পারেন। চোখ বুজে একটা সিগারেট খেতে খেতে বেশ আহাম্মক বানিয়ে দু পয়সা করে নেওয়া যাচ্ছে যা হোক, টাকার গাছপালা বোধহয় আছে গুপ্তসাবের। যে যার খুশিমতো, দরকার মতো পেড়ে নাও। গুপ্তসাবের কোনো দৃকপাত নেই। মানুষটার সব অসদাচরণ, চরিত্রহীনতা সহ্য করতে কারও কোনো তখন কষ্ট হয় না।

কল্যাণী কলেজে যাবার সময় দেখতে পায় গিজ গিজ করছে ফুটপাথ। এত মানুষ আসে কোথা থেকে। সে মাঝে মাঝে বাইরের বড় শহরে গেছে, অথবা কখনও ভ্রমণে সে কোনো পাহাড়ী শহরে থেকে দেখেছে—এই শহর যতই নোংরা অপরিচ্ছন্ন হোক কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে শহরটার জন্য। যদি এই সব মানুষেরা ভাল থাকত। কেন এরা ভাল থাকতে পারে না, কিসের অভাব! এরা কেন বাবার মতো নয়, বাবা যেমন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ হলেই তো বজ্জাতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা—এবংতখনই কল্যাণীর মনে হয় গোপাল ভারি সৎ ছেলে।

বিচক্ষণ নয় বলেই সে গোপালকে দিয়ে খুশিমতো সব করাতে পারে। এবং এটা একটা স্বভাব হয়তো কল্যাণীর—খুব বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোকদের তার পছন্দ নয়। সে যেতে যেতে গরিব দুঃখী লোকদের দেখলে ভীষণ কষ্ট পায়। ভিখিরি দেখলে সে ভাবে বড় হলে ওদের জন্য একটা হোটেল করে দেবে। সেখানে ওরা খাবে থাকবে, তাস খেলবে, দরকার হলে হাডুড়ু। সে যেতে যেতে বলল, বুঝলে সুজিত তোমার কি মনে হয় না এদের জন্য কিছু করা যায়!

সুজিত না তাকিয়ে জবাব দেবে। তাকিয়ে জবাব দিলে ভারি অপমানের—সুতরাং সে বললে, মেমসাব কি করা যায়?

—এই যে, দ্যাখো কেমন সব নোংরা ফুটপাথ, মানুষজন, এরা এত নোংরা থাকলে, আমরা সবাই নোংরা হয়ে যাব।

—তা ঠিক মেমসাব।

—গোপালকে তোমার কেমন লাগে।

—খুব ভাল মানুষ মেমসাব।

—গোপাল তোমার খুব প্রশংসা করে।

সুজিত নিজের প্রশংসা শুনে দমে গেল। বাবুদের বাড়ির মেয়ে। মর্জি ঠিক বোঝা যায় না। কি আবার তারপর তাকে বলবে, কোনো দরকার না পড়লে বড়লোকের মেয়েরা বড় প্রশংসা করে না। তাকে দিয়ে বড়রকমের কোনো কাজ হাসিলের মতলবে বোধ হয় আছে। সে বলল, গোপালবাবুকে আজ আবার লিফট দিতে হবে মেমসাব?

—গোপালকে নিয়ে এক জায়গায় যাব। তুমি নিয়ে যাবে।

—জি মেমসাব।

এবং এটুকু করবে বলেই সুজিত বেশ চতুর মানুষ হয়ে যেতে পারে। অনেক সুযোগ-সুবিধা সে পাবে মেমসাবের কাছ থেকে। তার মনটা সহসা খুব খুশীতে ভরে গেল।—কোথায় যাবেন?

—কলেজে যাব না ভাবছি। ওকে আমি তুলে নেব। বলে প্রায় সিটে এলিয়ে পড়ল। বাতাসে আঁচল উড়ছে। হাই উঠছিল। যেন ঘুম পাচ্ছে। আসলে শরীরের ভেতর কি যে থাকে—এবং ভেতরে ভেতরে এক অভিনব জ্বালা অথবা দুঃখ। কোনো মানুষের শরীর তখন ভারি রোমাঞ্চকর। সে গোপালকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরে, কোন থিয়েটারে ঢুকে যাবে। তারপর যদি

গোপাল সামান্য সময় একটু সুখ দেয়। সামান্য সুখের কাঙালপনা চোখেমু
এখন জলজল করছে।

ওরা যখন থিয়েটার থেকে বের হয়ে এল শহরে সন্ধ্যা নেমেছে। জনবহু
রাস্তায় ভিখিরিরা সব হাত পেতে আছে। গোপাল ভারি ভীরু স্বভাবের—ও
হাত পেতে নেবারও সাহস নেই। গোপালকে ভারি নির্ভরশীল ভেবে সে যখ
আবার রাস্তায় তাকে ছেড়ে দিয়েছিল—ঠিক একটা রাস্তায় কুকুরের মতো এদি
ওদিক হেঁটে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল গোপাল। গোপালের জন্য তার কে
জানি ভারি মায়া হচ্ছিল।

এবং রাতে কল্যাণী নিজের শোবার ঘরে একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেল
শরৎকাল! নিশীথে ফুলেরা ফুটছে। শরীরে তার আশ্চর্য সব অহমিকা—
নিজের শরীর নিয়ে এবারে নরম সাদা বিছানায় শুয়ে পড়ল। প্রশস্ত হলঘরে
মতো ঘর—ফাঁকা। দেয়ালে মায়ের বড় একটা অয়েল পেন্টিং পাশে সা
দেয়ালে চিত্রকরেরা নানাবর্ণের সব ছবি এঁকে রেখেছে। টি-পয়ে জল, জ
শুয়ে শুয়ে সে খাচ্ছিল। তারপর নিজের ভেতরের জ্বালা অথবা কষ্ট ধরার অদ
বাসনা। বড় হতে হতে এসব যে কি হচ্ছে, লজ্জা অথবা অশুভ কিছু মনে হ
তার তেষ্টা পায়। এবং এক খেলা। মনোরম খেলায় মেতে যাবার সময় টুপ ক
নিজের ভেতর ডুবে গেল কল্যাণী। হলুদ-রঙের অল্প আলো, যেন মায়াজা
তাকে ঘিরে রেখেছে। তার বাবা-মা এবং গীতামাসি অথবা যাবত
প্রাণীদের এভাবে কিছু থেকে থাকে শরীরে। গোপাল তাকে সামান্য ছুঁ
কেন যে সব দেখতে চাইছে না!

আর এক বিকেলে গোপাল অদম্য ইচ্ছায় যখন আপন প্রবাহে লাফি
পড়েছিল ঘাড়ে, তখন মনে হয়েছিল ভারি অসভ্য গোপাল। বজ্জাত। এ
ইতর। এটা একটা অসুখের মতো কিনা সে জানে না। গোপালকে তার
সে আর একদিনও সহ্য করতে পারেনি। ঠিক একটা কাঙালের মতো গোপ
এতটা যেন না করলেও পারত। গোপালের জন্য আর তার মায়া ছিল ন
রাস্তার কুকুরের মতো গোপাল। এবার তার ফের সংগ্রহ করার পালা।
হন্যে হয়ে আছে—কবে আবার নির্জীব, নিরুৎসাহ দুঃখী একজন মানুষ তার
অপেক্ষা করবে।

॥ শেষ ॥